নিরীক্ষা

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২২৭তম সংখ্যা

অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতা

নিরীক্ষা

২২৭তম সংখ্যা : অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯

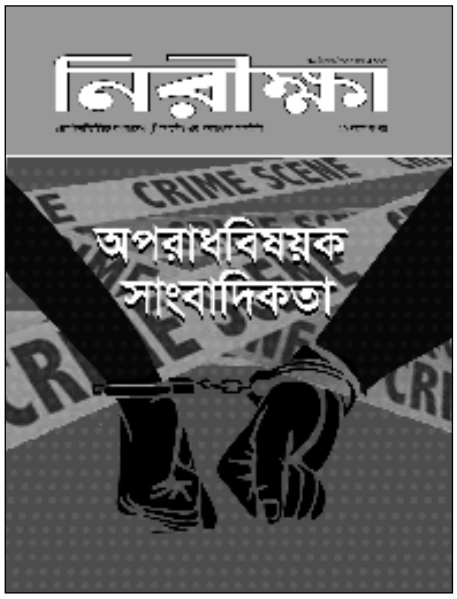

সংবাদপত্র একটি গণতান্ত্রিক দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সহজ করে বললে– সংবাদপত্র রাষ্ট্রের বার্তাবাহক। নিরাপদ সাংবাদিকতা হচ্ছে কোনো দেশের গণতন্ত্রের মানদণ্ড। মানদণ্ড এমন একটি প্রতীক, যা প্রত্যক্ষ করে বোঝা যায় বস্তুর স্বরূপ এবং নিয়ন্ত্রিত হয় বস্তুর গুণ ও মান দিয়ে। গণমাধ্যমে যদি স্বাধীনতা না থাকে, সাংবাদিকতায় যদি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা না থাকে, তাহলে গণতন্ত্র মূল্যহীন হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হলো গণমাধ্যম। গণমাধ্যমকে শক্তিশালী করা কিংবা গণমাধ্যমকে পেশাগত দায়িত্ব পালনে সুযোগ ও সহযোগিতা করা রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রেই সৌহার্দপূর্ণ।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, অপরাধীর চোখ ফাঁকি দিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করেন সাংবাদিকরা। তারপর মেধা-মনন খাটিয়ে দৃষ্টিনন্দন ও মনোরঞ্জন বিষয়টি মাথায় রেখে তথ্যনির্ভর পাঠকপ্রিয় সংবাদ সাংবাদিক তৈরি করেন। এমন ঝুঁকি নিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে যারা ঝাঁপিয়ে পড়েন– সাংবাদিকতা পেশা তার দৃষ্টান্ত। বিশেষ করে অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতা যারা করেন। সময়ের বিবর্তনে কিংবা প্রযুক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমাজে অপরাধের ধরনেও এসেছে নানা কৌশল। তাই অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকদের নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। মিথ্যা সংবাদ মানুষকে বিভ্রান্ত করে, উসকানিমূলক সংবাদ মানুষকে অতিষ্ঠ করে তোলে। গুজবের মারাত্মক প্রভাব, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা ধরনের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন সংবাদের ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত। রামু, নাসিরনগর কিংবা লবণের মূল্য নিয়ে যা ঘটে গেল, তা অত্যন্ত দুঃখজনক।

অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের আরও বেশি সহনশীল, মনোযোগী, সুচিন্তক ও প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে সংবাদ পরিবেশন করা উচিত। এই চিন্তা থেকে পিআইবির গণমাধ্যম সাময়িকী 'নিরীক্ষা'র নিয়মিত সংখ্যা (অক্টোবর-ডিসেম্বর) অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতা নিয়ে সাজানো হয়েছে। অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতার পাশাপাশি যোগ হয়েছে আরও কিছু প্রবন্ধ। থাকছে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের সেই উত্তাল দিনের স্মৃতি নিয়ে 'যুদ্ধদিনের কথা'। আশা করি, সংখ্যাটি পাঠকের ভালো লাগবে।

সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ

সহযোগী সম্পাদক
ফায়জুল হক

সহকারী সম্পাদক
দুলাল কৃষ্ণ আচার্য

সহ-সম্পাদক
আকিল উজ জামান খান

শিল্প নির্দেশনা
মোমিন উদ্দীন খালেদ

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

সূচিপত্র

অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদের সার কথা ৫
মো. মিনহাজ উদ্দীন

গুজব, ভুয়া সংবাদ এবং অপরাধ রিপোর্টিং ১০
আবুল খায়ের

সগিরা মোর্শেদ হত্যাকাণ্ডে পুলিশের নতুন আবিষ্কার ১৩
জুলফিকার আলি মাণিক

অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদন ১৫
রুহুল আমিন রুশদ

অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতার সংকট প্রশমন ১৯
মৃধা মো. শিবলী নোমান

অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতা ২২
মো. ফরহাদ উদ্দীন

সাইবার অপরাধঃ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ ২৬
আমানুর রহমান রনি

সময়ের প্রেক্ষাপটে অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতা ২৮
শামীমা চৌধুরী

সৎ সাংবাদিকতার চর্চা এখন সময়ের দাবি ৩২
মো. সাখাওয়াত হোসেন

৩৪ অপরাধ প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা ও প্রতিবন্ধকতা
পারভীন সুলতানা রাব্বী

৩৭ বাংলাদেশে গণমাধ্যম সাক্ষরতার সাম্প্রতিক চিত্র
সংকলন: সৈয়দ কামরুল হাসান ও উর্মিলা সরকার

৪১ সামরিক বাহিনী ও গণমাধ্যম
নূর ইসলাম হাবিব

৪৪ মোবাইল সাংবাদিকতা কেন, কীভাবে
নাসিমূল আহসান

৪৯ মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো
নাসিরুদ্দিন চৌধুরী

৫৯ মুক্তিযুদ্ধের কয়েকটি ঘটনা
স্বপন দাশ গুপ্ত

৬৩ আমার যুদ্ধদিন
মতিউর রহমান মতি

৬৯ গণমাধ্যম সংবাদ

৭৪ পিআইবি সংবাদ

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি'র সকল প্রকাশনা অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com
এবং বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

মূল্য ২০ টাকা

নিরীক্ষা

২২৭তম সংখ্যা
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯

সূচিপত্র

আমরা প্রতিনিয়ত পত্রিকার পাতায় অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদ দেখি। সংবাদপত্রে অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদের আধেয় (Content) বেশি থাকে। এমন একটি দিন পাওয়া যাবে না যেখানে সংবাদের পাতায় অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদ নেই। অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদের আওতাও বিশাল। ছিঁচকে চোরের চুরির ঘটনা থেকে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার ঘটনাপ্রবাহ এর আওতাধীন। এছাড়া রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের অনেক হত্যাকাণ্ড, বিদ্রোহ, প্রতিবাদ ও সহিংসতাও অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদের অন্তর্ভুক্ত।

দেখুন- পৃষ্ঠা ৫

আমাদের ভেতর সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম অধ্যয়নের সঙ্গে যাদের একধরনের পরিচয় আছে, তাদের কাছে একটি কথা অত্যন্ত প্রচলিত; আর তা হলো– Good news is no news. অর্থাৎ ভালো সংবাদ আসলে সংবাদ নয়। আমার ঠিক জানা নেই এই আপ্তবাক্যটি আসলে কে, কবে কিংবা কোথায় বলেছিলেন। কিংবা নির্দিষ্ট কেউ আদৌ বলেছিলেন নাকি বহুল ব্যবহারের ফলে এটি প্রচলিত হয়েছে।

দেখুন- পৃষ্ঠা ১৯

তথ্যপ্রযুক্তি বদলে দিচ্ছে সব। খুব সকালে গরম চায়ের কাপের সঙ্গে পত্রিকা পড়ার গল্পটা সেকেলে হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। নিউমিডিয়া আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পালটে দিচ্ছে মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রির প্রচলিত পাঠক-মালিক-সাংবাদিক সম্পর্কের ধারণা। সংবাদ তৈরি আর বিতরণে মিডিয়া কোম্পানিকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

দেখুন- পৃষ্ঠা ৪৪

আমাদের ব্রাভো কোম্পানি মিরকামারি গ্রামে। গ্রামটি ঈশ্বরদী থানা সদরের পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প থেকে মাত্র তিন মাইলের মধ্যে অবস্থিত। ... কারণ, তাঁর বড়ো জামাই সিরাজুল ইসলাম মন্টু আমাদের কোম্পানি কমান্ডার। শুনেছি, যুদ্ধের আগে তিনি পাকিস্তানি বিমানবাহিনীতে চাকরি করতেন। তবে কী চাকরি, সেটা আর জানা হয়নি।

দেখুন- পৃষ্ঠা ৬৩

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ● ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

গণমাধ্যম সাংবাদিকদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদের সার কথা

মো. মিনহাজ উদ্দীন

অপরাধের প্রতি মানুষের আগ্রহ চিরন্তন। মানুষ অপরাধ সংক্রান্ত ঘটনা জানতে চায়, শুনতে চায়, পড়তে চায় পত্রিকার পাতায়। অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদের মূল উদ্দেশ্য দুটি।
এক. অপরাধবিষয়ক তথ্য বা সংবাদ মানুষকে জানানো।
দুই. অপরাধ বিষয়ে সচেতন করা।

আমরা প্রতিনিয়ত পত্রিকার পাতায় অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদ দেখি। সংবাদপত্রে অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদের আধেয় (Content) বেশি থাকে। এমন একটি দিন পাওয়া যাবে না যেখানে সংবাদের পাতায় অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদ নেই। অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদের আওতাও বিশাল। ছিঁচকে চোরের চুরির ঘটনা থেকে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার ঘটনাপ্রবাহ এর আওতাধীন। এছাড়া রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের অনেক হত্যাকাণ্ড, বিদ্রোহ, প্রতিবাদ ও সহিংসতাও অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদের অন্তর্ভুক্ত।

আমরা প্রতিনিয়ত পত্রিকার পাতায় অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদ দেখি। সংবাদপত্রে অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদের আধেয় (Content) বেশি থাকে। এমন একটি দিন পাওয়া যাবে না যেখানে সংবাদের পাতায় অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদ নেই

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা, জজ মিয়া ও অপরাধ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

একটি অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদ ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। একটি যথাযথ অনুসন্ধানী বা ব্যাখ্যামূলক অপরাধবিষয়ক সংবাদ উন্মোচন করতে পারে গভীর কোনো রহস্য। যেমন– বাংলাদেশের ইতিহাসে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট ঘটনাপ্রবাহের প্রতিবেদন। ২০০৫ সালে প্রথম আলো আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সমাবেশে গ্রেনেড হামলা নিয়ে দুটি গভীরতর প্রতিবেদন (Depth Report: Investigation and Interpretation)

প্রকাশ করেছিল। ২০০৫ সালের ২৯ জুন প্রথম আলো যে প্রতিবেদন দুটি প্রকাশ করে এর শিরোনাম ছিল: 'সেই জজ মিয়া তারকা সন্ত্রাসী' ও 'এই গল্পের গাঁথুনি দুর্বল: স্বীকারোক্তিতে সাত অসঙ্গতি'।

এই দুটি অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদন ওই সময় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি করেছিল। ওই সময় বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ঘৃণ্য এই হামলাকে ভিন্নপথে পরিচালিত করে। সেই লক্ষ্যে নোয়াখালীর সেনবাগের জজ মিয়াকে আটক করে টানা ১৭ দিন রিমান্ডে রেখে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজি করানো হয়। যার ভিত্তিতে জজ মিয়া ২১ আগস্টের জঙ্গিবাদবিরোধী সমাবেশে গ্রেনেড হামলা করার দায় স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দেন। আদালতে দেওয়া স্বীকারোক্তিতে জজ মিয়া দাবি করেন, বড়ো ভাইদের দেওয়া ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে তিনি এই হামলা চালিয়েছেন! প্রকৃতপক্ষে সবই ছিল সাজানো নাটক। যে নাটকের পর্দা ফাঁস করেছিল ওই পত্রিকার দুটি প্রতিবেদন। এছাড়া ২০০৬ সালের ২১ আগস্ট ঘৃণ্য এই হামলা নিয়ে আরও একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল পত্রিকাটি, যার শিরোনাম ছিল: 'জজ মিয়ার পরিবারকে টাকা দেয় সিআইডি'। যার মাধ্যমে পুরোটা উন্মোচিত হয়েছিল ২১ আগস্ট হত্যাযজ্ঞ নিয়ে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের নীলনকশার বিস্তারিত বিবরণ।

শুধু ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলাই নয়, আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে অপরাধপ্রবণতা বেশি হওয়ায় প্রতিনিয়ত এর প্রতিফলন দেখা যায় গণমাধ্যমে। এ কথা বলাই যায়, বাংলাদেশে গণমাধ্যমের সিংহভাগ সংবাদ উপাদানই অপরাধকেন্দ্রিক। মাঝেমধ্যে অপরাধ সংক্রান্ত অনেক ঘটনা 'টক অব দ্য কান্ট্রি'তে পরিণত হয়। যেমন– খুনি এরশাদ শিকদারের ঘটনাপ্রবাহ, সিরিয়াল কিলার রসু খাঁর হত্যা ও অপরাধের ঘটনা, ঐশী রহমান কর্তৃক তার পুলিশ কর্মকর্তা বাবা ও মাকে হত্যা, সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ড, বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার হত্যাকাণ্ড, এমনকি অভিনেত্রী মিথিলার আপত্তিকর ছবি অনলাইনে ছড়িয়ে পড়াসহ অন্যান্য সংবাদ। এছাড়া হত্যা, ধর্ষণ আর নারী নির্যাতনের নিত্যদিনের খবরাখবর তো আছেই।

অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদ কী এবং কেন?

অপরাধ কী? এর সহজ সংজ্ঞায় বলা যায়, অপরাধ হলো আইনবিরোধী কর্মকাণ্ড। আইনের নীতিমালা বা ধারাপরিপন্থি যা, তা-ই অপরাধ। দেশ-কাল-পাত্রভেদে অপরাধের মাত্রা ও পরিধি আলাদা, ভিন্ন ভিন্ন।

অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদ নিয়ে বিশেষ সংজ্ঞা দিয়েছেন সাংবাদিক 'Richard Critchfield'. সাংবাদিক Richard ওয়াশিংটন স্টার পত্রিকায় চার বছর কাজ করেছেন। ওই সময় তিনি মূলত এই পত্রিকার হয়ে ভিয়েতনাম যুদ্ধ কাভার করেন। এছাড়া তিনি থার্ড ওয়ার্ল্ড, দি ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন, দি ইকোনমিস্ট, দ্য ক্রিস্টিয়ান সায়েন্স মনিটরসহ বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করেছেন। এছাড়াও নিবন্ধ লিখেছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। Richard একসময় The Indian Reporter's Guide লিখতেন। তাতে তিনি অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদের বিশেষ এক ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। 'Richard Critchfield' বলেন:

> 'While speech reporting trains the ear and sports reporting the eye, Crime coverage gives the new reporter a board range of events on which to exercise his talent, usually providing action stories with a narrative as well as drama.' (Kamath, 1980)

এই সংজ্ঞাকে বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়:

> 'যখন বক্তব্যনির্ভর প্রতিবেদন উপযোগী করে গড়ে তোলে আমাদের কানকে এবং খেলাধুলা সংক্রান্ত প্রতিবেদন চোখকে, তখন অপরাধ সংক্রান্ত প্রতিবেদন একজন নতুন প্রতিবেদককে বড়ো পরিসরে তাঁর মেধা প্রদর্শনের সুযোগ করে দেয়। প্রতিবেদক নাটকীয় ও সরাসরি অ্যাকশন বা কার্যকারণ সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারে।' (কামাথ, ১৯৮০)

অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদের আওতা

১. হত্যা বা খুন, শারীরিক আঘাত
২. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড (১৫ আগস্ট, ২১ আগস্ট, রমনার বটমূলে বোমা হামলা, সিপিবির সমাবেশে হামলা, উদীচীর অনুষ্ঠানে হামলা ইত্যাদি)
৩. অপহরণ বা জিম্মি
৪. গুম
৫. চোরাচালান
৬. ছিনতাই
৭. ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ
৮. প্রতারণা (পরকীয়া, নানা সমীকরণের সম্পর্ক)
৯. দখলদারিত্ব
১০. আধিপত্য বিস্তার
১১. নারী নির্যাতন
১২. শিশু নির্যাতন
১৩. নারী ও শিশু পাচার
১৪. ধর্ষণ, বিকৃত যৌনতা, যৌন হয়রানি
১৫. এসিড সন্ত্রাস
১৬. অঙ্গহানি বা জখম
১৭. জঙ্গিবাদ
১৮. মাদক
১৯. সাইবারজগতে অপরাধ। (সূত্র: দ্য কমপ্লিট রিপোর্ট (১৯৯৬): জুলিয়ান হ্যারিস ও স্ট্যানলি জনসন)

অপরাধবিষয় সাংবাদিকতা ও ভিকটিম (যিনি অপরাধের শিকার)

অপরাধ সংক্রান্ত সাংবাদিকতায় ভিকটিম অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একজন ভিকটিম বা অপরাধের শিকার ব্যক্তির বক্তব্য একটি আদর্শ অপরাধ সংক্রান্ত প্রতিবেদনের মূল উপজীব্য হতে পারে। ভিকটিম সাধারণত তিন ধরনের তথ্য (স্টেটমেন্ট বা জবানবন্দি) দিয়ে থাকেন। যথা:

ক. ঘটনাস্থলে সাংবাদিক বা অন্যকে অপরাধ সংঘটনের বর্ণনা।
খ. থানায় বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে বিবরণ তুলে ধরেন।
গ. আদালতে বিচারিক প্রক্রিয়ার সামনে বক্তব্য তুলে ধরেন।

এই বক্তব্যগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন চৌকস প্রতিবেদক যেমন এই বর্ণনাগুলো সংবেদনশীল মন নিয়ে মনোযোগ দিয়ে শোনেন আবার এসব তথ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করে থাকেন। মনে রাখতে হবে, অনেক সময় ভিকটিম অন্যকে ফাঁসানোর জন্য মিথ্যা তথ্যও দিতে পারেন। ভুল তথ্য উপস্থাপন করে অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারেন।

কোনো অপরাধ সংঘটনের পর ভিকটিমের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কথাও বিবেচনায় আনতে হবে। যদি ভিকটিম শারীরিক-

মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হন, তাহলে তার বক্তব্য না নেওয়াই ভালো। যেমন– ধর্ষণের শিকার কোনো নারীর বক্তব্য নেওয়া খুব প্রাসঙ্গিক নয়। তবে তিনি যদি সুস্থ থাকেন এবং নিজে বর্ণনা দিতে চান, তাহলে প্রতিবেদক ওই বক্তব্য শুনবেন। কিন্তু তা যাচাই-বাছাই করেই প্রতিবেদনে ছাপতে হবে। একজন ভিকটিমের বক্তব্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা একটা ঘটনা থেকে বোঝা যায়। ২০১৭ সালের ৩০ জুলাই উত্তরবঙ্গের বগুড়া শহরে একটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। এক কিশোরী ধর্ষণের শিকার হন। পরে তাঁর মা ও তাঁকে মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হয়। এতে পুরো দেশে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছিল। ওই ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় সিরিজ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রথমদিনের প্রতিবেদনে প্রথম আলো ধর্ষণের শিকার ওই কিশোরীর বক্তব্য ছাপে। প্রতিবেদনের একপর্যায়ে ওই কিশোরীকে কোট করে বলা হয়:

> 'মাস দেড়েক আগে সে রিকশায় চড়ে যাচ্ছিল। পথে চকযাদু ক্রস লেনে শ্রমিক লীগ নেতা তুফান সরকারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামনে রিকশা থামান তাঁর সহযোগী আলী আজম। তিনি মেয়েটির মুঠোফোন নম্বর চান। সে একটি ভুয়া নম্বর দিয়ে চলে যায়। সপ্তাহখানেক পর তাঁর নম্বর সংগ্রহ করে ফোন দেন তুফান সরকার। নানা জিজ্ঞাসার একপর্যায়ে মেয়েটি বলে, তাঁকে সরকারি আজিজুল হক কলেজে ভর্তির সব ব্যবস্থা করে দেবেন। এজন্য এসএসসি পাসের কাগজপত্রসহ চার হাজার টাকা দিতে বলেন। কথামতো সে তুফানের সহযোগী আলী আজমের হাতে টাকাসহ কাগজপত্র পাঠিয়ে দেয়।' (প্রথম আলো, ৩০ জুলাই ২০১৭)

মেয়েটি আরও জানায়, ১৭ জুলাই তুফান সরকার তাকে ফোন দেন। তখন তুফান তাকে বলেন, 'ভর্তি করানো সম্ভব হয়নি, তুমি বাসায় এসে কাগজপত্র নিয়ে যাও।' কিন্তু সে বাসায় যেতে রাজি হয়নি। এরপর তুফান সরকার তাঁর সহযোগীদের মাধ্যমে ব্যক্তিগত গাড়ি পাঠিয়ে মেয়েটিকে নিজের বাসায় তুলে নিয়ে যান। এ সময় বাসায় তুফানের স্ত্রী ছিলেন না। সেখানে মেয়েটিকে ভয়ভীতি দেখিয়ে তিনি ধর্ষণ করেন। এতে মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ সময় তুফান তাঁর ক্যাডার আতিকুর রহমানকে ওষুধ কিনে দিতে বলেন। আতিকুর স্থানীয় দোকান থেকে ওষুধ কিনে দিয়ে তাকে বাসায় পৌঁছে দেন। আর ধর্ষণের বিষয়টি ফাঁস না করার জন্য ভয় দেখানো হয়।

এই বর্ণনার পুরো ঘটনা সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিবেদক ওই বক্তব্য সংগ্রহ করে আরও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেন। তবে পুরো প্রতিবেদনের মধ্যে ভিকটিমের ওই বর্ণনা ছিল সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য।

উপরের ঘটনায় ভিকটিম পুরো বিষয়টির বর্ণনা দিতে সক্ষম ছিলেন। তবে মনে রাখতে হবে, অনেক সময় ভিকটিম পুরো ঘটনার বর্ণনা দেওয়ার মতো মানসিক বা শারীরিক অবস্থায় না-ও থাকতে পারেন। তারা আতঙ্কিত থাকতে পারেন। ঘটনার প্রেক্ষাপটে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হতে পারেন। সেক্ষেত্রেও ভিকটিমের বক্তব্য গুরুত্ব পাবে। এমন একটি উদাহরণ পাওয়া যায় 'নিউজ রিপোর্টিং অ্যান্ড রাইটিং' বইয়ের 'গেদারিং অ্যান্ড রাইটিং ক্রাইম নিউজ' অধ্যায়ের আলোচনায়। ধরে নেওয়া যাক, কোনো ব্যাংকে ডাকাতি হয়েছে। একজন তরুণ প্রতিবেদক গেছেন সেটা কাভার করতে। প্রতিবেদক যখন ঘটনাস্থলে একজন ভিকটিমের সঙ্গে কথা বলতে পারলেন। আতঙ্কিত ওই ভিকটিম শুধু বলছিলেন 'বিগ ব্ল্যাক গান, বিগ ব্ল্যাক গান, বিগ ব্ল্যাক গান'। তখন তিনি কী করবেন। প্রতিবেদক অফিসে পৌঁছে যখন ঘটনাটি দায়িত্বরত নিউজ এডিটরকে জানালেন, তখন চৌকস নিউজ এডিটর বললেন, এটাই শিরোনাম কর– 'বিগ ব্ল্যাক গান'।

'রায়প্রবণ' অপরাধ সাংবাদিকতা

মনে রাখতে হবে, অপরাধ সংক্রান্ত সাংবাদিকতা খুবই সংবেদনশীল। নিশ্চিত না হয়ে প্রতিবেদনে কাউকে দোষী করার প্রবণতা খুবই ভয়ংকর। প্রকৃতার্থে, 'অভিযুক্ত' ও 'দোষী সাব্যস্ত' এই শব্দের মধ্যে যোজন যোজন দূরত্ব। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিভাগের এক সহযোগী অধ্যাপকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় ২০১৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর। পুলিশি তদন্তে জানা যায়, তিনি ক্ষতিকর রাসায়নিক পান করে আত্মহত্যা করেছেন। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয় একটি সুইসাইড নোট। তাতে তিনি প্রচণ্ড মানসিক চাপের কথা উল্লেখ করেন। এরপর বিভিন্ন গণমাধ্যমে তাঁর সাবেক স্বামী ওই একই বিভাগের এক সহযোগী অধ্যাপককে জড়িয়ে বিভিন্ন রকমের সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। বিভিন্ন গণমাধ্যম প্রচ্ছন্নভাবে এই অপমৃত্যুর জন্য তাঁকেই দায়ী করে। এদিকে অভিযুক্ত ওই সহযোগী অধ্যাপক ভিকটিমের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর ওই বিভাগেরই একজন শিক্ষার্থীকে (পড়াশোনা শেষ হওয়ার পর) বিবাহ করেছিলেন। ফলে ঘটনাটি নানা মাত্রা পায়। বিভিন্ন কল্পকাহিনি, নানা উপাদানযুক্ত করে সংবাদ প্রকাশিত ও সম্প্রচার হতে থাকে। একপর্যায়ে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে কিছু একাডেমিক ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু মামলার তদন্ত থেকে দেখা যায়, ওই ঘটনায় তার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। বিভাগের অপর এক শিক্ষকের সঙ্গে ভিকটিম নতুন করে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন। ওই সম্পর্কের জের ধরেই প্রচণ্ড মানসিক চাপে তিনি আত্মহত্যা করেন। পুলিশি তদন্তে সেটাই উঠে আসে। এরপর গ্রেফতার হন তিনি। অথচ শুরু থেকে সন্দেহ আর ইঙ্গিতের বশে অভিযুক্ত একজনের চরিত্রহনন করা হয়েছে। তার ব্যক্তিগত জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলা হয়েছে, যা করেছে দেশের গণমাধ্যম। বিষয়টি খুবই নেতিবাচক। অবশ্যই বর্জনীয়।

সাংবাদিকতার আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে কোনো অপরাধ সংক্রান্ত ঘটনা যদি বেশি সংবেদনশীল হয়, তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামও প্রকাশ করা হয় না। কারণ যদি পরে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন,

এই বর্ণনার পুরো ঘটনা সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিবেদক ওই বক্তব্য সংগ্রহ করে আরও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেন। তবে পুরো প্রতিবেদনের মধ্যে ভিকটিমের ওই বর্ণনা ছিল সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য

তাহলে অভিযুক্ত প্রেক্ষাপটেই তার সম্মানহানি হয়। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে থিসিস নকলের অভিযোগ ওঠে। মনে রাখতে হবে, বিষয়টি অভিযোগ। এই খবরটি দেশের শীর্ষ সংবাদপত্র 'প্রথম আলো' প্রকাশ করে। প্রকাশিত হয় অন্যান্য অনলাইন সংবাদমাধ্যমেও। প্রথম আলো সংবাদটি প্রকাশ করলেও তাতে অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম প্রকাশ করেনি। সাংবাদিকতার মানদণ্ডে অভিযুক্ত হিসেবে নাম প্রকাশ করা যেত। কিন্তু তারপরও পত্রিকাটি বিশেষ মানদণ্ড বজায় রেখে তাদের নাম-পরিচয় প্রকাশ করেনি। বিষয়টি খুবই যুক্তিযুক্ত। যথাযথ সাংবাদিকতার ভালো উদাহরণ। যদিও অন্যান্য পত্রিকা অভিযুক্তের নাম-পরিচয়, এমনকি ছবিসহ সংবাদটি প্রকাশ করে, যা ভীষণ নেতিবাচক। অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদ তৈরিতে সব সময় মনে রাখতে হবে, এতে যেন কারও মর্যাদাহানি না হয়।

অপরাধ সংক্রান্ত সাংবাদিকতা: বব এগিংটনের দিকনির্দেশনা

বব এগিংটন (Bob Eggington) বিশ্ব সাংবাদিকতাজগতে এক সুপরিচিত নাম। দীর্ঘ ৪০ বছর তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে সাংবাদিকতা করে গেছেন। যার মধ্যে ৩০ বছর তিনি সাংবাদিকতা করেছেন বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যম ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশনে (বিবিসি)। তিনি বিবিসির রাজনৈতিক অনুষ্ঠানগুলোর সম্পাদক ছিলেন। ছিলেন বিবিসি নিউজের সম্পাদক। কর্মজীবনের শেষ পদবি হিসেবে তিনি বিবিসি অনলাইনের প্রধান ছিলেন। ২০০০ সাল থেকেই তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরামর্শক হিসেবে কাজ শুরু করেন। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিক তার কাছ থেকে নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। রয়টার্স, ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল, ওয়েলকাম ট্রাস্ট, দ্য ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিস এবং কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি সাংবাদিকতা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বিনিময় ও প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন। তিনি জর্জিয়া, ক্যামেরুন, বতসোয়ানার গণমাধ্যম সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত।

যারা অপরাধ সংক্রান্ত সাংবাদিকতায় নবীন, মাত্র শুরু করেছেন এই অঙ্গনের সংবাদ কাভারেজ, তাদের জন্য বব এক বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন। যার মাধ্যমে একজন প্রতিবেদক নিজেকে আদর্শ অপরাধবিষয়ক সাংবাদিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। এগিংটনের নির্দেশনাগুলো হলো:

১. **সাংবাদিকতার মূল কাঠামোগুলো মেনে চলা (Everything is built on the basics of good journalism):** অপরাধ সংক্রান্ত সাংবাদিকতা সাংবাদিকতাজগতের একেবারের বাইরের কিছু নয়। তাই এ বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে একজন প্রতিবেদককে সাংবাদিকতার মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে। সংবাদ কীভাবে লিখতে হয়, 'ষড়-ক' পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সাংবাদিক ভালোভাবে জানবেন। আরও কিছু বিষয়ে প্রতিবেদক নজর রাখবেন, যেমন– প্রতিবেদন যথার্থ হলো কি না, বানানগত শুদ্ধতা বজায় আছে কি না, বাক্যগঠন ঠিকঠাক হচ্ছে কি না, প্রতিবেদন তৈরির পেছনে যৌক্তিক কারণ আছে কি না? প্রতিবেদনে ঘটনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে লিখতে হবে, কোনো কিছু দ্ব্যর্থবোধক হবে না, পাঠকের আগ্রহ আছে– এমন বিষয় নিয়েই রিপোর্ট তৈরি করতে হবে।

২. **সফলতার চাবিকাঠি একাগ্রতা (Success is built on integrity):** একজন অপরাধ সংক্রান্ত প্রতিবেদকের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবন তিরস্কারের ঊর্ধ্বে নয়। প্রতিবেদক ভুল করবেন, তারপর তা থেকে শিখবেন। তাই একজন ক্রাইম রিপোর্টারকে বিনয়ী, সৎ, সুবিবেচক, বিশ্বাসযোগ্য, ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। সর্বোপরি একজন প্রতিবেদকের একাগ্রতা থাকতে হবে। অবশ্যই সহানুভূতিশীল হতে হবে। ক্ষমার অপব্যবহার করা যাবে না। নিয়মানুবর্তী হতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে এবং ভালো সহকর্মী হতে হবে।

৩. **সব তথ্য-উপাত্ত এক জায়গায় নিয়ে আসা (Gather all facts):** শুধু অপরাধ সংক্রান্ত সাংবাদিকতায়ই নয়, অন্যান্য বিটের সংবাদের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি প্রযোজ্য। একজন ভালো সাংবাদিক সবকিছুই জানবেন। বিভিন্নজনের কাছ থেকে তথ্য নেবেন। যত বেশি সম্ভব উৎস থেকে সংবাদ সংগ্রহ করবেন। সেগুলো যথাযথভাবে যাচাই করবেন। এই ধারা মেনেই অপরাধ সংক্রান্ত সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকার সাংবাদিক জোসেফ পুলিৎজার (জীবনকাল: ১৮৪৭-১৯১১, তার নামে পুলিৎজার পুরস্কারের প্রচলন হয় ১৯৭১ সালে) অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদ প্রতিবেদনে খুবই আগ্রহী ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে রিপোর্টিং করার জন্য সাংবাদিকদের বলতেন 'Details, details and details.' অর্থাৎ বিস্তারিত, বিস্তারিত, আরও বিস্তারিত।
বর্তমান সময়ের পাঠক খুবই সচেতন। তারা কোনো একটি অপরাধ ঘটনার খুঁটিনাটিসহ জানতে চান। আর তাই একজন ক্রাইম রিপোর্টারকে ঘটনার গভীরে গিয়ে সবটুকু পাঠকের সামনে তুলে ধরতে হবে। জানাতে হয় সবদিকের তথ্য।

৪. **অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদের জগৎ সম্পর্কে খোঁজ রাখা বা নিজের শক্তি সম্পর্কে জানা (Know your patch):** কোনো অপরাধ সংঘটিত হলেই বা কোনো ঘটনা ঘটলেই একজন অপরাধবিষয়ক সাংবাদিক প্রতিবেদন করবেন বা কাজ করবেন তা নয়। তাকে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা, সরকারি মুখপাত্র, কোর্ট, প্রেস কর্মকর্তাদের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হবে। এমন সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে যেন তাদের ফোন নম্বর-যোগাযোগের ঠিকানা যেমন তার কাছে থাকবে, তেমনি তার ফোন নম্বরও তাদের কাছে থাকবে। বড়ো কোনো ঘটনা ঘটলেই যেন তারা প্রতিবেদককে জানাতে পারে। আর মনে রাখতে হবে, বর্তমান সময়ের সাংবাদিকতা বেশি প্রতিযোগিতাপূর্ণ। সবাই দ্রুত সংবাদের পেছনে ছুটতে থাকেন। সবারই সবশেষ তথ্য চাই গ্রহণযোগ্য উৎসের বরাত দিয়ে। তাই বর্তমান সময়ে অপরাধ সংক্রান্ত সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যোগাযোগ বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, যা প্রতিটি অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকের বা ক্রাইম রিপোর্টারের মেনে চলা জরুরি।

৫. **অপরাধীদের সঙ্গে যোগাযোগে সতর্কতা (Dealing with criminals):** একজন ভালো ক্রাইম রিপোর্টার হতে হলে অপরাধীদের সম্পর্কেও জ্ঞান রাখতে হবে। তাদের প্রবণতা, দুর্বলতা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। যদিও কাজটি একটু বিপজ্জনক। খুব একটা নিরাপদ নয়। অপরাধীর বক্তব্য শুনতে বা তার সঙ্গে কথা বলার সময় অবশ্যই মনে রাখতে হবে আপনি একজন প্রতিবেদক। এক্ষেত্রে আবেগপ্রবণ বা সহযোগিতাপ্রবণ হওয়ার সুযোগ নেই। এছাড়া ঝুঁকির বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে। সংবাদের ক্ষেত্রে প্রতিবেদক যখন কোনো অপরাধীর সঙ্গে কথা বলতে যাবেন, তখন অবশ্যই তাকে সব বিষয় নোট করে রাখতে হবে, ঝুঁকি এড়িয়ে চলতে সম্পাদককে জানিয়ে রাখতে হবে আপনি কোথায় যাচ্ছেন এবং কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। অপরাধীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করলেও বন্ধু হওয়া যাবে না। অপরাধীর সঙ্গে দেখা করার জন্য তাকে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া যাবে না বা সন্ধি করা যাবে না। এতে রিপোর্টার দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়তে পারেন।

৬. **সংবাদসূত্রের সঙ্গে সম্পর্ক (Dealing with sources):** সংবাদসূত্র একজন সাংবাদিকের সবচেয়ে বড়ো শক্তি। যার সূত্র যত শক্তিশালী, তিনি তত সফল সাংবাদিক। অফিসে অবধারিতভাবেই তার গুরুত্ব বেশি। উৎস বা সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

   ক. **অন দ্য রেকর্ডস (On the Records):** অন দ্য রেকর্ড সংবাদ প্রকাশ খুবই ইতিবাচক চর্চা। প্রতিবেদনে সূত্র বা উৎসের উল্লেখ করা খুবই জরুরি। এতে প্রতিবেদকের ওপর আস্থা বাড়ে। প্রতিবেদন বিশ্বাসযোগ্য হয়। একজন অপরাধবিষয়ক সাংবাদিক অবশ্যই এই চর্চা করবেন।

   খ. **অফ দ্য রেকর্ডস (Off the Records):** অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতা, উৎস বা সূত্র নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চান। সেক্ষেত্রে উৎস বা সূত্রের কাছ থেকে প্রতিবেদক স্পষ্টভাবে জেনে নিবেন যে তিনি উৎস বা সূত্রের তথ্যটি কীভাবে ব্যবহার করবেন। এসব সূত্র বা উৎসের গোপনীয়তার ব্যাপারে প্রতিবেদককে সতর্ক হতে হবে। যতক্ষণ পারা যায় যেমন– নিজেকে (প্রতিবেদক) জেলে যেতে হবে এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আগ পর্যন্ত সূত্র বা উৎসের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।

৭. **ইলেকট্রনিক উপায়ে সংগৃহীত তথ্যের অনিশ্চয়তার ঝুঁকি (Remember all electronically held data is insecure):** কম্পিউটার, মোবাইল ফোন বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইসে থাকা তথ্য খুব একটা নিরাপদ নয়। এই তথ্যগুলো কর্তৃপক্ষ, হ্যাকারদের আক্রমণের মুখে পড়তে পারে। গোপন কিছু সংরক্ষণ করতে হলে অবশ্যই সেই তথ্যের নিরাপত্তার বিষয়টি জোরদার করার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। এছাড়া একজন প্রতিবেদক তার তথ্য-উপাত্ত, ছবি, ভয়েস রেকর্ডিং, ভিডিও রেকর্ডিংসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিল-দস্তাবেজ অবশ্যই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সংরক্ষণ করবেন।

৮. **সততা বজায় রাখা (Keep your hand clean):** শুধু সাংবাদিকতা নয়, যে কোনো পেশার ক্ষেত্রেই সততা এক অপরিহার্য উপাদান। একজন অপরাধবিষয়ক সাংবাদিককে অবশ্যই সৎ হতে হবে। বাংলাদেশের মতো অপরাধপ্রবণ দেশে অনেক সময় প্রতিবেদককে বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দেখানো হয়। একজন প্রতিবেদককে অবশ্যই এই প্রলোভন এড়িয়ে চলতে হবে।
   * কোনো ধরনের উপহার বা উপঢৌকন গ্রহণ করা যাবে না।
   * কোনো ধরনের অপরাধে অংশগ্রহণ না করা বা অপরাধ কর্মকাণ্ডকে ক্ষমা না করা।
   * অপরাধপ্রবণতাকে উসকানি দেয়, এমন কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বিরত রাখা।
   * অপরাধ কর্মকাণ্ড এমনভাবে তুলে না ধরা যাতে অন্য কেউ এ ধরনের কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত হয়।
   * অপরাধীর গুণকীর্তন বা অপরাধ অতি প্রচার করা যাবে না।
   * অপরাধ ঘটনাকে এমনভাবে তুলে ধরা যাবে না যেন অপরাধী এর প্রভাবে তারকা হয়ে যান।

৯. **চাঞ্চল্য তৈরি করা যাবে না (Do not sensationalize):** মানুষ স্বভাবতই অপরাধ ঘটনা সম্পর্কে জানতে একটু বেশি আগ্রহী। অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদ ঘটনাগুলো টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের কাটতি বাড়ায়। লোভ, সহিংসতা, যৌনতা, প্রতিহিংসার মতো শক্তিশালী মানবীয় আবেগই অপরাধ ঘটনার মূল। তাই আগ্রহও বেশি। তবে এই আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে কখনোই অতিরঞ্জন করা যাবে না। কেননা একজন রিপোর্টার যদি অপরাধ ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে তোলে তবে পাঠকের জন্য তা ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১০. **অপরাধের শিকার বা ভিকটিমদের সঙ্গে কার্যকারিতা (Dealing with the victims of crime):** আক্রান্ত ব্যক্তি অর্থাৎ ভিকটিম প্রতিবেদনের মূল সূত্র। তাই ভিকটিমের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সংবেদনশীল হয়ে তার কাছ থেকে ঘটনা শুনে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ওই ব্যক্তি অপরাধ, অন্যায়-অত্যাচার, ক্রোধ বা রাগের শিকার। ঘটনার এমন কোনো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া যাবে না, যাতে ভিকটিমকে হেয়প্রতিপন্ন হতে হয়।

১১. **সন্দেহভাজনের সঙ্গে আলোচনা (Dealing with suspects crime):** মনে রাখতে হবে, যিনি সন্দেহভাজন বা অভিযুক্ত, আদালতে প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি অপরাধী নন। তাই যতক্ষণ আদালতে প্রমাণিত না হচ্ছে, সন্দেহভাজনকে কোনোভাবেই অপরাধী বলে উল্লেখ করা যাবে না। বরং তাকে অভিযুক্ত বলে সব প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে। আর যদি প্রেক্ষাপট খুবই স্পর্শকাতর হয়, তাহলে ওই অভিযুক্তের নাম-পরিচয়ও গোপন রাখা যেতে পারে।

১২. **সংবাদ ব্ল্যাকআউট সামলানো (Handling news blackouts):** অনেক সময় পুলিশ বা অন্য যে কেউ দাবি করতে পারেন– যেভাবে, যে প্রেক্ষাপটে সংবাদ সম্প্রচার বা প্রকাশিত হচ্ছে, এর বাইরেও তিনি কিছু জানেন। এক্ষেত্রে রিপোর্টারকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, তিনি যা বলেছেন, তা পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে না ইচ্ছাকৃতভবে বলেছেন। এই বিষয়টি কারও জীবনের জন্য হুমকি হতে পারে। কেউ নিজে থেকে এ ধরনের তথ্য দিতে চাইলে তার পেছনের উদ্দেশ্য খুঁজে বের করতে হবে রিপোর্টারকে। আর অবশ্যই এরকম ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পাদককে অবগত করতে হবে।

১৩. **রুচি ও মার্জিতবোধ (Taste and decency):** কিছু ঘটনা আছে এতটাই আতঙ্কজনক বা লোমহর্ষক, যে ঘটনাগুলোর বিবরণ না দিলেই নয়। সেক্ষেত্রে নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ রেখে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি নষ্ট না হয় এমনভাবে সতর্কতার সঙ্গে সংবেদনশীল হয়ে রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। ভিকটিম এবং তার পরিবার যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

১৪. **ধারা বজায় (Trend):** একটি অপরাধ ঘটনা হাজার অন্যায়ের জন্মদাতা। অপরাধ ঘটনার কারণে রাষ্ট্র, দেশ বা কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে যেমন রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে, তেমনি বিভিন্ন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকলে তা-ও রিপোর্টে আসবে। একই ধরনের অপরাধ ঘটনা বৃদ্ধি পেলে বা বারবার ঘটলে, এর পেছনে থাকা 'কেন'-এর উত্তর খুঁজে বের করতে হবে।

তথ্যসূত্র

১. কিবরিয়া, গোলাম। (১৯৯১)। মুহম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত সাংবাদিকতা। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

২. Kamath, MV. 1980, Professinal Journalism, India: Vikash Publishing House PTT Ltd.

৩. Harris, J. Jonshson S. (1996), The Complete Report (2nd edition) New York: Macmillan

৪. Moore, Roy L. Murry. Michel D., 2012, Media Law and Ethics, New York & London: Routledge Taylor & Franchis group.

৫. Keir, Gerry, Maxwell, McCombs, Donald, L Show, 1986, Advanced Reporting Beyond News Event. Longman: New York & London.

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

গুজব, ভুয়া সংবাদ এবং অপরাধ রিপোর্টিং

আবুল খায়ের

অপরাধ সাংবাদিকতা করছি ৩৭ বছর। সময়ের সঙ্গে অপরাধের ধরন পালটেছে। পাশাপাশি অপরাধ সাংবাদিকদের চ্যালেঞ্জও বেড়েছে। ডিজিটাল দুনিয়ার অপরাধ ঠেকাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে প্রতিনিয়ত সহায়তা করছেন সাংবাদিকরা। সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে আগামী দিনের বাংলাদেশের বড়ো চ্যালেঞ্জ গুজব ও ভুয়া সংবাদ। এসব কারণে অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকদের দায়িত্ব আরও বেড়েছে। আমি মনে করি,

কোনো কোনো সাংবাদিককে দেখা যায়, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ফেক নিউজ অথবা ভুয়া সংবাদ নিয়ে মূলধারার গণমাধ্যমে প্রকাশ করছেন। সঠিক সংবাদ বেছে নিয়ে প্রকাশ করাই এখন বড়ো চ্যালেঞ্জ।

গুজবে গণপিটুনি

চলতি বছর বেশ কয়েকটি গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পদ্মা সেতুতে মানুষের মাথা ও রক্ত লাগবে বলে গুজব ছড়িয়ে

সময়ের সঙ্গে অপরাধের ধরন পালটেছে। পাশাপাশি অপরাধ সাংবাদিকদের চ্যালেঞ্জও বেড়েছে। ডিজিটাল দুনিয়ার অপরাধ ঠেকাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে প্রতিনিয়ত সহায়তা করছেন সাংবাদিকরা

প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মেলাতে নিজেদের প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার বিকল্প নেই।

কোন ঘটনা গুজব আর কোনটি গুজব নয়, এ বিষয়ে সাংবাদিকদের সতর্ক থাকতে হবে। অনেক সময় গুজব উসকে দিতে দেখা যায় সাংবাদিকদের। কেউ কেউ হয়তো না বুঝেই গুজবের ফাঁদে পা দেন।

পড়লে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ওই ঘটনার পর পুলিশের পক্ষ থেকে ফেসবুকসহ গণমাধ্যমে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। এছাড়া পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষও গুজবের বিরুদ্ধে একটি নোটিশ দেয়। তবুও ঘটে গেছে ভয়াবহ কয়েকটি ঘটনা। দুটি ঘটনা সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছে

মানুষকে। একটি হলো– ঢাকার বাড্ডায় এক নারী তার মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করাতে গিয়ে গণপিটুনির শিকার হয়ে মারা যান। সেই ভিডিও ফেসবুকে ভাইরাল হয়। নারায়ণগঞ্জে ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনিতে মৃত্যু হয়েছে বাকপ্রতিবন্ধী এক ব্যক্তির।

পুলিশ বলছে, ফেসবুকে কিছু গ্রুপ আছে, যেগুলো দেশের বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। এসব গ্রুপে অনেক লাইক দেওয়া আছে। যারা খুবই অ্যামেচার ইউজার, তারা ওখান থেকে এসব শেয়ার দিচ্ছে। তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেই বেশি নজরদারি করা হচ্ছে। তবে এই প্রক্রিয়াটি সময় সাপেক্ষ।

যেভাবে গুজব ছড়ায়

বাংলাদেশে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে বড়ো ম্যাসাকারের একাধিক ঘটনা রয়েছে। অবশ্যই এটি আমাদের জন্য সুখকর নয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গুজব ছড়ানোর জন্য খুবই বিপজ্জনক জায়গা। কারণ, এখানে তিন ধরনের ব্যবহারকারী থাকে। একদল গুজব ছড়ায়, আরেকটি গ্রুপ এসব পোস্ট ছড়ালেও একটি সময় পর আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। আরেকটি গ্রুপ এগুলো দেখে; কিন্তু কিছু করে না। প্রথম দুটি গ্রুপই বেশি বিপজ্জনক।

ফেসবুকের কিছু পোস্টে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগার অভিযোগে ২০১২ সালে কক্সবাজারের রামুর বৌদ্ধপল্লিতে হামলা হয়েছিল। ২০১৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে হিন্দুদের বাড়িঘরে হামলা, ২০১৭ সালে রংপুরের গঙ্গাচড়ার ঘটনাটি গড়িয়েছিল সাম্প্রদায়িক হামলা, পুলিশের গুলি ও একজনের মৃত্যুতে।

লবণ সংকটের গুজব

নভেম্বরে বাংলাদেশে লবণ সংকটের কথা বলে গুজব ছড়ানো হয়। এই গুজবকে পুঁজি করে অতি মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের একটি সিন্ডিকেট ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করেছে। স্বার্থান্বেষী মহলটি লবণের সংকট রয়েছে মর্মে গুজব ছড়িয়ে এর দাম অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা চালায়। এ ধরনের গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় সবাইকে আহ্বান জানায়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, দেশে বর্তমানে সাড়ে ছয় লাখ টনের বেশি ভোজ্য লবণ মজুদ আছে। এর মধ্যে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের লবণচাষিদের কাছে ৪ লাখ ৫ হাজার টন এবং বিভিন্ন লবণ মিলের গুদামে ২ লাখ ৪৫ হাজার টন লবণ মজুদ রয়েছে। এর বাইরে সারাদেশে বিভিন্ন লবণ কোম্পানির ডিলার, পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতার কাছে পর্যাপ্ত লবণ মজুদ রয়েছে বলে জানানো হয়

ফেক নিউজ বা ভুয়া সংবাদ

ডোনাল্ড ট্রাম্পের কল্যাণে 'ফেক নিউজ' শব্দটি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তবে শব্দটির ব্যবহার অতি পুরোনো। আমরা যাকে গুজব বলি, তা ফেক নিউজ ছাড়া আর কিছু নয়। ফেক নিউজ কতটা ক্ষতিকর হতে পারে? ২০১৭ সালের নভেম্বরে রংপুরের সদর উপজেলার ঠাকুরপাড়ায় হিন্দু সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি নাকি ফেসবুকে মহানবি (সা.)-এর অবমাননা করেছে– এই গুজবের ভিত্তিতে ৩০টি হিন্দুবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়, নিহত হয় একজন। পরে জানা গেল, পুরো ঘটনাই মিথ্যা। ২০১২ সালেও পবিত্র কোরআনের অবমাননা করা হয়েছে– এমন গুজব ছড়িয়ে কক্সবাজারের রামু ও উখিয়ায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপাসনালয় ও ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার ইত্যাদি ডিজিটাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কল্যাণে এখন ফেক নিউজ ছড়িয়ে পড়ে দ্রুতগতিতে। ইন্টারনেটের অবাধ ব্যবহারের কারণে যে কেউ যে কোনো সময় মিথ্যা খবর ছড়াতে পারছে। এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে মিথ্যা রটনার নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছে কোনো কোনো দেশের সরকার ও সরকারি গোয়েন্দা সংস্থাও। আমেরিকার নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের ঘটনা সবচেয়ে আলোচিত ও বিতর্কিত উদাহরণ।

> বদলে যাচ্ছে মানুষের চিন্তা, রুচি আর দীর্ঘদিনের চলমান অভ্যাস। এই পরিবর্তনের সঙ্গে বদলে যাচ্ছে অপরাধ সংক্রান্ত সাংবাদিকতার সনাতনী ধারাও। পরিবেশ-প্রতিবেশে ঘটছে অন্য রকম এক রূপান্তর। একজন অভিজ্ঞ অপরাধ সাংবাদিক এই রূপান্তরকে শুধু দেখেই শেষ করেন না, সেগুলোকে তিনি নিবিড় পর্যবেক্ষণেও রাখেন

ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি– যে কারণেই ছড়ানো হোক না কেন, ফেক নিউজ বা গুজব ক্ষতিকর। এসব ছড়ানো অপরাধ। এ ধরনের অপরাধ আমরা কীভাবে ঠেকাব? ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দলের জন্য যা ক্ষতিকর, আমরা তা ঠেকানোর কাজ ব্যক্তিগত ও সম্মিলিতভাবে করে থাকি। যেমন– আমরা চোর-ডাকাত ঠেকাই। ফেক নিউজ ঠেকাতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

আমরা নিজেরাও যার যার মতো এই প্রহরার কাজে নামতে পারি। ফেক নিউজ নজরে এলে তা 'শেয়ার' করার বদলে তাকে ফেক বলে যদি চিহ্নিত করি, তাহলে মিথ্যার আগুন ছড়ানোর বদলে তা থামানো সম্ভব হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা– কী পড়বেন, কী শেয়ার করবেন, তা তো আপনিই ঠিক করছেন। শুধু এই কাজটি যদি একটু দায়িত্বের সঙ্গে করেন, তাহলে বিপদ এমনিতেই কমে আসবে।

ফেক নিউজ চেনা

মোবাইল ফোন আর সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে এখন নতুন শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভুয়া খবর বা ফেক নিউজ ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি। যে কোনো আলোচিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে বস্তুনিষ্ঠ খবরের মাঝে দু-একটা ভুয়া খবর ভাইরাল হওয়া এখন আর নতুন কিছু নয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ঠেকাতে সরকার এরই মধ্যে 'গুজব শনাক্তকরণ সেল' গঠন করলেও ভুয়া খবর ঠেকাতে শুধু আইনের কড়াকড়িই যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। এক্ষেত্রে তারা সামাজিক গণমাধ্যম ব্যবহারে সচেতনতা ও দায়িত্বশীল আচরণের ওপর জোর দেন।

ভুয়া খবর শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে ফ্যাক্ট চেক বা খবরের সত্যতা যাচাইয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করা জরুরি। এখন মানুষের চেহারা, কণ্ঠ– সবই বদলে দেওয়ার মতো প্রযুক্তি এসেছে। এতে মিথ্যা থেকে সত্য আলাদা করাই কঠিন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ভূমিকা আরও বলিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। দেশের প্রতিটি নাগরিককে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সচেতনতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। এ অবস্থায় খবরের ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পরিবর্তে মূলধারার বিশ্বাসযোগ্য গণমাধ্যমের প্রতি নির্ভরশীল হওয়া জরুরি। সামাজিক মাধ্যমে কোনো খবর পাওয়ার পর সেটির নিচে মন্তব্য বা শেয়ার করার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু দায়িত্ব আছে। সেটা মাথায় রাখতে হবে।

মূলত চারটি উপায়ে এই ভুয়া খবর ছড়িয়ে থাকে। ফেসবুক, ইউটিউব, ভুয়া ওয়েবসাইট ও গণমাধ্যম। আর এসব মাধ্যমে প্রকাশিত ভুয়া খবরগুলো ইউজারদের লাইক, কমেন্ট ও শেয়ারের কারণে ভাইরাল হয়ে যায়। আবার কিছু গণমাধ্যম এসব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের তথ্য যাচাই-বাছাই না করেই খবর প্রকাশ করে।

পাঁচটি উপায়ে ভুয়া খবর শনাক্ত করা সম্ভব:

১. কমনসেন্স ব্যবহার করুন
২. খবরের কনটেন্ট বা তথ্য নিয়ে সন্দেহ হলে প্রতিটি যাচাই করুন
৩. অনলাইনে সার্চ দিয়ে যাচাই-বাছাই করে দেখতে পারেন
৪. খবরের তথ্যসূত্র বা ছবি-ভিডিওর উৎস বের করুন
৫. খবরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলুন।

বাংলাদেশে অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতা

আগেই বলেছি, অপরাধ বিটের সাংবাদিকরা এখন বড়ো চ্যালেঞ্জের মুখে। তাই এমন অবস্থায় অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকদের স্পটে যাওয়া, ক্রস চেক করা খুবই দরকার। তবে হতাশার কথা, অনেক সাংবাদিকই স্পটে যান না। অনলাইন পোর্টাল থেকে অথবা অন্য পত্রিকার সহকর্মীর কাছ থেকে তথ্য নিয়ে নিউজ করেন। এই প্রবণতার কারণে ডিজিটাল দুনিয়ার তালে তালে মূলধারার গণমাধ্যমেও ভুয়া খবর প্রকাশিত হয়ে যায়। আর এটির পুরো দায় সাংবাদিকদের নিতে হবে।

অপরাধ বিটটি বেশ ঝুঁকিপূর্ণও বটে। কারণ, এই বিটের সাংবাদিকদের সব সময়ই অপরাধ সংক্রান্ত খবর সংগ্রহের পেছনে থাকতে হয়। অনেক সময় বড়ো বড়ো ক্রাইমের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে তাদের অপারেশনেও যুক্ত হতে হয়। খবর সংগ্রহের জন্য দিনরাত লেগে থাকতে হয়। একই সঙ্গে নিজের অফিসে সব সময় হালনাগাদ তথ্যাদি জানাতে হয়।

অনেক জুনিয়র সাংবাদিক আমার কাছে জানতে চায়, কেমন হবে আগামী দিনের অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতা? আমি বলি, দুনিয়া বদলের সঙ্গে বদলে যাচ্ছে রাজনীতি, অর্থনীতি আর মানুষের স্বাভাবিক যাপিত জীবন। বদলে যাচ্ছে মানুষের চিন্তা, রুচি আর দীর্ঘদিনের চলমান অভ্যাস। এই পরিবর্তনের সঙ্গে বদলে যাচ্ছে অপরাধ সংক্রান্ত সাংবাদিকতার সনাতনী ধারাও। পরিবেশ-প্রতিবেশে ঘটছে অন্য রকম এক রূপান্তর। একজন অভিজ্ঞ অপরাধ সাংবাদিক এই রূপান্তরকে শুধু দেখেই শেষ করেন না, সেগুলোকে তিনি নিবিড় পর্যবেক্ষণেও রাখেন। একজন অপরাধ সাংবাদিককে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে ভালো লিখতে জানতে হবে। ভালো বলার দক্ষতা থাকতে হবে। আর প্রযুক্তিজ্ঞান তো অবশ্যই থাকতে হবে। বিশেষ করে সর্বশেষ প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পারলে টিকে থাকার সুযোগ নেই।

কেস স্টাডি: এক

আমরা কী খাচ্ছি : ২০০৫ সালে ইত্তেফাকে আমি একটি সিরিজ শুরু করেছিলাম। সেটির নাম ছিল 'আমরা কী খাচ্ছি'। ঢাকা শহরে মানুষ কী খায়, ওই সিরিজে সেটা উঠে এসেছিল। কাঁচা সবজিতেও যে ফরমালিন ব্যবহার করা হয়, হোটেলে রাতের আঁধারে চলে যাচ্ছে মরা মুরগি, খাবারে রং মেশানো– এমন বহু বিষয় উঠে আসে প্রতিবেদনে। এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সরকার ম্যাজিস্ট্রেট রোকন-উদ-দৌলার নেতৃত্বে বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত শুরু করে। ভেজাল খাবারের বিরুদ্ধে সেসময় এই অভিযান আলোড়ন সৃষ্টি করে। একটি সিরিজ রিপোর্টের ভিত্তিতেই ভ্রাম্যমাণ আদালত এবং অভিযানে রাজধানীতে খাবারে ব্যাপক একটা পরিবর্তনও এসেছিল।

কেস স্টাডি: দুই

লাশের পেটে হেরোইন : এরশাদের আমলের শেষদিকে গুলিস্তানে ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ডের ফল ব্যবসায়ী আবদুস সালাম পাকিস্তান গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সিদ্দিকবাজারের বাসিন্দা। পকিস্তানে গিয়ে তিনি মারা যান। তার লাশ দেশে আসার পর বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশ হয়, তার পেটে সাড়ে তিন কোটি টাকার হেরোইন রয়েছে। পাকিস্তানের মাদক ব্যবসায়ীরা মাদক পাচারের জন্য তাকে হত্যা করে লাশের পেটে হেরোইন ঢুকিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেয়। তবে ইত্তেফাকের অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে, তার পেটে কোনো হেরোইন ছিল না। বাংলাদেশে আর কোনো পত্রিকায় এভাবে রিপোর্ট ছাপা হয়নি। তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে সালামের লাশের ময়নাতদন্ত হয়। প্রফেসর ডা. মজিবুর রহমান (বেঁচে নেই) ময়নাতদন্ত করেন। রিপোর্টে তিনি উল্লেখ করেন, লাশের পেটে কোনো হেরোইন বা কোনো ধরনের মাদক ছিল না। ময়নাতদন্তে এমন চিত্র উঠে আসার পর ইত্তেফাকের রিপোর্টই সত্য প্রমাণিত হয়। দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হওয়া ঘটনাটি মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

কেস স্টাডি: তিন

মনিরের ফাঁসি: ইত্তেফাকের একসময়ের চিফ রিপোর্টার শহিদ নিজামুদ্দীনের মেয়ে শারমিন রিমা। ১৯৯৪ সালের শেষদিকে তার লাশ সিদ্ধিরগঞ্জের মিজমিজিতে অজ্ঞাতপরিচয় হিসেবে পড়ে ছিল। আমি রিমার মায়ের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, তার মেয়ে স্বামী মনিরের সঙ্গে চট্টগ্রাম গিয়েছিল। এরপর আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। রিমা কী ধরনের শাড়ি পরে গিয়েছিল, সেটার সূত্র ধরেই আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আমিও নারায়ণগঞ্জ মর্গে গিয়ে লাশ শনাক্ত করি। রিমার স্বামী মনির স্ত্রীকে হত্যার কথা অস্বীকার করে। অনুসন্ধান করে আমি বের করি মনিরের সঙ্গে খুকুমণি নামে একটি মেয়ের অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। সূত্রাপুর থানার সামনে বদর হোটেলে আত্মগোপনে ছিলেন মনির। আমাদের তথ্যেই পুলিশ সেখান থেকে তাকে গ্রেফতার করে। কিন্তু সে হত্যার কথা অস্বীকার করতে থাকে। ইত্তেফাকে একের পর এক রিপোর্টে উঠে আসে এই হত্যার তথ্য। দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। পরে নিম্ন আদালত মনির ও খুকুমণিকে ফাঁসির আদেশ দেন। যদিও উচ্চ আদালতে মনিরের ফাঁসি বহাল থাকলেও খুকুমণি খালাস পান।

লেখক: সভাপতি, বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (ক্র্যাব) ও সিটি এডিটর, দৈনিক ইত্তেফাক

অপরাধবিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চোখ খুলে দেওয়ার মতো ঘটনা

সগিরা মোর্শেদ হত্যাকাণ্ডে পুলিশের নতুন আবিষ্কার

জুলফিকার আলি মাণিক

দেশে অপরাধবিষয়ক ঘটনার অনুসন্ধানে এক দারুণ নজরকাড়া দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে সগিরা মোর্শেদ হত্যা মামলা। যদিও এই মামলার অনুসন্ধান পুলিশের। তবুও এখানে অপরাধবিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চাকারী সাংবাদিকদের কিছু শেখার-বোঝার আছে। হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে ১৯৮৯ সালে। কিন্তু পুলিশের দাবি অনুযায়ী ঘটনার সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ৩০ বছর পর, ২০১৯ সালের শেষে। পুলিশের এই নতুন আবিষ্কার যদি সত্যি হয়, তাহলে আরও

প্রমাণ দেয় এবং তাদের ভূমিকা ও সক্ষমতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে। তেমনি ৩০ বছর পরের অনুসন্ধানে উদ্‌ঘাটিত লুকানো সত্য পুলিশের নতুন তদন্ত শাখা পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) দারুণ দক্ষতা ও সক্ষমতার প্রমাণ দেয়। এই অপরাধের ঘটনায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার এক দারুণ সুযোগ ছিল। সেই প্রসঙ্গে আলোচনার প্রারম্ভে ৩০ বছর আগের ঘটনাটি স্মরণ করা দরকার। তিন দশক আগে হত্যাকাণ্ডটি

এই অপরাধের ঘটনায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার এক দারুণ সুযোগ ছিল। সেই প্রসঙ্গে আলোচনার প্রারম্ভে ৩০ বছর আগের ঘটনাটি স্মরণ করা দরকার। তিন দশক আগে হত্যাকাণ্ডটি রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছিল

যে রূঢ় সত্য বেরিয়ে আসে তা হলো– ৩০ বছর আগে এই অপরাধের ঘটনায় গোয়েন্দা পুলিশের তদন্ত ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে শুধু ভুলই ছিল না, সেই তদন্ত ঘটনার প্রকৃত সত্যকে আড়াল করে দিয়েছিল। ফলে এই হত্যাকাণ্ডের প্রথম পুলিশি তদন্ত গোয়েন্দা পুলিশের ব্যর্থতার রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছিল। প্রকাশ্যে রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুলের অদূরে এক ব্যস্ত সড়কে ঘটেছিল নৃশংস ঘটনাটি। সগিরা মোর্শেদ রিকশা করে মেয়েকে আনতে যাচ্ছিলেন ভিকারুননিসা নূন স্কুল থেকে। দুই যুবক মোটরসাইকেলে সগিরার রিকশার পথ

আটকায় এবং ছিনতাইয়ের চেষ্টার একপর্যায়ে গুলি করে হত্যা করে রিকশা আরোহী তিন কন্যার এই জননীকে।

সগিরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা এক নারী ছিলেন। তৎকালে স্বাধীন গণমাধ্যম বলতে শুধু কিছু সংবাদপত্র ছিল। ব্যাপক গুরুত্বের সঙ্গে চাঞ্চল্যকর হত্যা ঘটনার এবং এর ফলোআপ প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল। ঘটনার ধরন, পুলিশের সেসময়ের বক্তব্য ও অনুসন্ধান থেকে যে ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা হলো– রিকশা আরোহী সগিরা মোর্শেদ ছিনতাইকারীদের কবলে পড়েছিলেন এবং ছিনতাইকালে ছিনতাইকারীরা তাকে গুলি করে হত্যা করে। কিন্তু তিন দশক পর পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের অনুসন্ধান বলছে, সেটা আকস্মিক ছিনতাইয়ের মতো ছোটো কোনো অপরাধমূলক ঘটনা ছিল না– পরিকল্পিতভাবে সংঘটিত অপরাধ ছিল এটি।

সবাই যেন ছিনতাই মনে করে, সেভাবেই অপরাধ সংঘটনের পরিকল্পনা সাজানো হয়েছিল। ছিনতাইকারীর হাতে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র, যা দিয়ে দুটি গুলি করা হয়েছিল সগিরাকে। মোটরসাইকেলে করে পালানোর সময় আরও কয়েকটি গুলি করেছিল ছিনতাইকারীর অভিনয় করা হত্যাকারীদের একজন। হত্যাকারীদের হত্যা পরিকল্পনার সাজানো ছকটা যে সবাইকে বিভ্রান্ত করতে বেশ কাজে দিয়েছিল তখন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা সমাজে এই ধারণাটি তারা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল যে, সগিরা ছিনতাইকারীদের কবলে পড়ে নিহত হয়েছেন, যা ছিল প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা ও ভ্রান্ত। ২০১৯ সালের শেষে পুলিশের অধিকতর বা পুনঃতদন্তে লুকানো সত্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সেই ভ্রান্ত ধারণাটিই শক্তপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কারণ, গণমাধ্যম মামলাকে ঘিরে পুলিশি ও আদালতে বিচারিক কার্যক্রমের ঘটনানির্ভর প্রতিবেদন করে আসছিল। উচ্চ আদালতের নির্দেশে সগিরা হত্যা মামলার কার্যক্রম ও অধিকতর তদন্ত নব্বইয়ের দশকের শুরুতে স্থগিত হলে আর নতুন করে কোনো ঘটনা ঘটেনি এই হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে। ফলে ফলোআপ করার মতো দৃশ্যমান নতুন কোনো খবর খুঁজে পায়নি গণমাধ্যম। পত্রিকার পাতা থেকে সগিরা হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি কালক্রমে হারিয়ে যায়। গণমাধ্যম বিষয়টির পেছনে নিজের উদ্যোগেও আর লেগে থাকেনি।

প্রায় তিন দশক পর পুলিশ তদন্তে নেমে সগিরা হত্যাকাণ্ডে লুকানো সত্য যখন আবিষ্কার করল, তখন আবার গণমাধ্যমেও সগিরা হত্যার ঘটনাটি উঠে এলো। পুলিশি তদন্তে হত্যাকাণ্ডটি সম্পর্কে আগের প্রতিষ্ঠিত ভ্রান্ত ধারণাকে নাকচ করে দিয়েছে লুকানো সত্য আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। গণমাধ্যম পুলিশের এই আবিষ্কারকে প্রকাশ ও প্রচার করে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ভ্রান্ত ধারণাকে পালটানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে মাত্র।

সগিরা হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের অনুসন্ধানে যে লুকানো সত্য বেরিয়ে এসেছে, তা স্পষ্টতই বলে দিচ্ছে– এই অপরাধের ঘটনায় দারুণ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার এক সুযোগ ছিল। কেননা একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে গণমাধ্যম এমন একটি লুকানো সত্য আবিষ্কার করে, যা কেউ আগে কখনো উদ্‌ঘাটন করেনি এবং এই আবিষ্কৃত সত্য সেই ঘটনা, বিষয় বা ইস্যু সম্পর্কে অতীতের ভ্রান্ত ধারণাকে নাকচ করে দিয়ে বা পালটে দিয়ে প্রকৃত সত্য প্রতিষ্ঠিত করে। তবে সেটা তখনই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মর্যাদা পাবে, যখন তা হবে সাংবাদিকের একেবারেই নিজস্ব অনুসন্ধান।

অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়েই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হয়, যেখানে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে সত্য লুকিয়ে রাখা বা গোপন করা হয়েছে, কিংবা সত্য চাপা পড়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু হতে হবে জনস্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত। এসব বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় ৩০ বছর আগে সংঘটিত সগিরা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার দারুণ সুযোগ ছিল, যা সাংবাদিকরা গ্রহণ করেননি বা কাজে লাগাননি। এই অনুসন্ধানের কৃতিত্ব পুরোপুরি পুলিশের তদন্ত বিভাগ পিবিআইয়ের। সেটা হলেও এখানে অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকদের জন্য কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বিষয়ে কর্মরত সাংবাদিকদের বহু প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে অংশ নেওয়ার সুযোগ থেকে যে পর্যবেক্ষণ আমার তৈরি হয়েছে, তা হলো– বেশির ভাগ সাংবাদিকের অনুমাননির্ভর ধারণা, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা মানেই অপরাধবিষয়ক ঘটনা নিয়ে অনুসন্ধান করা, অর্থাৎ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন শুধু অপরাধবিষয়ক ঘটনা বা ক্রাইমকে ঘিরে হয়। এমন চিন্তা যে যথার্থ নয়, তা সব সময় স্পষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করি। তবে এই লেখাটি যেহেতু অপরাধবিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে কেন্দ্র করে, তাই আলোচনাটা সেখানে সীমাবদ্ধ রাখাই শ্রেয় মনে করছি। একটা বড়ো বাস্তবতা হলো– অতি সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আমাদের অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতা মূলত পুলিশের দেওয়া তথ্য ও বক্তব্যনির্ভর। আর পুলিশি তদন্তের পর কোনো অপরাধের ঘটনা আদালতে গড়ালে তখন আদালতের ঘটনানির্ভর সাংবাদিকতা হয়ে ওঠে। আমরা সাধারণত ভাবা বা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করি না কিংবা হয়তো সময়-সুযোগ পাই না যে, পুলিশের দেওয়া তথ্য, বক্তব্য ও তদন্ত প্রতিবেদনের পরও সাংবাদিকদের সেখানে আরও কিংবা নতুন কোনো লুকানো সত্য উদ্‌ঘাটনের সুযোগ থাকতে পারে। একটি অপরাধের ঘটনা বিচারিক আদালতে গড়ানোর পর, এমনকি রায় হওয়ার পরও সেখানে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সুযোগ লুকিয়ে থাকতে পারে। সেটা তখনই একজন অপরাধবিষয়ক সাংবাদিক বা ক্রাইম রিপোর্টার জানতে-বুঝতে পারবেন, যখন তিনি ঘটনাস্থলে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে নিজে স্বাধীনভাবে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করবেন এবং পরবর্তী সময়ে পুলিশি ও বিচারিক কার্যক্রমের প্রতিটি নথির সব তথ্য নিয়ে গবেষণা করে সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই করতে পারবেন। এই গবেষণা ও তথ্য যাচাইয়ের কাজটি না করলে একজন অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকের পক্ষে জানা সম্ভব হবে না যে, কোথাও কোনো তথ্যের অসংগতি তৈরি হয়েছে কি না? কোথাও সত্য চাপা পড়ে গেছে কি না? কিংবা সত্য ইচ্ছাকৃতভাবে লুকানো হচ্ছে কি না? এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এসব যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য, সময়সাপেক্ষ এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যয়বহুল কাজ। কিন্তু অপরাধবিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় এই চ্যালেঞ্জগুলো স্বাভাবিকভাবেই থাকবে। সেগুলোকে গ্রহণ করলেই একজন সাংবাদিক যে কোনো অপরাধমূলক ঘটনা থেকে দারুণ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সুযোগ খুঁজে পেতে পারেন এবং তাঁর অনুসন্ধান দিয়ে তিনি শুধু লুকিয়ে রাখা কোনো সত্য আবিষ্কার করে জনসমক্ষেই আনবেন না– রাষ্ট্র, পুলিশ বা আদালতের সেই সংক্রান্ত কার্যক্রমকে আলোর পথ দেখাতে পারবেন। সগিরা হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে এই আলোর পথটি হয়তো জনসমক্ষে সাংবাদিকরাই আগে নিয়ে আসতে পারতেন, যদি প্রথম পুলিশি তদন্তে উদ্‌ঘাটিত তথ্যের (অভিযোগপত্রের) সঙ্গে ঘটনাস্থলের তথ্যের অসংগতি খুঁজে বের করে লুকানো সত্য নিজেরাই আগে উদ্‌ঘাটনের জন্য ছুটতেন।

এ কথা এখানে স্মরণযোগ্য যে, বিগত দেড় দশকে আমাদের দেশে অপরাধবিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার একটি বড়ো অবদান ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলাকে ঘিরে। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার 'জজ মিয়া নাটক' সাজিয়ে একটি ডাহা মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করে সত্যকে চাপা দেওয়ার নীলনকশা করেছিল। তখন গণমাধ্যম সেই জজ মিয়াকে দিয়ে সাজানো নাটক অনুসন্ধান করে জনসমক্ষে নিয়ে এসেছিল। ফলে নীলনকশা অনুযায়ী জজ মিয়া এবং অন্য নিরপরাধ ব্যক্তিরা বলির পাঁঠা হওয়া থেকে রক্ষা পায়। সেই আবিষ্কার একই সঙ্গে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য অনুসন্ধান ও তদন্তের পথ উন্মোচিত রাখে শুধু পুলিশের জন্যই নয়, সাংবাদিকদের জন্যও। অতীতের এমনই অনেক অপরাধমূলক ঘটনা হয়তো আজও পড়ে আছে অবহেলায়, যেগুলো দেশে দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বিষয়বস্তু হতে পারে।

লেখক: অনুসন্ধানী সাংবাদিক

অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদন

রুহুল আমিন রুশদ

কোথাও খুন হয়েছে কিংবা মারামারি, নিদেনপক্ষে কোনো অ্যাকসিডেন্ট? সংবাদমাধ্যমগুলোয় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা শরণাপন্ন হই ক্রাইম রিপোর্টারের। বলি, খোঁজ নাও– এলাকায় এ ধরনের কিছু ঘটেছে কি না! খুন, জখম, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, ধর্ষণ, জালিয়াতি– এমনই কোনো না কোনো বিষয়ের খবর প্রায় প্রতিদিনই সংবাদমাধ্যমগুলোয় আমরা দেখতে পাই। আর এগুলো কাভার করেন যাঁরা, তাঁদেরই আমরা ক্রাইম রিপোর্টার বা অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদক বলি।

কোনো ব্যক্তির আইনবিরুদ্ধ কাজই অপরাধ। দেশ বা অঞ্চলের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রণীত আইনের পরিপন্থি কার্যকলাপকেই অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। সাধারণ ধারণা অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি বা সমাজের সমস্যা সৃষ্টিকল্পে অন্য কোনো ব্যক্তি যেসব কাজ করেন, তা-ই অপরাধ।

অপরাধ সৃষ্টির আদি থেকেই ঘটছে। মানবসমাজ অপরাধমুক্ত নয়। দেশভেদে অপরাধ কমবেশি হতে পারে। কিন্তু অপরাধ একদম ঘটেই না– এমন কোনো দেশ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

অপরাধের ধারণা (Concept of Crime)

রাষ্ট্রীয় আইনে নিষিদ্ধ একটি কাজ হচ্ছে অপরাধ। দেশভেদে অপরাধ পরিবর্তনশীল বলেই অপরাধের মাপকাঠিও পরিবর্তনশীল। একে সামাজিক বিধিবিধান বা মূল্যবোধ-পরিপন্থি আচরণ বলে ধরা হয়।

অপরাধ সৃষ্টির আদি থেকেই ঘটছে। মানবসমাজ অপরাধমুক্ত নয়। দেশভেদে অপরাধ কমবেশি হতে পারে। কিন্তু অপরাধ একদম ঘটেই না– এমন কোনো দেশ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব

অপরাধের সংজ্ঞা (Definition of Crime)

সাধারণত অপরাধ বলতে এমন আচরণকে বোঝায়, যা সমাজের চোখে অন্যায়, সমাজের জন্য ক্ষতিকর এবং শান্তিশৃঙ্খলা-পরিপন্থি।

অর্থাৎ যেসব কাজ সামাজিক রীতিনীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ ও শান্তিশৃঙ্খলার পরিপন্থি এবং আইনবিরোধী, তাকে অপরাধ বলা হয়।

সমাজবিজ্ঞানী বার্নস ও টিটার্স (Burnes and Teeters) বলেন, 'অপরাধ হচ্ছে এমন একধরনের সমাজবিরোধী আচরণ, যা জনসাধারণের সাধারণ অনুভূতির বিরুদ্ধে কাজ করে এবং যা দেশের আইনে নিষিদ্ধ ঘোষিত।'

আর অপরাধ সংক্রান্ত ঘটনার ওপর বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদনকেই অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদন (Crime Report) বলে। অপরাধের বিষয়ে জানতে মানুষের আগ্রহের শেষ নেই। অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদন ছাড়া সংবাদপত্র কিংবা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বুলেটিন কল্পনা করাও কষ্টসাধ্য। অপরাধের ঘটনা জনগণের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এবিষয়ক সংবাদ তাদের খুবই আকৃষ্ট করে। শুধু অপরাধবিষয়ক রিপোর্টের ওপর ভর করে দেশে-বিদেশে অনেক পত্রিকা টিকে আছে।

সাংবাদিকতার নোবেলখ্যাত 'পুলিৎজার পুরস্কার' যার নাম ও অর্থে বিতরণ করা হয়, সেই জোসেফ পুলিৎজারকে তো আমরা সবাই কমবেশি চিনি! 'হলুদ সাংবাদিকতার জনক' হিসেবে তার আর উইলিয়াম র‍্যান্ডলফ হার্স্টের কুখ্যাতি সম্পর্কেও আমরা জানি! পুলিৎজার তার পত্রিকাগুলোকে খ্যাতি আর প্রচারসংখ্যায় শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন মূলত এই অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদনের ওপর ভর করেই। যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৮৩ সালে 'নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড' কিনে পত্রিকাটিকে জনপ্রিয় ও বিনোদনমূলক করে তুলতে গুরুত্ব দেন অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদনের ওপর। পত্রিকার অনেক পাতাজুড়ে ঠাঁই পেতে শুরু করল অপরাধ-কাহিনি। পাঠকের নজর কাড়তে নিউজ স্টোরিগুলোর শিরোনামেও আনেন অভিনবত্ব। যেমন: 'Was He a Suicide?' কিংবা 'Screaming for Mercy.' আট পৃষ্ঠা নিয়মিত আর মাঝেমধ্যে ১২ পৃষ্ঠার পত্রিকার বিনিময়ে তিনি দাম নিতেন মাত্র দুই সেন্ট (১০০ সেন্ট= এক মার্কিন ডলার)। সেসময় নিউইয়র্কের দুই সেন্ট দামের অন্য পত্রিকাগুলো চার পৃষ্ঠার বেশি হতো না। মাত্র দুই বছরের মাথায় 'নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড' নিউইয়র্কের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকে পরিণত হয়। পুলিৎজারের এই সাফল্য হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া উইলিয়াম র‍্যান্ডলফ হার্স্টের মনে একধরনের মুগ্ধতা সৃষ্টি করে। খনিমালিক বাবার কাছ থেকে ১৮৮৭ সালে 'সান ফ্রান্সিসকো এক্সামিনার' পত্রিকার দায়িত্ব নিয়ে মনে মনে সংকল্প করেন সেটিকে পুলিৎজারের পত্রিকার মতো করার। তার নেতৃত্বে পত্রিকাটির ২৪ শতাংশ স্থান ছেড়ে দেওয়া হয় শুধুই অপরাধ-কাহিনির জন্য। অশ্লীলতা আর নগ্নতা ঠাঁই পায় প্রথম পাতায়। অষ্টাদশ শতকের নব্বইয়ের দশকে সান ফ্রান্সিসকো শহরে এই পত্রিকাটি হার্স্টকে কাঙ্ক্ষিত সাফল্যও এনে দেয়। এবার তিনি মনোযোগ দেন নিউইয়র্কের দিকে। পুলিৎজারের ভাই অ্যালবার্টের বেচে দেওয়া 'নিউইয়র্ক জার্নাল' কিনে নেন ১৮৯৫ সালে। এটিকেও জনপ্রিয় করে তুলতে তিনি জোর দেন অপরাধ-কাহিনির ওপর। আর দাম কমিয়ে করেন এক সেন্ট। সুফলও মিলল। অল্পদিনের মধ্যে জার্নালের সার্কুলেশন বেড়ে দাঁড়াল দেড় লাখে। ১৮৯৭ সালের জুনে নিউইয়র্ক সিটির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ইস্ট রিভারের পাড়ে একটি পচাগলা লাশ দেখা গেলে পুলিশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হার্স্ট তার পত্রিকার অনুসন্ধানী রিপোর্টারদের সমন্বয়ে গড়ে তোলা 'মার্ডার স্কোয়াড'কে মোতায়েন করলেন হত্যা রহস্য উদ্‌ঘাটনে। তারা শুধু খুনির পরিচয়ই শনাক্ত করে ক্ষান্ত হয়নি, পরকীয়ার কারণেই যে ওই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, তা-ও বের করতে সক্ষম হয়।

তার নেতৃত্বে পত্রিকাটির ২৪ শতাংশ স্থান ছেড়ে দেওয়া হয় শুধুই অপরাধ-কাহিনির জন্য। অশ্লীলতা আর নগ্নতা ঠাঁই পায় প্রথম পাতায়। অষ্টাদশ শতকের নব্বইয়ের দশকে সান ফ্রান্সিসকো শহরে এই পত্রিকাটি হার্স্টকে কাঙ্ক্ষিত সাফল্যও এনে দেয়

অপরাধের ঘটনা অনুসন্ধান আসলেই বেশ কঠিন কাজ। ক্রাইম বিটের রিপোর্টাররা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে ঘটনার খোঁজখবর নেন। অনেক অপরাধ মানুষের চোখের সামনেই ঘটে। সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর লোকচক্ষুর আড়ালে গোপনে যেসব ঘটনা ঘটে, তাতে অপরাধের নিদর্শন খুব একটা মেলে না। কোনো না কোনো ক্লু অনুসরণ করে জোর অনুসন্ধানের মাধ্যমে ঘটনার তথ্য ও সত্যতা বের করে আনতে হয়।

সাংবাদিকতার বেশকিছু প্রয়োজনীয় কৌশল শেখা যায় অপরাধ সাংবাদিকতা থেকে। আমরা শিখতে পারি, কীভাবে একটা নিউজ স্টোরির জন্য অনুসন্ধান চালাতে হয়, তথ্য জোগাড়ের জন্য কীভাবে মানুষের সাক্ষাৎকার নিতে হয় আর সংবাদমাধ্যমগুলোয় বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে কীভাবে চমকপ্রদ, সাবলীল আর আকর্ষণীয় সংবাদ-কাহিনি লিখতে হয়।

সংবাদমাধ্যমগুলোয় সাধারণত ক্রাইম বিটের রিপোর্টাররাই ক্রাইম রিপোর্টিং করে থাকেন। তাদের অনুপস্থিতিতে জেনারেল বিটের রিপোর্টাররাও সাময়িকভাবে অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদন তৈরিতে ভূমিকা রাখেন। তবে বড়ো সংবাদমাধ্যমগুলোয় ক্রাইম রিপোর্টাররাই এ কাজে নিবেদিত।

অপরাধের প্রকারভেদ

অপরাধ, অপরাধী আর অপরাধের শিকার নানা ধরনের হয়। বড়ো বড়ো অপরাধ যেমন ঘটে, পাশাপাশি ছোটোখাটো অজস্র অপরাধ ঘটছে প্রতিদিন নানা স্থানে।

বাংলাদেশে অপরাধ মূলত নির্ধারিত হয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির আলোকে। 'দণ্ডবিধি ১৮৬০' হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ও শাস্তি সংক্রান্ত প্রাচীনতম ও প্রধান আইন সংকলন। এ বিধির আওতাভুক্ত অপরাধগুলো হচ্ছে: রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ; সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী সম্পর্কিত অপরাধ; সর্বসাধারণের শান্তি বিনষ্টকারী অপরাধ; সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দ্বারা সংঘটিত অথবা তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত অপরাধ; নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধ; সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আইনগত কর্তৃত্বের অবমাননাজনিত অপরাধ; মিথ্যা সাক্ষ্যদান এবং সর্বজনীন সুবিচারবিরোধী অপরাধ; মুদ্রা ও সরকারি ডাকটিকিট সংক্রান্ত অপরাধ; ওজন ও পরিমাপ সংক্রান্ত অপরাধ; জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা এবং সর্বসাধারণের সুযোগ-সুবিধা, শালীনতা ও নৈতিকতা বিনষ্টকারী অপরাধ; ধর্ম সম্পর্কিত অপরাধ; মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর অপরাধ, যেমন– জীবননাশক অপরাধ, গর্ভপাত সংঘটন, অপহরণ, ধর্ষণ, ডাকাতি ও বিবাহ সংক্রান্ত অপরাধ, বিশ্বাস ভঙ্গজনিত ফৌজদারি অপরাধ ইত্যাদি।

পেশাদার অপরাধীরা যেমন হরহামেশা আইন ভঙ্গ করে, এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষও আছে যারা নানা কারণে কখনোসখনো আইন ভঙ্গ করে।

সমাজে প্রতিদিন অনেক ঘটনা ঘটে, যার সবই মানুষের কাছে সমান গুরুত্ব পায় না। কিছু ঘটনা গুণগত বৈশিষ্ট্যের জন্য সংবাদ হিসেবে প্রকাশযোগ্য হয়ে ওঠে। যাকে আমরা সংবাদ উপাদান হিসেবে আখ্যায়িত করি। অপরাধ সংবাদেরও উপাদান অনেক ধরনের হতে পারে। যেমন:

* নতুন: ক্রাইম রিপোর্টিংয়ে যথাসম্ভব হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করতে হয়।
* অস্বাভাবিক: খুন কিংবা সশস্ত্র ডাকাতি বেশির ভাগ দেশে প্রতিদিনই ঘটে না। সংবাদমূল্য আছে– এমন স্বাভাবিকের ব্যতিক্রম কিছু ঘটলে তা সংবাদে পরিণত হয়।
* আকর্ষণীয় বা উল্লেখযোগ্য: বড়ো ধরনের কিংবা অভিনব উপায়ে সংঘটিত অপরাধের বিষয়ে দেশের আইন মেনে চলা মানুষের বেশ আগ্রহ থাকে।
* মানুষ সংক্রান্ত: অপরাধমূলক ঘটনা মানুষকে সংশ্লিষ্ট করে অপরাধী আর অপরাধের শিকার হিসেবে। অপরাধের ভিকটিম ছাড়া সাধারণত অপরাধ ঘটে না। তাই অপরাধ-কাহিনিগুলোয় শুধু ক্রিমিনাল আর পুলিশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অপরাধের শিকার মানুষের বিষয়ে মানবিকভাবে বর্ণনা করতে হয়।
* সিরিয়াসনেস: অপরাধের ঘটনাটি যত গুরুতর হবে, সংবাদ হিসেবে তা ততই গুরুত্ব পাবে।
* অপরাধের শিকার কিংবা অপরাধীর পরিচয়: বিখ্যাত ব্যক্তিরা কোনো অপরাধের শিকার হলে কিংবা অপরাধমূলক কাজ করে ফেললে তা বেশি গুরুত্ব পায়।

অপরাধের ঘটনাগুলোর একটা বড়ো সমস্যা হলো, সাধারণত ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পরই সংবাদিকরা তার খবর পান। অন্য ইভেন্টগুলো যেমন– একটি সেমিনার চলছে, কিংবা সংবাদ সম্মেলন বা জনসভা– সাংবাদিক আগে থেকেই বিষয়টি সম্পর্কে জানেন বলে এ ব্যাপারে তিনি প্রস্তুতিও নিতে পারেন। কীভাবে তা কাভার করবেন, এ পরিকল্পনা আগেভাগে সেরে নেন তিনি। কিন্তু ধরুন একটি সশস্ত্র ডাকাতির খবর পেলেন রিপোর্টার। ঘটনাস্থলে রিপোর্টার যাওয়ার আগেই তো ডাকাতরা সটকে পড়ে। তিনি হয়তো তখন ওই ঘটনায় আহতদের পাবেন হাসপাতালে, কিংবা নিহতের লাশ হাসপাতালের মর্গে। পুলিশ হয়তো এরই মধ্যে নেমে পড়েছে ঘটনার তদন্তে।

এহেন পরিস্থিতিতে সাংবাদিকতার মৌলিক বিষয়গুলোরই শরণাপন্ন হতে হয় রিপোর্টারকে। খুঁজে নিতে হয়– কোথায়, কার সঙ্গে কী ঘটেছে, কীভাবে, কার মাধ্যমে এবং কেন (ষড়- 'ক' বা 5W1H)।

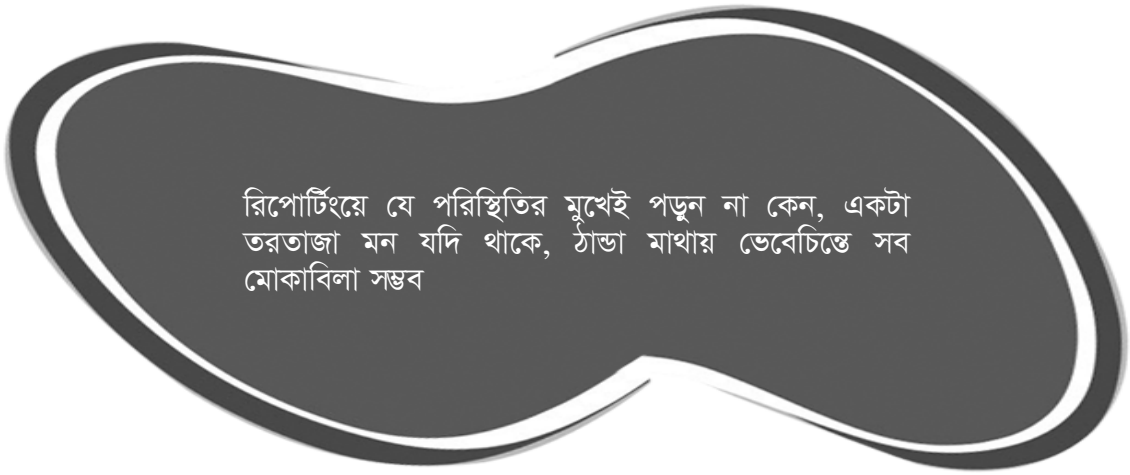

রিপোর্টারের যোগ্যতা: রিপোর্টিংয়ে যে পরিস্থিতির মুখেই পড়ুন না কেন, একটা তরতাজা মন যদি থাকে, ঠান্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে সব মোকাবিলা সম্ভব। অপরাধে শিকার যারা হয়েছেন, তাদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করে ঘটনাটির বিস্তারিত আপনি সংগ্রহ করতে পারবেন তাদের কাছ থেকে। তবে তথ্য যা-ই পান না কেন, সব সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। সাংবাদিকের সব সময় একটা সন্দেহপ্রবণ মন থাকতে হয়। পুলিশ কিংবা ভিকটিম আর প্রত্যক্ষদর্শীরা আপনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্ত করতে না-ও চাইতে পারে। কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতা আর ভয়াবহতায় ভিকটিম আর প্রত্যক্ষদর্শীরা অনেক বেশি আঘাত পেলে তাদের দেওয়া তথ্য এলোমেলো হতেই পারে। অনিচ্ছাকৃত অনেক ভুল তথ্য চলে আসতে পারে। আর পুলিশ হয়তো সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে অপরাধীকে ধরার দিকেই বেশি মনোযোগ দিতে পারে, সেটাই স্বাভাবিক। অপরাধীর সঙ্গে কথা বললে সে ইচ্ছে করেই মিথ্যা বলতে পারে। রিপোর্টারকে এসব বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

তথ্যের নানা সূত্র: ভুল তথ্য পরিবেশনের ঝুঁকি নিতে না চাইলে যত বেশি সম্ভব সোর্সের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তথ্য জোগাড় করতে

হবে। হোক না তাতে নোটবুকটায় যদি একটু বেশি তথ্য সংগ্রহ হয়ে থাকে। সাধারণ কোনো ছিঁচকে চুরির ঘটনায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দেওয়া পুলিশের রিপোর্টের একটা কপি পেলে কিংবা পুলিশের একটা প্রেস রিলিজ পেলেই তা যথেষ্ট মনে হতে পারে। কিন্তু আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কিংবা জটিল কোনো পরিস্থিতিতে শুধু পুলিশের ভরসায় না থেকে নানা ধরনের সোর্সের শরণাপন্ন হতে হয় বেশি বেশি তথ্য জোগাড়ের জন্য। তারপর সব তথ্য মিলিয়ে নিয়ে ক্রস চেক করে মূল তথ্য পরিবেশন করাটাই শ্রেয়।

রিপোর্টিং কৌশল

ক্রাইম রিপোর্টার হিসেবে সফল হতে হলে বেশকিছু কৌশল অবলম্বন প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভালো ও নির্ভরযোগ্য সোর্স তৈরি। ক্রাইম রিপোর্টিংয়ের জন্য কৌশলের শেষ নেই। এখানে মোটাদাগে অল্প কয়েকটির ওপর সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

সোর্স তৈরি ও ধরে রাখা: ক্রাইমের অনেক ঘটনাই পুলিশ প্রকাশ না করলে সাংবাদিকরা জানতেই পারেন না। রহস্য উন্মোচনের আগ পর্যন্ত পুলিশ অনেক সময় অনেক ঘটনা চেপে যায়, কারণ সংবাদমাধ্যমে এ বিষয় প্রকাশ হলে সন্দেহভাজন ব্যক্তি অনেক বেশি সতর্ক হয়ে যেতে পারে, কিংবা দেশ থেকে উধাও হয়ে যেতে পারে।

ঘটনা ঘটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার খবর পাওয়াটাই রিপোর্টারে ক্রেডিট। তিনি তাঁর সোর্সের সঙ্গে এমন সম্পর্ক তৈরি করতে সক্ষম হবেন, যাতে তিনি দ্রুত তথ্য পেয়ে যান। এ কারণে ক্রাইম রিপোর্টাররা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ে এমন সব সোর্স তৈরি করেন, যার সুফল তাঁরা পরে পান। সোর্স নার্সিং বেশ গুরুত্বপূর্ণ আর কঠিন কাজ। সোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, তার ভালোমন্দের খবর রাখা, কোনোভাবে উপকার করার সুযোগ থাকলে তা করা, নিদেনপক্ষে নানা উপলক্ষ্যে তার সঙ্গে কুশল বিনিময় করতেই হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রিপোর্টারের সঙ্গে শেয়ার করেন সোর্স। কিন্তু রিপোর্টার কোনো কারণে তাঁর সোর্সের নাম প্রকাশ করে ফেললে এরপর আর তিনি সেই সহযোগিতা পান না।

পুলিশ কন্টাক্ট: রিপোর্টারের কর্মস্থলের থানা পুলিশ এমনকি তিনি যে নগর বা শহরে কর্মরত, সেই পুরো এলাকাটির বিভিন্ন থানার পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে ক্রাইম রিপোর্টারের পরিচয় থাকা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে ধরে নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের নম্বরগুলো নোটবুক কিংবা মোবাইল ফোনের কন্টাক্ট লিস্টে লিখে রাখা জরুরি। মাঝেমধ্যে তাদের সঙ্গে খোশগল্প করাও বেশ কাজে লাগে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংবাদ সম্মেলন কিংবা ব্রিফিং: বিভিন্ন ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন কিংবা ব্রিফিংয়ের তথ্য সংবাদমাধ্যমগুলোয় আগাম জানিয়ে দেওয়া হয়। সংবাদমাধ্যমগুলোর পক্ষ থেকে তখন নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়ে তা কাভারের জন্য ক্রাইম রিপোর্টারদের অ্যাসাইন করা হয়। সেখান থেকেও অনেক তথ্য মেলে।

পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং: সব ধরনের সাংবাদিকেরই পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা থাকতে হয়। ক্রাইম রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে তো আরও সতর্ক হতেই হয়। এই মুহূর্তে কী ঘটছে না ঘটছে, সে সম্পর্কে খবর রাখার পাশাপাশি তিনি কী জানতে পেরেছেন, কী জানতে পারেননি, এ ব্যাপারেও সতর্ক থাকা দরকার। যেমন ধরুন, আপনি কোনো একটা থানায় প্রায় সব পুলিশ কর্মকর্তাকেই কল করে মোবাইল ফোনে শুনতে পেলেন, 'এই মুহূর্তে সংযোগ দেওয়া সম্ভব নয়' কিংবা রিং হচ্ছে; কিন্তু কেউই রিসিভ করছে না। তখন ধরেই নিতে পারেন ওই থানা এলাকায় বড়ো কোনো কিছু ঘটছে, যাতে তারা সবাই ব্যস্ত। এলাকার বিকল্প কারও সঙ্গে যোগাযোগ করে জানার চেষ্টা করতে পারেন, নয়তো ছুটে যেতে পারেন সংশ্লিষ্ট থানায়, স্বচক্ষেই দেখতে পারেন কী ঘটছে?

ক্রাইম রিপোর্টার হিসেবে সফল হতে হলে বেশকিছু কৌশল অবলম্বন প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভালো ও নির্ভরযোগ্য সোর্স তৈরি। ক্রাইম রিপোর্টিংয়ের জন্য কৌশলের শেষ নেই

ডকুমেন্ট ও রিপোর্ট: অপরাধ সংক্রান্ত যে কোনো ডকুমেন্টের ব্যাপারে আপনার আগ্রহ থাকাটাই ক্রাইম রিপোর্টার হিসেবে স্বাভাবিক। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে যেসব রিপোর্ট পাঠানো হয়, তাতে অনেক অপরাধের ঘটনার অগ্রগতির খবর থাকতে পারে। পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অনুসন্ধান চালিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর সংবাদমাধ্যমে পরিবেশন সম্ভব।

ক্রাইম রিপোর্টিংয়ের জন্য রিপোর্টার নিজেকে যত বেশি প্রস্তুত করবেন, আলসেমি না করে চটজলদি কাজে নেমে পড়তে পারেন, নিজের আইকিউ খাটিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারবেন, নিঃসন্দেহে তিনি তত বেশি সফল হবেন।

তথ্যসূত্র

ইন্টারনেট

লেখক: সিনিয়র নিউজ এডিটর, বাংলাভিশন

অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতার সংকট প্রশমন

মৃধা মো. শিবলী নোমান

আমাদের ভেতর সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম অধ্যয়নের সঙ্গে যাদের একধরনের পরিচয় আছে, তাদের কাছে একটি কথা অত্যন্ত প্রচলিত; আর তা হলো– Good news is no news. অর্থাৎ ভালো সংবাদ আসলে সংবাদ নয়। আমার ঠিক জানা নেই এই আপ্তবাক্যটি আসলে কে, কবে কিংবা কোথায় বলেছিলেন। কিংবা নির্দিষ্ট কেউ আদৌ বলেছিলেন নাকি বহুল ব্যবহারের ফলে এটি প্রচলিত হয়েছে। তবে এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, আমাদের মতো

যেসব সংবাদ আধেয় পাই, এর বেশির ভাগই নেতিবাচক ঘটনার সংবাদ। বিপরীত দিক থেকে আরও একটি ভাষ্য হলো, গণমাধ্যমের পাঠক-শ্রোতা-দর্শক তথা অডিয়েন্সের চাহিদার ফলেই নেতিবাচক বিষয়গুলো নিয়মিতভাবে গণমাধ্যমের আধেয় হিসেবে সামনে আসে, প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। এই বিতর্ককে তার অবস্থানে রেখেই বলতে হচ্ছে– রাষ্ট্র ও সমাজের নাগরিক এবং সদস্যদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট যে কোনো তথ্য প্রকাশ

বিপরীত দিক থেকে আরও একটি ভাষ্য হলো, গণমাধ্যমের পাঠক-শ্রোতা-দর্শক তথা অডিয়েন্সের চাহিদার ফলেই নেতিবাচক বিষয়গুলো নিয়মিতভাবে গণমাধ্যমের আধেয় হিসেবে সামনে আসে, প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়

গণমাধ্যম পেশাজীবী বা একাডেমিশিয়ানদের ভেতর এই বাক্যটির বিরুদ্ধে একধরনের আদর্শিক অবস্থান থাকলেও বাস্তবে আমাদের গণমাধ্যমের চর্চা ভিন্নকথা বলে। নিত্যদিনের প্রাইম টাইম বুলেটিনে বা সংবাদপত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রথম ও শেষ পাতায় আমরা

করা যেহেতু গণমাধ্যম, বিশেষত সংবাদমাধ্যমগুলোর দায়িত্ব, কর্তব্য ও উদ্দেশ্য– তাই আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অপরাধবিষয়ক তথ্যও জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা, সমাজের প্রতিটি সদস্যকে এ সম্পর্কে অবহিত করা

সংবাদমাধ্যমের দায়িত্বের ভেতর পড়ে যায় স্বাভাবিকভাবেই। আর বিতর্ক থাকলেও এই দায়িত্ববোধ থেকেই সাংবাদিকতায় অপরাধ বিটের উদ্ভব বলা যেতে পারে। তবে বিভিন্ন সময় অপরাধ বিষয়ে সাংবাদিকতা করতে গিয়ে কিছু সংকট সামনে চলে আসে। এই সংকটগুলোর পূর্ণ নিরসন নয়, বরং আংশিক প্রশমন বিষয়েই এই লেখা। কারণ, সাংবাদিকতা এমন একটি বিষয়, যা শুধু পড়ে বা লিখে জানা সম্ভব নয়। বরং প্রতিনিয়ত চর্চার মাধ্যমেই এসব সংকটের পূর্ণ নিরসন সম্ভব।

অপরাধ আসলে কী?

অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতা নিয়ে আলোচনা করার আগে বা একদম শুরুতেই প্রয়োজন অপরাধ সম্পর্কে ধারণা অর্জন। একাডেমিক পর্যায়ে 'Crime and deviance' বা অপরাধ ও বিচ্যুতি বিষয়ে সমাজবিদ্যায় ব্যাপক আলোচনা করা হয়। সাধারণ অর্থে বিচ্যুতি হলো সমাজের সদস্যদের এমন কিছু আচরণ, যা সমাজে প্রচলিত বা অনুমোদিত নয়; কিন্তু সেসব আচরণ করার জন্য তাকে প্রত্যক্ষ সাজা পেতে হয় না বা এসব আচরণের ফলাফল তেমন ভোগ করতে হয় না।

অন্যদিকে অপরাধকে সংজ্ঞায়ন করতে গিয়ে Boundless Sociology তাদের ওয়েবসাইটে বলছে, 'In sociology, a normative definition views crime as deviant behavior that violates prevailing norms or cultural standards prescribing how humans ought to behave normally.' অর্থাৎ, সমাজবিদ্যায় অপরাধ হলো এমন কোনো বিচ্যুতিমূলক ব্যবহার, যা সমাজে বিদ্যমান নিয়মকানুন বা সাংস্কৃতিক মানগুলোকে বিঘ্নিত করে। একই সঙ্গে এও বলা হচ্ছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর এহেন আচরণ তার স্বাভাবিকত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে।

আবার Open Education Sociology Dictionary অনুযায়ী, অপরাধ হলো এমন কোনো কাজ, যা বিদ্যমান আইনকে ভঙ্গ করে এবং এর কারণে আইন দ্বারা সাজা পাওয়ার জন্য বিধিবদ্ধ। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের উদাহরণ হিসেবে সাইবার অপরাধ, জালিয়াতি, হত্যা, ধর্ষণ, সংঘবদ্ধ অপরাধ, সহিংসতা, যুদ্ধাপরাধ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া অপরাধের প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকতা বিচারে একে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ, সংঘবদ্ধ অপরাধ, যৌনতাবিষয়ক অপরাধ, সহিংস অপরাধ, ঘৃণাজনিত অপরাধ, সম্পদবিষয়ক অপরাধেও ভাগ করতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রকারভেদে একই বিষয়গুলোর চলে আসা আপাতদৃষ্টিতে অপরাধের সর্বজনীন সংজ্ঞাকেই নির্দেশ করে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতা কেন?

মানবসভ্যতার শুরুর দিক থেকেই বিভিন্ন মিথোলজি ও ইতিহাসে আমরা অপরাধ সংঘটনের উদাহরণ পাই। একই সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের বিকাশের শুরুর দিক থেকেই অপরাধবিষয়ক সংবাদ হয়ে উঠেছিল এসব মাধ্যমের অন্যতম আধেয়। মূলত সেনসেশন তৈরির জন্য ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সংবাদপত্র জেমস অগাস্টাস হিকির ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজারেও আমরা দেখেছি, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নানা ছোটো অনিয়মের ঘটনাগুলো নিত্যসংবাদ হিসেবে প্রকাশিত হতো। তারপরও প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, কেন সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকরা অপরাধ বিষয়ে সাংবাদিকতা করবে? এর উত্তর পাওয়া যায় ইউনেস্কোর সহায়তায় প্রকাশিত পিটার হ্যানশেল ও ডেভিড ইনগ্রাম রচিত 'The News Manual' গ্রন্থে। এতে অপরাধ বিষয়ে রিপোর্টিং তথা সাংবাদিকতা করার প্রয়োজনীয়তা এবং কারণ হিসেবে লেখকদ্বয়ের উল্লিখিত বিষয়গুলোর অন্যতম হলো:

মানবসভ্যতার শুরুর দিক থেকেই বিভিন্ন মিথোলজি ও ইতিহাসে আমরা অপরাধ সংঘটনের উদাহরণ পাই। একই সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের বিকাশের শুরুর দিক থেকেই অপরাধবিষয়ক সংবাদ হয়ে উঠেছিল এসব মাধ্যমের অন্যতম আধেয়

* অডিয়েন্সরা অপরাধ কেন ও কীভাবে সংঘটিত হয়, তা জানতে চান। তারা বুঝতে চান এসব ঘটনা তাদের সঙ্গেও ঘটতে পারে কি না।
* অডিয়েন্সের জানা প্রয়োজন কী করলে আইন ভঙ্গ করা হয় এবং এর ফলে কী সাজা ভোগ করতে হতে পারে।
* অধিকাংশ মানুষ আইন মেনে চলায় অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে সাধারণ ঘটনা বলা যায় না, এ ধরনের অপ্রচলিত বিষয় সংবাদের অন্যতম উপাদান।

একই সঙ্গে অপরাধ সংঘটনের নিত্যনতুন কৌশল, এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা, এর অপ্রচলিত ধারা বর্ণনার কারণে সংবাদমাধ্যমগুলো অপরাধবিষয়ক সংবাদ প্রকাশে এবং এ বিষয়ে সাংবাদিকতা করতে আগ্রহী হয় বা তাঁকে আগ্রহী হতে হয়।

অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতার সংকট প্রশমন

আমাদের দেশে অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতার বয়স একেবারে কম না হলেও সাংবাদিকতার এই ক্ষেত্রটি যে খুব বিকশিত হয়েছে, তা নির্দ্বিধায় বলা যাবে না। বরং অনেক ক্ষেত্রেই এই বিটের গুরুত্ব ও প্রভাব বুঝতে না পারায় দিনশেষে আমাদের অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতা তথা

আপামর সাংবাদিকতার মান নিয়ে উঠছে বিভিন্ন প্রশ্ন। সংবাদমাধ্যমগুলোকে পড়তে হচ্ছে নানা ধরনের সংকটে। পিটার হ্যানশেল ও ডেভিড ইনগ্রামের উল্লেখিত গ্রন্থে অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতা নিয়ে করা বিশদ আলোচনা থেকে এ ধরনের সাংবাদিকতার সম্ভাব্য কিছু সংকট বিষয়ে অনুমান করা যায়। এর ভেতর সংবাদের তথ্যসূত্র, তথ্যের নিশ্চয়তা, তথ্যসূত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, ফলোআপ, নথি সংরক্ষণের মতো বিষয় আলোচিত হয়। এ ধরনের কিছু সংকট প্রশমনের উপায় হলো:

* যে কোনো অপরাধ বিষয়ে সংবাদ প্রকাশের আগে বিশ্বাসযোগ্য সূত্রের কাছ থেকে তথ্য নিশ্চিত ও ক্রস চেক করতে হবে। সবার আগে সংবাদ প্রকাশের ফাঁদে না পড়ে নির্ভুল সংবাদ প্রকাশে মনোযোগী হতে হবে।
* তথ্যসূত্রের জীবনের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করতে হবে। সাংবাদিকের স্বার্থে বা সংবাদকে অধিক বিশ্বাসযোগ্য করতে সূত্রের সম্মতি ছাড়া তার পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না। অধিক সতর্ক থাকতে হবে নারী, শিশু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে।
* তথ্যসূত্রগুলোর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ না রাখলে সব তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে না। করা যাবে না ফলোআপ সংবাদ। তাই প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ না করে তার বা তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। প্রকাশিত সংবাদের কারণে তথ্যসূত্র কোনো সমস্যায় আছেন কি না, তার খোঁজখবর রাখতে হবে।
* আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। শুধু তথ্যসূত্র বা অন্য কোনো অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদ না করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে কথা বলতে হবে। মনে রাখতে হবে, অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তারা হলো সবচেয়ে কাছের দায়িত্বশীল সূত্র।
* কোনো একটি অপরাধ বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করে সে বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া বন্ধ করে দিলে চলবে না; বরং নিয়মিত খোঁজ রাখতে হবে। নিয়মিত ফলোআপ না করলে অপরাধ নির্মূলের সম্ভাবনা কমে যেতে পারে।
* যে কোনো অপরাধ বিষয়ে প্রাপ্ত সব নথি সযত্নে সংরক্ষণ করতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় মনে হলেও যে কোনো সূত্রের কাছে পাওয়া যে কোনো নথি গ্রহণ করতে হবে এবং তা কোনোভাবে ব্যবহার করা যায় কি না ভাবতে হবে। কোনোভাবেই এসব নথি হাতছাড়া করা যাবে না।
* মূল ঘটনা, সন্দেহভাজন ও আক্রান্ত, অপরাধ সংঘটনের স্থান বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। অপরাধ সংঘটনের স্থানে না গিয়ে বা কারও কাছ থেকে শোনা বা অন্যের বর্ণনার আলোকে সংবাদ করা যাবে না।
* সংবাদ লেখার সময় আইনি পরিভাষা, আইনের বিধান সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। লেখার মাধ্যমে আদালতের বিচারাধীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ বা তাকে প্রভাবিত করা থেকে সচেতনভাবে বিরত থাকতেই হবে।
* অপরাধ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত সন্দেহভাজন কারও সঙ্গে অপরাধীর মতো আচরণ করা যাবে না। মিডিয়া ট্রায়াল যেন না হয়, সেদিকে সতর্ক নজর রাখতে হবে– এই উদ্দেশ্যে সচেতন থাকতে হবে সংবাদের ভাষা বিষয়ে।

অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতায় নৈতিকতা

অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতা হলো সাংবাদিকতার এমন একটি বিট, যেখানে নৈতিকতা অনুসরণ করার সুযোগ ও সুফল অপেক্ষাকৃত বেশি। ফ্লোরিডার পয়েন্টার ইনস্টিটিউটের সাংবাদিকতায় নৈতিকতা নিয়ে কাজ করা বব স্টিলার মনে করেন, অপরাধ বিষয়ে কাজ করা সাংবাদিকদের, প্রথমত, সত্যানুসন্ধান ও প্রাপ্ত সব তথ্য প্রকাশ করে রিপোর্ট করা; দ্বিতীয়ত, স্বাধীনভাবে কাজ করা এবং তৃতীয়ত, ক্ষতি হ্রাসকরণের মাধ্যমে অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতাকে মানসম্মত করা যেতে পারে।

এছাড়া আরও কিছু বিষয়ে সচেতন থাকার মাধ্যমে অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতার সংকট প্রশমন করা যায়। সব সময় খেয়াল রাখতে হবে, সাধারণ মানুষের ভেতর অনুকরণ ও অনুসরণের প্রবণতা রয়েছে। একটি অপরাধকর্মের বর্ণনা সংবাদ আকারে প্রকাশের মাধ্যমে আরও অনেকের ভেতর সেই পদ্ধতিতে অপরাধ সংঘটনের প্রবণতা সংক্রমিত হতে পারে। এই পরিস্থিতির উদ্ভব রুখতে সাংবাদিককে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন তার লেখা সংবাদে অপরাধ বা অপরাধীকে কোনোভাবেই মহানভাবে প্রকাশ বা Glorify করা না হয়। একই সঙ্গে অপরাধকর্মটি যে বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে, এ বিষয়ে এবং এর ফলে অপরাধীর কী শাস্তি হতে পারে, তার উল্লেখও জরুরি। এটি একান্তই সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতাবিষয়ক আলোচনা হওয়ায় এ বিষয়ে অর্থাৎ অপরাধবিষয়ক সাংবাদিক ও মিডিয়া হাউসের দায়িত্ব সর্বাধিক।

অন্যদিকে আরেকটি সাধারণ; কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতা করতে গেলে খুব স্বাভাবিকভাবেই সাংবাদিকদের জীবন ও পেশার প্রতি হুমকি আসে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ২০১৬ সালে ইউনেস্কোর প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছে, সংবাদকর্মীদের ওপর পরিচালিত সহিংসতার প্রায় অর্ধেক সশস্ত্র সহিংসতা বিষয়ে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে হলেও এরপরই সংবাদকর্মীরা সবচেয়ে বেশি সহিংসতার শিকার হন রাজনীতি, দুর্নীতি ও অপরাধ বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে। এক অর্থে এই প্রতিটি বিষয় কোনো না কোনোভাবে অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এ বিষয়ে প্রত্যেক সাংবাদিককে প্রতিনিয়ত সতর্ক থাকতে হবে এবং নিজের জীবনের ঝুঁকি প্রশমন করে তথা সবার আগে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে হবে। একই সঙ্গে সংবাদ নিয়ে ব্যবসা বা মুনাফাই আমাদের মিডিয়া হাউসগুলোর একমাত্র লক্ষ্য না হয়ে সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তার বিষয়টিও যেন তারা বিবেচনায় রাখেন, সে বিষয়েও একধরনের মানসিক প্রশিক্ষণ জরুরি।

তথ্যসূত্র

Crime, available at https://courses.lumenlearning.com/boundless-sociology/chapter/crime/

Crime, available at https://sociologydictionary.org/crime/ Crime reporting introduction, available at https://www.thenewsmanual.net/Manuals%20Volume%202/volume2_35.htm

Reporting crime, available at https://www.thenewsmanual.net/Manuals%20Volume%202/volume2_36.htm

Writing about crime, available at https://www.thenewsmanual.net/Manuals%20Volume%202/volume2_37.htm

A Guide for Journalists Who Report on Crime and Crime Victims, available at, http://www.mediacrimevictimguide.com/journalistguide.pdf

Journalists at Risk: Annual Day Promotes Accountability for Attacks on the Media, available at https://www.hrw.org/news/2016/11/02/journalists-risk

লেখক: শিক্ষক, সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম অধ্যয়ন বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতা

মো. ফরহাদ উদ্দীন

জনগণের কাছে সমাজের নানা ত্রুটিবিচ্যুতি তুলে ধরার মাধ্যমে গণমাধ্যম 'ওয়াচডগের' ভূমিকা পালন করে। মানুষের জানার অধিকার বা আগ্রহ থেকে আমাদের সমাজে সংঘটিত নানা অপরাধ ও ত্রুটিবিচ্যুতি গণমাধ্যমে সংবাদ হিসেবে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। মুক্ত গণমাধ্যম যে সমাজে বিদ্যমান, সেখানে অপরাধের নানা ঘটনা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে সংবাদ প্রকাশিত হয়ে আসছে। সমাজ বা রাষ্ট্রে কোনো ব্যক্তির অপরাধ থেকে রাষ্ট্রীয় অপরাধ– সবই সংবাদের উপজীব্য হয়ে উঠতে পারে।

এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে খুন করলে তা যেমন সংবাদ হয় আবার রাষ্ট্রের প্রধান যদি কোনো অপরাধ করেন, সেটিও সংবাদ হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি' নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ থেকে অনুধাবন করা যায়, রাষ্ট্র কিংবা সমাজের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব কতটা শক্তিশালী।

গণমাধ্যম-সমালোচকদের মতে, আমরা গণমাধ্যম থেকে যে সংবাদ পাই, এর বেশির ভাগই 'অপরাধ' সংক্রান্ত। সমাজে নানা ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। আকারে কোনোটি বড়ো আবার কোনোটি ছোটো। চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, হত্যা, গুপ্তহত্যা, মাদক ব্যবসা, ধর্ষণ– এগুলো অপরাধের একেকটি ধরন। এছাড়া 'হোয়াইট কলার' বা কায়িক শ্রমের কাজে নিযুক্ত নয়, এমন অপরাধ যেমন– অর্থ আত্মসাৎ, ঘুস, শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারি ইত্যাদি অপরাধও সমাজে বিদ্যমান। এসব অপরাধ নিয়ে সংবাদ হয় না– এমন দিন নেই বললেই চলে।

গণমাধ্যম-সমালোচকদের মতে, আমরা গণমাধ্যম থেকে যে সংবাদ পাই, এর বেশির ভাগই 'অপরাধ' সংক্রান্ত। সমাজে নানা ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। আকারে কোনোটি বড়ো আবার কোনোটি ছোটো

গুরুত্বানুসারে অপরাধের ঘটনাগুলো পত্রিকার প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতায় সিঙ্গেল কলাম থেকে লিড নিউজ হিসেবে ছাপা হচ্ছে প্রতিদিন। ফলে 'অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতার' ধারণা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

সংবাদ উপাদান হিসেবে 'অপরাধ'

যেসব উপাদান থাকলে একটি ঘটনাকে সংবাদ বলে গণ্য করা হয়, সেগুলোর মধ্যে 'অপরাধ' অন্যতম। বলা হয়ে থাকে, 'Every bad news is good news and big news.' বিষয়টি কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশের মতো শোনালেও একজন সংবাদকর্মীর কাছে দুঃসংবাদ যত বড়ো হবে, সেটি তত 'বড়ো সংবাদ' এবং 'ভালো সংবাদ'। আর এক্ষেত্রে অপরাধবিষয়ক সংবাদের গুরুত্বই আলাদা। তাছাড়া মনস্তাত্ত্বিক কারণেও অপরাধ 'সংবাদের' শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করে। 'সংবাদ রসায়ন' নামে সংবাদিকতা পাঠের যে টার্মটি রয়েছে, সেটিতে বলা হয়েছে, কোনো সংবাদ ঘটনায় যৌনতা (সেক্স), অর্থ (মানি) ও অপরাধ একসঙ্গে বিদ্যমান থাকলে সেখানে সংবাদমূল্য গাণিতিক হারে (তিনটি উপাদানের মূল্য ১+১+১=৩ না হয়ে জ্যামিতিক হারে ১+২+৩=৬) নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ কোনো অপরাধ ঘটনার সঙ্গে যদি যৌনতা ও অর্থের সংশ্লেষ থাকে, তাহলে সেটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হিসেবে পরিগণিত হয়।

সংবাদের অন্যান্য উপাদানের মতো অপরাধের ঘটনাটি নতুন, অস্বাভাবিক, তাৎপর্যপূর্ণ হলে তা আকর্ষণীয় সংবাদে রূপ নেয়। সংবাদ হওয়ার জন্য অপরাধটি আপডেট হতে হয়। কারণ সমাজে একই ধরনের ঘটনা প্রতিদিন সংঘটিত হচ্ছে। ফলে একটি ঘটনা ছাপিয়ে আরেকটি ঘটনা আসে এবং সংবাদপত্রে জায়গা করে নেয়। ধরা যাক, একটি স্থানে শনিবার একজনকে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনাটি যদি ওইদিনই নিউজ করা না হয়, তাহলে পরের দিন সেটি নিউজ না-ও হতে পারে। কারণ পরের দিন অন্যস্থানে আরও খুনের ঘটনা ঘটতে পারে এবং স্বাভাবিকভাবে সংবাদের তাৎক্ষণিকতা বিচারে আগের দিনের ঘটনাকে ছাপিয়ে পরের দিনের ঘটনা পত্রিকায় জায়গা করে নেবে। তাই অপরাধ যেদিন সংঘটিত হয়েছে, ওইদিনই পরিপূর্ণ তথ্যসহ সংবাদ উপস্থাপন করার জন্য সাংবাদিকদের চেষ্টা করতে হবে। তবে কিছু সংবাদ আছে যেগুলো সময়ের মাপকাঠিতে মাপা যায় না। অপরাধের ধরন যদি ভয়াবহ ও বড়ো আকারের হয় এবং সমাজে যদি এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব থাকে, তাহলে সেই অপরাধ সব সময় সংবাদ হওয়ার দাবি রাখে।

সাংবাদিকতায় 'অপরাধ বা ক্রাইম' বিট

কার্যকর সংবাদমূল্য নিহিত থাকার কারণে সাংবাদিকতায় 'অপরাধ' একটি গুরুত্বপূর্ণ 'বিট' বা 'সংবাদবিষয়' হিসেবে স্বীকৃত। অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতায় আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া নানা

স্ট্যানলি ওয়াকারসহ অনেক সংবাদ বিশেষজ্ঞও 3Wকে (Women, Wampum and Wrong-doing) সংবাদ রসায়নের কার্যকর উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অপরাধ সংবাদ রসায়নের মাধ্যমে সংবাদের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়

স্ট্যানলি ওয়াকারসহ অনেক সংবাদ বিশেষজ্ঞও 3Wকে (Women, Wampum and Wrong-doing) সংবাদ রসায়নের কার্যকর উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অপরাধ সংবাদ রসায়নের মাধ্যমে সংবাদের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়। ফলে পাঠক-শ্রোতা সংবাদটি পড়তে বা দেখতে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে।

নানা কারণে মানুষ অপরাধ প্রতিবেদন পড়তে বা শুনতে চায়। কী কারণে অপরাধ সংঘটিত হয়, এ সম্পর্কে পাঠক জানতে চায়। সমাজে সংঘটিত অপরাধটি তার ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে কি না, এ সম্পর্কে গণমাধ্যম থেকে ব্যাখ্যা চায় তারা। প্রতিবেদন থেকে তথ্য পেয়ে তারা অপরাধটি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার চেষ্টা করে। কীভাবে এ ধরনের অপরাধ প্রতিরোধ করা যায়, এ সম্পর্কে গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে ধারণা লাভ করার চেষ্টা করে। সমাজের বেশির ভাগ মানুষ আইন মেনে চলে। কেউ যদি আইন ভেঙে কোনো অপরাধ করে, সেটি কেন করেছে এবং এর কী শাস্তি হচ্ছে, আদৌ শাস্তি হচ্ছে কি না, তা জানার আগ্রহ থেকে অপরাধ প্রতিবেদন করা হয়। দেশে আইনের শাসন বজায় আছে কি না, তা মানুষ গণমাধ্যম থেকে বুঝতে চেষ্টা করে।

অপরাধের ঘটনাগুলো তুলে ধরা হয়। অপরাধের কারণ, প্রকৃতি, মাত্রা ও সমাজে এর প্রভাব সম্পর্কে উপস্থাপন করা হয়। এর মাধ্যমে নানা অপরাধচক্র সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার প্রচেষ্টা করা হয়।

প্রত্যেক পত্রিকা বা টেলিভিশন চ্যানেলে 'ক্রাইম বিটের' সাংবাদিকরা অপরাধের ঘটনাগুলোর সংবাদ সংগ্রহ করেন। সমাজের বড়ো অপরাধের ঘটনাগুলো পাঠকের সামনে তুলে ধরতে প্রথম সারির পত্রিকাগুলোয় বিশেষায়িত টিমও কাজ করে থাকে। আবার অনেক টিভি চ্যানেলে অপরাধ সংক্রান্ত ঘটনার অনুসন্ধানী প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয় আলাদা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ইনডিপেনডেন্ট টিভির 'তালাশ', যমুনা টিভির 'ইনভেস্টিগেশন ৩৬০ ডিগ্রি', চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের 'সার্চলাইট' প্রোগ্রামে আমাদের সমাজে সংঘটিত নানা অপরাধের ঘটনার পেছনের ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। যে কারণে এসব প্রোগ্রামের জনপ্রিয়তাও তুলনামূলকভাবে বেশি।

এই বিটে কর্মরত সাংবাদিকদের তুলনামূলকভাবে বেশি পরিশ্রম করতে হয়। কারণ একটি দুর্ঘটনা বা অপরাধ রাত বা দিনের যে কোনো সময়ে সংঘটিত হতে পারে। ছিনতাই, খুন, ধর্ষণের মতো অপরাধের

ঘটনা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাতে সংঘটিত হয়। তাই এই বিটের সাংবাদিকদের ২৪ ঘণ্টার যে কোনো সময়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে প্রস্তুত থাকতে হয়। আবার অপরাধ সংক্রান্ত ঘটনাগুলো অন্য বিটের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট হতে পারে। এ ক্ষেত্রেও অপরাধ বিটে কর্মরত সাংবাদিককে ঘটনার তীব্রতা বুঝে ওই সংবাদ সংগ্রহ করতে হয়। অনেক সময় বিভিন্ন জেলায় গিয়েও তাদের সংবাদ সংগ্রহ করতে হয়। কারণ কোনো জেলায় সংঘটিত ঘটনাটি যদি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়, তাহলে সেই ঘটনার কাভারেজ ভালো হওয়ার জন্য সংবাদপত্র বা টিভি চ্যানেল থেকে টিম পাঠিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করা হয়। সম্প্রতি সংঘটিত বরগুনায় এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর সেই ঘটনার আদ্যোপান্ত তুলে ধরতে প্রথম সারির গণমাধ্যমগুলো অপরাধ বিটে কর্মরত সাংবাদিকদের সেখানে পাঠায়। তারা সেই ঘটনার নানা ধরনের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

ক্রাইম রিপোর্ট বা অপরাধ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে করণীয়

অপরাধ সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে তুলনামূলকভাবে একজন সাংবাদিককে বেশি সতর্ক থাকতে হয়। কারণ প্রতিবেদনে অসাবধানতাবশত ভুল কোনো তথ্য ছাপা হলে তা অন্যের জন্য বড়ো ধরনের ক্ষতির কারণ হতে পারে। যদি কোনো সংবাদে অপরাধের সঙ্গে জড়িত নয়, এমন কোনো ব্যক্তির নাম প্রকাশিত হয়, তাহলে ওই ব্যক্তি সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পাশাপাশি সংবাদটি যদি কোনো হত্যাকাণ্ড বা বড়ো ধরনের অপরাধ হয়, তাহলে ওই ব্যক্তি পুলিশের হয়রানির শিকার হতে পারে। এমনকি প্রতিবেদনে নাম, বয়স, পদবি, পরিচয় লেখার সময় ভুল করা হলে তা অন্যের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। কারণ অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদ বিভিন্ন তদন্ত কাজে ডকুমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই এ ধরনের সংবাদ লেখার সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

অপরাধ সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে তুলনামূলকভাবে একজন সাংবাদিককে বেশি সতর্ক থাকতে হয়। কারণ প্রতিবেদনে অসাবধানতাবশত ভুল কোনো তথ্য ছাপা হলে তা অন্যের জন্য বড়ো ধরনের ক্ষতির কারণ হতে পারে

প্রত্যেকটি সংবাদেরই সোর্স বা সূত্র থাকে। আবার নির্দিষ্ট উৎস বা স্থান থেকেও সংবাদ সংগ্রহ করা যায়। অপরাধবিষয়ক সংবাদেরও নির্দিষ্ট কিছু সংবাদসূত্র বা উৎস থাকে। যেমন কোনো খুনের ঘটনা ঘটলে হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তির পরিবার বা প্রত্যক্ষদর্শী সংবাদের সোর্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। আবার পুলিশ স্টেশন বা হাসপাতাল হতে পারে সেই সংবাদের উৎস। এ ধরনের সংবাদ লেখার সময় একজন সাংবাদিককে তথ্য সংগ্রহে একাধিক সোর্স থেকে তা নিশ্চিত করা উচিত। বিশেষ করে ঘটনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী, ভুক্তভোগী, পুলিশ, হাসপাতালসহ অন্যান্য সোর্স থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মিল আছে কি না, তা ক্রস চেক করে নিতে হবে। তথ্যের কোথাও অস্পষ্টতা বা সংশয় থাকলে প্রতিবেদককে অবশ্যই তা দূর করতে হবে। যদি কোনো তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করা না যায় তবে সেই তথ্য পরিহার করেই প্রতিবেদন সম্পন্ন করতে হবে। প্রতিবেদনে অসত্য বা অর্ধসত্য কোনো তথ্য দেওয়ার সুযোগ নেই। প্রতিবেদনের তথ্য হবে শতভাগ সত্য।

কোনো সোর্স যদি তার পরিচয় গোপন রাখতে চায়, তাহলে প্রতিবেদনে তার পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না। সংবাদের সোর্সকে বিপদে ফেলার অধিকার সাংবাদিকের নেই। সোর্সকে রক্ষা করতে সাংবাদিক জেলে গেছেন– এমন ঘটনাও রয়েছে। তবে আদালতে বিচারের ক্ষেত্রে জনস্বার্থে সংবাদের সোর্সের পরিচয় প্রকাশ করা যেতে পারে, যদিও তা বাধ্যতামূলক নয়। প্রতিবেদনে অজ্ঞাতনামা বা নামপরিচয়হীন কোনো সোর্স ব্যবহার করা যাবে না। প্রতিবেদকের সময় স্বল্পতা বা অন্য কোনো কারণে কোনোভাবেই বেনামি সোর্স সংবাদে ব্যবহার করা যাবে না। অফ দ্য রেকর্ড, জানা গেছে, খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিশ্বস্ত সূত্র, সংশ্লিষ্ট সূত্র, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, বিশেষজ্ঞদের ধারণা, অভিজ্ঞ মহল, ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, অনেকের মতে, অনেকে মনে করেন, সচেতন লোকজন মনে করেন, এলাকাবাসীর মতে, ইত্যাদি অজ্ঞাত সোর্স সংবাদে ব্যবহার করলে সংবাদের গ্রহণযোগ্যতা হারায়।

'অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতায়' সাংবাদিকদের সারফেস রিপোর্টিং বা উপরিতল প্রতিবেদনের চেয়ে ডেপথ রিপোর্টিং বা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের ফলে একটি অপরাধের ঘটনা ঘটলে সেটি গণমাধ্যমের আগেই ফেসবুক, টুইটারসহ বিভিন্ন সামাজিকমাধ্যমের সুবাদে জনগণের কাছে দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে। তাই শুধু কী ঘটেছে, তা যদি সংবাদে উপস্থাপন করা হয়, তাহলে পাঠকের কাছে সেই সংবাদ মূল্যহীন বরং কেন ঘটেছে, সমাজে এই ঘটনার প্রভাব কী– এসব বিষয়ে পাঠক জানতে চায়। তাছাড়া নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার সাদামাটা বর্ণনা পরিহার করে ভিন্নরূপে তথ্যবহুলভাবে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা উচিত। একটি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, তা জানানোর চেয়ে হত্যাকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান করে তা পাঠকের সামনে তুলে ধরে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই সমাজের প্রতি সাংবাদিকদের প্রকৃত দায়বদ্ধতা।

সাংবাদিকতার নীতিমালা যেন উপেক্ষিত না হয়

সমাজের ওপর সংবাদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। তাই সংবাদ পরিবেশনে সাংবাদিকদের নৈতিক ও সামাজিক অঙ্গীকার থাকা বাঞ্ছনীয়। বস্তুনিষ্ঠ

তথ্য ও পূর্ণ সত্য প্রকাশ করা প্রত্যেক সাংবাদিকের পেশাগত দায়িত্ব। সারা বিশ্বে সাংবাদিকতা পেশায় বস্তুনিষ্ঠতা, নিরপেক্ষতা, যথার্থতা, শালীনতাবোধসহ কিছু নীতিমালা মেনে চলা হয়। অপরাধ প্রতিবেদন তৈরির সময় এসব বিষয় উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। সংবাদপত্রের সার্কুলেশন বা টিভি চ্যানেলের টিআরপি (টেলিভিশন রিডিং পয়েন্ট) বাড়াতে অনেক সময় অপরাধ সংক্রান্ত ঘটনাগুলোকে অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ঘটনাকে চাঞ্চল্যকরভাবে উপস্থাপন করে পাঠক ও দর্শকশ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করার এই প্রবণতাকে আমরা 'হলুদ সাংবাদিকতা' বলে অভিহিত করি। সাম্প্রতিক সময়ে হাজার হাজার ভুঁইফোঁড় অনলাইনে এ ধরনের হলুদ সাংবাদিকতার চর্চা বেশি পরিলক্ষিত হয়।

আমরা বিভিন্ন সময় লক্ষ করি, খুনের ঘটনা আদালতে প্রমাণ হওয়ার আগেই প্রতিবেদনে একজনকে খুনি বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 'অমুক খুন, খুনি গ্রেফতার'– এমন সংবাদ শিরোনাম হরহামেশাই হচ্ছে। আত্মহত্যা না পরিকল্পিত হত্যা, তা প্রমাণ হওয়ার আগেই প্রতিবেদনে লেখা হয় 'অমুকের আত্মহত্যা'। ইচ্ছাকৃত বা অসাবধানতাবশত অপরাধবিষয়ক সংবাদে এ ধরনের ভুল করার সুযোগ নেই। কারণ এটি একধরনের 'মিডিয়া ট্রায়াল'। মিডিয়া বা গণমাধ্যম ঘটনার বিবরণ পাঠকের কাছে তুলে ধরবে আর ট্রায়াল বা বিচার করবেন আদালত। আদালতে অপরাধ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত কাউকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না। আবার কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কোনো সাংবাদিকের নেই। প্রতিবেদন তৈরির সময় সাংবাদিককে ব্যক্তির ব্যক্তিগত অধিকারের সেই সীমারেখা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। শুধু অভিযোগের ভিত্তিতে কাউকে সংবাদে অপরাধী হিসেবে উপস্থাপন করা সাংবাদিকতার নীতিবহির্ভূত।

এই ধরনের সংবাদে অনেক সময় অপরাধী বা দোষী ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনকেও হেয়প্রতিপন্ন করা হয়, যা সম্পূর্ণ নীতিবহির্ভূত। একটি প্রথম সারির দৈনিকে এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে পড়েছিলাম অপরাধীর নামের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে 'অমুক তার দুলাভাই'। কিন্তু প্রতিবেদনে বা অপরাধের সঙ্গে অপরাধীর দুলাভাইয়ের কোনো সম্পর্ক ছিল না। অসতর্কতাবশত বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে– যেভাবেই হোক না কেন, ওই নামটি ব্যবহার করার মাধ্যমে প্রতিবেদনে ওই ব্যক্তির 'মানহানি' করা হয়েছে। এ ধরনের প্রতিবেদনে অবশ্যই মানহানিকর মন্তব্য থেকে সাংবাদিকদের বিরত থাকতে হবে। কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে অযথা নিন্দামূলক কিছু প্রতিবেদনে লেখা যাবে না। অভিযুক্ত বা অপরাধীর আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবের সম্মানে আঘাত করে বা তাদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে– এমন জনস্বার্থহীন অহেতুক কোনো তথ্য সংবাদে পরিবেশন করা উচিত নয়। দণ্ডবিধি ৪৯৯-৫০২ ধারায় মানহানি সম্পর্কিত আইনের বিধান রয়েছে। ৫০০ ধারা অনুযায়ী কারও বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ প্রমাণিত হলে দুই বছরের বিনাশ্রম বা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডে শাস্তির বিধান রয়েছে।

অনেক সময় টিভি চ্যানেলে লাশের ছবি কিংবা ধর্ষণের শিকার ব্যক্তির ছবি দেখানো হয়। বিশেষ করে লাইভ প্রচারের সময় ঘটনার তীব্রতা তুলে ধরতে গিয়ে আহতদের রক্তাক্ত ছবি দেখানো হয়। গণমাধ্যমে লাশের ছবি বা রক্তাক্ত ব্যক্তির ছবি বা ফুটেজ প্রচার বা প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই।

ধর্ষণের ঘটনায় সংবাদ করতে গিয়ে অনেক সময় ধর্ষণের শিকার ব্যক্তি বা ভুক্তভোগীর নাম তুলে ধরা হয়, যা সাংবাদিকতার নীতিবহির্ভূত। সংবাদে কোনোভাবে ভুক্তভোগীর নাম, ঠিকানা বা পরিচয় দেওয়া যাবে না। কারণ ভুক্তভোগীর নাম-পরিচয় যদি সংবাদপত্র বা টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে ওই ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন হতে হয়। অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদনে অবশ্যই অভিযুক্তের বক্তব্য থাকতে হবে। কারণ যাকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে, তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। যদি তা করা না হয়, তাহলে সংবাদটি বস্তুনিষ্ঠতা হারাবে।

সারা বিশ্বে সাংবাদিকতা পেশায় বস্তুনিষ্ঠতা, নিরপেক্ষতা, যথার্থতা, শালীনতাবোধসহ কিছু নীতিমালা মেনে চলা হয়। অপরাধ প্রতিবেদন তৈরির সময় এসব বিষয় উপেক্ষা করার সুযোগ নেই

তথ্যসূত্র

* Harris, Julian et. al. (1985), The Complete Reporter (5th edition), Mcmillan Publishing Company, New York
* Fletcher, Kim (2005), The Journalist's Handbook, Macmillan, London
* Crime Reporting Manual, Chapter 35: crime reporting introduction retrived from: https://www.thenewsmanual.net/Manuals% 20Volume%202/volume2_35.htm
* রহমান, অলিউর (২০০৭), সাংবাদিকতা: ধারণা ও কৌশল, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা

লেখক: প্রভাষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

সাইবার অপরাধঃ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ

আমানুর রহমান রনি

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বড়ো একটি জায়গা দখল করে আছে অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতা। দিন দিন এর পরিধি ও ব্যাপকতা বাড়ছে। কেবল দৃশ্যমান অপরাধ নিয়ে লেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতা। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অপরাধের ধরনে পরিবর্তন এসেছে। অপরাধীদের হাতের মুঠোয় এখন উন্মুক্ত বিশ্ব ও প্রযুক্তি। নেট দুনিয়ায় অপরাধীদের বিচরণ, সারাক্ষণ। এখন হুমকি-ধমকি, চুরি-ডাকাতি, দুর্নীতি, ষড়যন্ত্র হয়

সাইবার অপরাধীদের এ ক্ষেত্র দিন দিন বড়ো হচ্ছে। আর এ সাইবার অপরাধ নিয়েই এখন কাজ করতে হচ্ছে অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকদের, যা তাঁদের জন্য চ্যালেঞ্জ। কারণ, এ বিষয়ে বিভিন্ন সাংবাদিকের নিজস্ব অনুসন্ধানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তারপরও সেই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা যায়, যদি অনুসন্ধানের পেছনে লেগে থাকা যায়। সম্প্রতি ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় বিপ্লব চন্দ্র শুভ নামে এক হিন্দু যুবকের ফেসবুক

সাইবার অপরাধীদের এ ক্ষেত্র দিন দিন বড়ো হচ্ছে। আর এ সাইবার অপরাধ নিয়েই এখন কাজ করতে হচ্ছে অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকদের, যা তাঁদের জন্য চ্যালেঞ্জ

ইন্টারনেটে। সশরীরে উপস্থিত হয়ে সন্ত্রাসীদের কোনো গ্রুপের বৈঠক করতে হয় না।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে অবস্থানরত সন্ত্রাসীরা মুহূর্তেই নিজেদের গ্রুপের মধ্যে সব ধরনের বৈঠক ও আলাপচারিতা সেরে ফেলছে, যা একসময় ছিল কল্পনাতীত।

আইডি হ্যাক করে গুজব ছড়িয়ে দেয় একটি চক্র। এতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে চারজন নিহত হন। একটি ফেসবুক মেসেজের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় অর্ধশতাধিক আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে দ্রুত সঠিক তথ্য দিতে পারেননি

অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকরা। তাঁরা যদি দ্রুত এই হ্যাকের বিষয়টি, অনুসন্ধানের মাধ্যমে সামনে নিয়ে আসতে পারতেন, তাহলে এ হতাহতের ঘটনা ঘটত না। কিন্তু এ ধরনের অপরাধ অনুসন্ধানের জন্য সাংবাদিকদের কাছে কোনো লজিস্টিক সাপোর্ট নেই। এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য সব সময়ই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তদন্তের ওপর সাংবাদিকদের নির্ভর করতে হয়। তাই এ বিষয়ে ভালো অনুসন্ধানী রিপোর্ট দেশের গণমাধ্যমে আসেনি। কোন কম্পিউটার বা ডিভাইস ব্যবহার করে হ্যাক হয়েছিল, কোন আইপি অ্যাড্রেস থেকে ওই কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়েছিল– তা দেশের সাংবাদিকরা বের করতে পারেননি। কারণ, এ ধরনের অনুসন্ধানের জন্য যে লজিস্টিক সাপোর্ট থাকা দরকার, তা নেই। আইপি অ্যাড্রেস পেলেও সাংবাদিকের পক্ষে কম্পিউটার নির্দিষ্ট করে বের করা কঠিন। কারণ, একটি আইপি অ্যাড্রেসে দেশে কয়েক হাজার ইন্টারনেট সংযোগে কম্পিউটার ও ল্যাপটপ অপারেট করা হয়। তাই এই অনুসন্ধানের বিষয়েও সাংবাদিকদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর নির্ভর করতে হয়।

কোনো কোনো সময় সাংবাদিকরা হ্যাকার বা সাইবার অপরাধীদের চিহ্নিত করতে পারলেও তাদের বিষয়ে বিশদ তথ্য পেতে, তার অবস্থান নিশ্চিত হতে পারেন না। এমনকি অপরাধীর মোবাইল নম্বর পেলেও সে কোথায় বসে হুমকি দিয়েছে, মোবাইল ফোন নম্বরধারী ব্যক্তিটি কে, তা জানার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর নির্ভর করতে হয়। কখনো কখনো মোবাইলধারী ওই অপরাধীকে চিহ্নিত করতে বিভিন্ন অ্যাপ ব্যবহার করেন সাংবাদিক, তবে সেসব অ্যাপ থেকে গ্রহণযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। ক্রস চেক করারও সুযোগ নেই। অ্যাপে যে নাম-ঠিকানা দেখায়, তা সঠিক না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ অপরাধীরা বেশির ভাগই অন্যের নামে নিবন্ধিত সিম ব্যবহার করে। তাই এ বিষয়েও অনুসন্ধানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ওপর নির্ভর করতে হয়। কারণ, তারাই মোবাইল নম্বর ট্র্যাকিং করে ব্যক্তির অবস্থান নিশ্চিত করে তাকে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে পারেন। এরপর তার সত্যিকার পরিচয় নিশ্চিত হয়। সাংবাদিক তাদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে তারপর লিখতে পারেন। তবে সেটি আর সাংবাদিকের নিজস্ব অনুসন্ধান থাকে না। সেটি হয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অনুসন্ধান।

সাইবার অপরাধ অনুসন্ধানে সাংবাদিকদের সীমাবদ্ধতার আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। চলতি বছর নভেম্বরে হঠাৎ করেই লবণের দাম বৃদ্ধির গুজব ছড়ানো হয়। ফোন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত গুজব ছড়িয়ে পড়ে। অসাধু ব্যবসায়ীরা মাত্র কয়েক ঘণ্টায় গুজব ছড়িয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। ৩৫ টাকার লবণ বিক্রি হয়েছে ১০০ টাকায়। কোথাও কোথাও লবণ শেষমেশ পাওয়া যায়নি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এ সময় বেশকিছু খুচরা দোকানিকে আটক ও মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে সাজা দিয়েছে। তবে আজও জানা যায়নি কারা এই গুজব ছড়িয়ে টাকা হাতিয়ে নিল। সাংবাদিকরাও এ গুজবের উৎসে যেতে পারেননি। তাই অপরাধীরা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে রিজার্ভ হাতিয়ে নেওয়া, এটিএম বুথ থেকে টাকা উত্তোলন করে নেওয়াসহ অসংখ্য নিত্যনতুন অপরাধ প্রতিদিন ঘটছে। সাইবার জগৎকে অপরাধীরা নিরাপদভাবে। কারণ, এখানে নজরদারি থাকে তুলনামূলক কম। ব্যক্তিটি নিজের মোবাইল ফোনে মাথা নুয়ে কী করছে, তা আরেকজন ব্যক্তি কখনো খোঁজ নিতে যায় না। ব্যক্তিগত ডিভাইস ব্যবহারের এই সুযোগটিই অপরাধীরা কাজে লাগায়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশে বসেও সে একজনকে খুদেবার্তা পাঠিয়ে জীবননাশের হুমকি দিতে পারে। তাকে চিহ্নিত করতে করতে হয়তো সে নিরাপদে চলে যাবে। এসব অপরাধীকে চিহ্নিত করা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সাংবাদিক উভয়ের জন্য চ্যালেঞ্জ।

উন্নত রাষ্ট্রে এ অপরাধপ্রবণতা আরও বেশি। রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেও সাইবার যুদ্ধ অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে। এমনকি এক দেশের তৈরি ডিভাইস অন্য দেশ ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও এখন ভাবছে। এ বছরের শুরুর দিকে চীনা মোবাইল ফোন নির্মাতা সংস্থা হুয়াওয়ের স্মার্টফোন যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ করা হয়। চীনের বিরুদ্ধে এই ফোনের মাধ্যমে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ তুলেছিল ট্রাম্প প্রশাসন। দেশে দেশে এই প্রযুক্তি ও সাইবার-যুদ্ধের মধ্যে সাংবাদিকদের সত্য উদ্‌ঘাটন করতে হচ্ছে।

এমনকি উগ্রবাদ, জঙ্গিবাদী সংগঠনগুলোও প্রতিনিয়ত নেট দুনিয়ায় বৈঠক, ষড়যন্ত্র, তাদের নেতা নির্বাচনের মতো কাজ করছে। উগ্রপন্থি সংগঠনগুলো ইন্টারনেট দিয়ে তাদের মতাদর্শ প্রচার করে তরুণ সমাজকে রেডিক্যালাইজড করছে। নেটে অসংখ্য ফাঁদ ছড়িয়ে রয়েছে, যা নিয়ে কাজ করা চ্যালেঞ্জ।

অর্থাৎ কাজের জায়গার ব্যাপকতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতায় চ্যালেঞ্জ বেড়েছে জ্যামিতিক হারে। বিশ্বব্যাপী পরমত গ্রহণ ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়ায় এই চ্যালেঞ্জগুলো এখন মারাত্মক ঝুঁকিতে পরিণত হয়েছে। এমনকি উদাহরণ সৃষ্টিকারী গণতন্ত্রী উন্নত দেশ যুক্তরাষ্ট্রেও অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের আক্রমণের শিকার হতে হয়। সেখানে বর্তমান প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে যায়– এমন কোনো খবর ছাপা হলে তিনি সরাসরি সাংবাদিকদের আক্রমণ করছেন। এ আক্রমণের চিত্র পৃথিবীর সব দেশে একই রকম। 'অনুসন্ধানী সাংবাদিক ও খবর' কোনো না কোনোভাবে আক্রমণের শিকার হয়। তাই অপরাধবিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা সব সময় চ্যালেঞ্জ। এর সঙ্গে নতুন চ্যালেঞ্জ সাইবার অপরাধ।

সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য আইটি এক্সপার্ট বা বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন না হলেও ন্যূনতম প্রযুক্তিগত ধারণা থাকতে হবে। তাছাড়া এই সেক্টরের অপরাধ সংক্রান্ত খোঁজখবর রাখতে হবে। অপরাধের ধরন এবং অপরাধী কীভাবে কাজটি করেছে, সেগুলোও জানতে হবে। আইটি এক্সপার্টদের সঙ্গে নিয়মিত এসব অপরাধ নিয়ে আলোচনা করতে হবে। যেসব ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতা নিতে হবে, তা হবে বিশ্বস্ত সোর্সের মাধ্যমে।

আনুষ্ঠানিকভাবে মোবাইল ট্র্যাকিং করে অপরাধীর অবস্থান নিশ্চিত হওয়ার তথ্য, অপরাধীর কল লিস্ট, আইপি অ্যাড্রেসসহ ডিভাইসের তথ্য পাওয়ার সুযোগ নেই। কারণ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাদের তদন্ত শেষ হওয়া না পর্যন্ত এগুলো কোথাও সরবরাহ করবে না। তাই এসব বিষয়ে তথ্য পাওয়ার জন্য সাইবার অপরাধীদের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে দ্বিতীয় কোনো সোর্স তৈরি করতে হবে। যারা উভয়ে একে অপরের আস্থাভাজন হবেন।

সাইবার অপরাধীদের শনাক্ত করা যেমন জটিল আবার সহজও। কারণ তারা অপরাধ করতে যে কোনো এক বা একাধিক ডিভাইস ব্যবহার করে অপরাধ করে থাকে। তাই সেই ডিভাইসে তাদের অপরাধের প্রমাণ রেখেই যায়, যা কখনো সে নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। তাই কোনো না কোনো সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আওতায় আসবেই। আর সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা তার একাগ্রতা ও নিজস্ব সোর্সের সহায়তায় সাইবার-জগতের সব খবর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আগেই তুলে আনতে পারবেন।

লেখক: অপরাধবিষয়ক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক, বাংলা ট্রিবিউন

সময়ের প্রেক্ষাপটে অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতা

শামীমা চৌধুরী

রাজনৈতিক খবরের পরে যে খবর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি হচ্ছে অপরাধবিষয়ক খবর– যা অত্যন্ত দুরূহ ও জটিল। যার জন্য প্রয়োজন হয় ঘটনার গতিপ্রকৃতি জানা। পেশাগত নৈপুণ্য ছাড়া অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতা করা যায় না। ব্যক্তিজীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম, সম্পদহানি বা বিপন্নকারী সব কাজ অপরাধ হিসেবে গণ্য। এটি এমন একটি বিষয়, যার সঙ্গে জড়িত থাকে দুটি পক্ষ। একপক্ষ অপরাধের ঘটনা ঘটায়, আরেক পক্ষ সেই অপরাধের শিকার হয়। কখনো ঘটনাটি সবার সামনে আবার কখনো গোপনে বা আড়ালে ঘটে থাকে। কোনো কোনো অপরাধের তথ্যপ্রমাণাদি ও সাক্ষী সহজে পাওয়া যায়। আবার কোনো কোনো অপরাধের ঘটনার প্রমাণাদি, সাক্ষী, ক্লু ইত্যাদি পেতে ব্যাপক অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়। আর আইনের গণ্ডির ভেতরে থেকে, সংবিধান প্রদত্ত অধিকারকে অনুসরণ ও সমুন্নত রেখেই এই বিশেষ সাংবাদিকতার প্রয়াস।

সংবিধান প্রদত্ত অধিকার

অপরাধ এমন একটি বিষয়, যা পরিপূর্ণভাবে মৌলিক ও মানবাধিকারের মধ্যে পড়ে। কারণ অপরাধের কারণে একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকার বিনষ্ট হয়, খর্ব হয়। মূল ঘটনা ছাড়াও অপরাধের ঘটনার শিকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ বা ভুক্তভোগী যাতে সুবিচার পায়, তা অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতায় তুলে ধরা হয়। আর তাই বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৬-৪৬ অনুচ্ছেদে নাগরিকের মৌলিক অধিকারের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর এটি মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার ৩নং

সংবাদপত্রের সীমানা ছাড়িয়ে গত শতাব্দীর নব্বই দশকে
এ দেশে বিবিসি ও সিএনএন চালুর মধ্য দিয়ে দেশের
মানুষ প্রবেশ করে গণমাধ্যমের নতুন ভুবনে।
যাকে বলা যায় আন্তর্জাতিক রূপ

অনুচ্ছেদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৩-এ বলা হয়েছে:

(১) গ্রেফতারকৃত কোনো ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্রই গ্রেফতারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

(২) গ্রেফতারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেফতারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে (গ্রেফতারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোনো কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।
   (ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশি শত্রু, অথবা
   (খ) যাহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান সংবলিত কোনো আইনের অধীন গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আটক করা হইয়াছে।

(৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান সংবলিত কোনো আইন কোনো ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিককাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রিমকোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা রাখেন এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোনো উপদেষ্টা পর্ষদ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ দানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্তকাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে।

(৫) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান সংবলিত কোনো আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাহাকে যথাসম্ভব শীঘ্রই আদেশ প্রদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রকাশের জন্য তাহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগ দান করিবেন; তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

(৬) উপদেষ্টা পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

যাকে ম্যাজিস্ট্রেটের প্রদত্ত ওয়ারেন্ট মূলে গ্রেফতার করা হয়, তাকে আর নতুন করে কারণ জানানোর প্রয়োজন নেই, ওয়ারেন্ট দেখালেই হলো। কারণ ওয়ারেন্টেই গ্রেফতারের কারণ বর্ণিত হয়। যথাসম্ভব শীঘ্রই গ্রেফতারের কারণ জানানোর কথা বলা হয়েছে। যথাশীঘ্র বলতে কোনো সুনির্দিষ্ট সময় বোঝায় না। তবে এই যথাশীঘ্র যে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি নয়। সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

অপরাধবিষয়ক খবর ও সাংবাদিকতা

সংবাদপত্রের সীমানা ছাড়িয়ে গত শতাব্দীর নব্বই দশকে এ দেশে বিবিসি ও সিএনএন চালুর মধ্য দিয়ে দেশের মানুষ প্রবেশ করে গণমাধ্যমের নতুন ভুবনে। যাকে বলা যায় আন্তর্জাতিক রূপ। আর এখন হাজারও স্যাটেলাইটের কল্যাণে পৃথিবীর সব প্রান্তের মানুষ একে অপরের পরমাত্মীয়, অতিচেনা, অতিপরিচিত। বিশ্বের প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে মানুষের সম্পৃক্ততা। আধুনিক প্রযুক্তি ইমেইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক, অনলাইন, ব্লগ ইত্যাদির মাধ্যমে সাংবাদিকতা পেশার বিকাশের প্রায় শীর্ষ ধাপটি এখন হাতের মুঠোয়। এই পেশায় এসেছে আধুনিকতা, নতুনত্ব, অভিনবত্ব। মূলধারার সাংবাদিকতার পাশাপাশি স্পেশালাইজড সাংবাদিকতার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পরিবেশ সাংবাদিকতা, কূটনৈতিক সাংবাদিকতা, অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা, সংসদবিষয়ক সাংবাদিকতা, জ্বালানিবিষয়ক সাংবাদিকতা, নারী সাংবাদিকতা, অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতা, সাংস্কৃতিক সাংবাদিকতা ইত্যাদি। এর মধ্যে অপরাধবিষয়ক খবর বা অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতা প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে পাঠকদের আকৃষ্ট করছে প্রবলভাবে।

অপরাধ কী? অপরাধ হচ্ছে আইন ভঙ্গ করা। সুশৃঙ্খল জনজীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নকারী কর্মকাণ্ড হচ্ছে অপরাধ। অপরাধ মানব-সভ্যতার জন্য নতুন কোনো ঘটনা নয়। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই অপরাধ ছিল। মনোচিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, প্রতিটি অপরাধ ঘটনার ভেতরে কোনো না কোনোভাবে পশুত্ব বিরাজমান। এই পশু প্রবৃত্তিকে কেউ দমন বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, কেউ পারে না। যারা পারে না, তারাই জড়িয়ে যায় অপরাধ কর্মযজ্ঞের সঙ্গে। সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে অপরাধের ধরন। সভ্যতার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের ধরন যেমন বদলেছে, তেমনি তা হয়ে উঠেছে আরও ভয়াবহ, জটিল। এ প্রসঙ্গে ২০১৯ সালের শেষের দিকে আমাদের দেশে ঘটা কিছু হত্যাকাণ্ডের ঘটনা তুলে ধরা হলো। যেগুলো দেশব্যাপী আলোড়ন তুলেছিল। সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার রাজানগর ইউনিয়নের কেজাউরা গ্রামের শিশু তুহিনকে নির্মমভাবে হত্যা করে উঠোনের কদমগাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এ সময় তুহিনের পেটে ঢোকানো ছিল দুটি লম্বা ছুরি। তার দুটি কান ও যৌনাঙ্গ কেটে ফেলা হয়। এই হত্যার সঙ্গে জড়িত তার বাবা ও চাচা। এ ঘটনার এক মাস পর ৬ অক্টোবর বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। দেশের মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বুয়েটের এই ঘটনা দেশ ও দেশের বাইরে তোলপাড় সৃষ্টি করে। মামলাটি এখন বিচারাধীন।

বরগুনার রিফাত শরীফকে কুপিয়ে হত্যা করা হয় স্ত্রীর সামনে। ঢাকার ধানমন্ডির ২৮নং রোডে প্রবীণ গৃহকর্ত্রী দেশের একজন শিল্পপতির শাশুড়ি আফরোজা বেগম ও তার কাজের মেয়ে দিতি অপর কাজের মেয়ে সুরভির হাতে খুন হন। আওয়ামী লীগ নেতা ইসমত কাদির গামার স্ত্রী ইডেন কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ পারভিন কাদের খুন হন গৃহপরিচারিকার হাতে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় ফেনীর সোনাগাজীর মাদ্‌রাসা ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফিকে পুড়িয়ে মারা হয়।

এ তো মাত্র এক বছরে ঘটে যাওয়া কয়েকটি অপমৃত্যুর ঘটনা। এর সঙ্গে আরও আছে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা। আছে শিশু ধর্ষণ আর হত্যার ঘটনা। এই প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, সুনাম, সম্পত্তির হানি। আর পত্রিকা ও চ্যানেলে প্রচারের কারণে প্রতিটি ঘটনার সত্যতা জেনেছে মানুষ।

অপরাধ ঘটনার শ্রেণি বিশ্লেষণ

অপরাধের ঘটনার শ্রেণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অপরাধের ঘটনা ঘটে নানাভাবে, নানা কারণে। অপরাধ হয় ব্যক্তির সঙ্গে সম্পদ নিয়ে, রাজনৈতিক কারণে, সামাজিক কারণে। এছাড়াও আরও বহু কারণে। আর তাই অপরাধ সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই ধারণাগুলো হচ্ছে:

* সামাজিক অপরাধ: নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা, দুর্নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক অপরাধ, যৌতুক, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি।
* রাজনৈতিক অপরাধ: যে কোনো ধরনের দুর্নীতি, বেআইনি

কার্যকলাপ, রাজনৈতিক আইন বা রাষ্ট্র ও সরকারবিষয়ক আইন ভঙ্গ করা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার যে কোনো ধরনের অপব্যবহার।

* বাসস্থানের কারণে: কারও সম্পত্তি বা ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ বা অগ্নিসংযোগ।
* ব্যক্তিগত: হিংসাত্মক আক্রমণ বা সাধারণ আক্রমণ, মারধর, অপহরণ, ধর্ষণ ও হত্যা হচ্ছে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ।
* সম্পত্তি সংক্রান্ত: চুরি, ডাকাতি, অর্থ আত্মসাৎ, বন্ধুর দোহাই বা ছদ্মবেশে কিছু করা, জালিয়াতি, অন্যায় আচরণ, বলপ্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শনে কিছু আদায় ও ব্ল্যাকমেইল।
* নৈতিকতা ও শালীনতা: যে কোনো ধরনের যৌন অন্যায় আচরণ, প্রলোভন, বেশ্যাবৃত্তি, মাদকবিষয়ক লেনদেন ও যৌন নির্যাতন।
* জনশান্তি সংক্রান্ত: শান্তির বিঘ্ন ঘটানো, ঝগড়া, বেআইনি সভা বা সমাবেশ, দাঙ্গা, জনসভায় বাধা দান, জোরপূর্বক প্রবেশ, মানহানি, লুকানো অস্ত্র, জুয়া ও অন্যান্য।
* আইন ও কর্তৃপক্ষ: রাজনৈতিক প্রতারণা, সত্যকথনের শপথের পর সজ্ঞানে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা কথা বলা, টাকা জাল করা, সুবিচার ও শাস্তি প্রদানে বিঘ্ন ঘটানো, ষড়যন্ত্র, আদালত অবমাননা ও অন্যান্য।
* জানমালের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও আরামের বিরুদ্ধে: উপদ্রব, বিড়ম্বনা, ট্রাফিক নিয়ম, খাদ্য ও ওষুধ আইন, স্বাস্থ্য আইন ইত্যাদির বিরুদ্ধে ঘটনা।

অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকের দায়িত্ব

আমেরিকার নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরিটাস অপরাধ সাংবাদিক বিশেষজ্ঞ Curtis D.Maccdoudall তাঁর Interpretative Reporting (South Edition. page no 266-267) শীর্ষক গ্রন্থে অপরাধবিষয়ক খবর এবং একজন ক্রাইম রিপোর্টারের দায়িত্বের বিবরণ দিয়েছেন। যেখানে একজন ক্রইম রিপোর্টারকে গোয়েন্দার ভূমিকা পালনের কথাও বলেছেন। তিনি বলেছেন:

All crime stories involve action. They related to incidents which are potentially exciting when read about, provided the reporter has been resourceful and thorough in his newsgathering. Until a case reaches court, knowledge of law is secondary to ability to observe, describe and imagine all of the angles needing investigation and the sources from which information may be obtainable. The crime reporter, in other words, must possess some of the qualities of a good detective although his purpose in entirely different. He is not out to solve the crime but to learn all that it is possible to find out about it.

একজন ক্রইম রিপোর্টারকে বস্তুনিষ্ঠ সঠিক সংবাদ সংগ্রহের জন্য যা তুলে ধরতে হবে, এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ Curtis D. Maccdoudall নির্দেশনাও দিয়েছেন, তা হলো:

1. Causalities.
   a. Lives lost or threatened.
   b. Injuries and how received.
   c. Description of any gun play or fighting.
   d. Disposition of dead and injured.
   e. Prominent names among dead and injuured.
2. Property loss.
   a. Value of loss.
   b. Nature of Property stolen or destroyed.
   c. Other property threatened.
3. Method of crimes.
   a. How entrance was effected.
   b. Weapons or instruments used.
   c. Treatment of victims.
   d. Description of unusual circumstances.
   e. Similarly to previous crimes.
4. Cause or motive.
   a. Confessions.
   b. Statements of victims.
   c. Statement of police, witness and others.
   d. Threats.
5. Arrests.
   a. Name of Persons arrested.
   b. Complaint our policeman making arrest.
   c. Charges entered on police blotter.
   d. Police ingenuity.
   e. Danger incurred by police.
   f. Arraignment.
6. Clues as to identity of criminals.
   a. Evidence at scene of crime.
   b. Testimony of witnesses.
   c. Statement of police.
   d. Statement of police.
   e. Statements of victim and others.
7. Connection with other crimes.
   a. Probability of arrest.
   b. Description of missing persons.
   c. Value of clues.
   d. Contact with criminal through ransom notes, etc.

অপরাধ খবর হিসেবে যা গুরুত্ব পায় বেশি

* বিশিষ্ট ব্যক্তি: কোনো বিশিষ্ট বা বিখ্যাত ব্যক্তির অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ঘটনা।
* গুরুত্বপূর্ণ স্থান: যেমন ওয়াশিংটন ডিসি, লন্ডন, মক্কা– এ রকম নামকরা শহরে অপরাধ সংঘটিত হলে তা গুরুত্ব পায়।
* অধিক মানুষের স্বার্থ: যে ঘটনায় অনেক মানুষের স্বার্থ থাকে, তা প্রাধান্য পায়। যেমন– ব্যাংক ডাকাতি, এলাকার জমি দখল ইত্যাদি।
* রহস্য ও অনিশ্চয়তা, উৎকণ্ঠা বা সংশয়, প্লেন ছিনতাই বা জিম্মির ঘটনা।
* ডাকাতি, ছিনতাই, চুরি অথবা প্রতারণার মাধ্যমে সম্পত্তির ক্ষতিসাধন বা হারানোর ঘটনা।
* অন্যান্য: মানবিক ঘটনাবলি সংবাদ হিসেবে প্রাধান্য পায়। যেমন, শিশুধর্ষণ অথবা পাশবিক হত্যাকাণ্ড।

অপরাধ প্রতিবেদনের উপাদান

১. ক্ষয়ক্ষতি
২. সম্পত্তির ক্ষতিসাধন
৩. অপরাধের পদ্ধতি বা প্রকৃতি, কারণ বা উদ্দেশ্য।
৪. গ্রেফতার
৫. ক্লু
৬. আইন ভঙ্গকারীর অনুসন্ধান

রিপোর্ট বস্তুনিষ্ঠ, নির্ভুল হওয়ার জন্য যা দরকার

আইনের গণ্ডির মধ্যে থেকে সংবিধান প্রদত্ত অধিকারকে খর্ব না করে একজন সাংবাদিককে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর তাই তাঁকে

রিপোর্ট তৈরি করতে হলে নৈতিক নীতিমালার পাশাপাশি যা অনুসরণ করতে হবে, তা হলো:

* তথ্য সংগ্রহে কৌশলী
* ঘটনা প্রত্যক্ষ করে রিপোর্ট লিখতে হবে
* সর্বাধিক তথ্য সংগ্রহ করার দিকে খেয়াল রাখতে হবে
* যেতে হবে সঠিক প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে
* ঘটনার পেছনের ঘটনা অনুসন্ধান করতে হবে
* প্রাপ্ত সব তথ্যকে নির্ভুলভাবে যাচাই করতে হবে
* গুরুত্ব দিতে হবে দুপক্ষের বক্তব্যকে
* ধৈর্যশীল হতে হবে। সহজে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না
* রিপোর্টে তথ্যের পাশাপাশি বিনোদনের চেষ্টা থাকবে
* রিপোর্টের ভাষা হবে সহজ সরল, পরিষ্কার, জটিল বাক্য পরিহার করতে হবে
* রিপোর্টের ফলোআপ থাকা অতি জরুরি
* ভয়াবহ ছবি, ধর্ষিতার ছবি প্রকাশ বা প্রচার করা যাবে না।

লেখার শুরুতেই বলা হয়েছে, এ দেশে রাজনৈতিক সংবাদের পর পাঠককে সবচেয়ে আকর্ষণ করে অপরাধবিষয়ক খবর। নেতিবাচক খবরের প্রতি পাঠকের আগ্রহ প্রবল থাকায় এর জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। তবে অনেক সময় ভুল রিপোর্টিংয়ের কারণে সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূলের বদলে জনমনে সন্দেহ তৈরি হয়। এটি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। এই ধরনের রিপোর্ট ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা না থাকলে, নিজ নিজ প্রচারমাধ্যম প্রয়োজনীয় স্পেস না দিলে রিপোর্ট বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। একজন সাংবাদিক এক্ষেত্রে যতই যোগ্য পরিচয় দিক না কেন, মালিক-কর্তৃপক্ষের চাপ, আন্তরিকতার অভাব, যথার্থ স্পেসের অভাব ইত্যাদি কারণে রিপোর্ট পরিপূর্ণতা পায় না। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় এই দায়িত্ব গণমাধ্যমের সব স্তরকে নিতে হবে।

তথ্যসূত্র

১. Curtis D. Maccdoudall, Interpretative Reporting (South Edition. page no. 266-267)
২. গাজী শামসুর রহমান, মৌলিক অধিকার, নিরীক্ষা, পিআইবি, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৪, পৃ. ১২-১৩।
৩. ফজলুল করিম, ক্রাইম রিপোর্টিং, নিরীক্ষা, পিআইবি, অক্টোবর ২০৪, পৃ. ১৮-১৯।
৪. জওয়াদুর রহমান, ক্রাইম রিপোর্টিং, পৃ. ৩৪-৩৮

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, সাংস্কৃতিককর্মী, গণমাধ্যম গবেষক

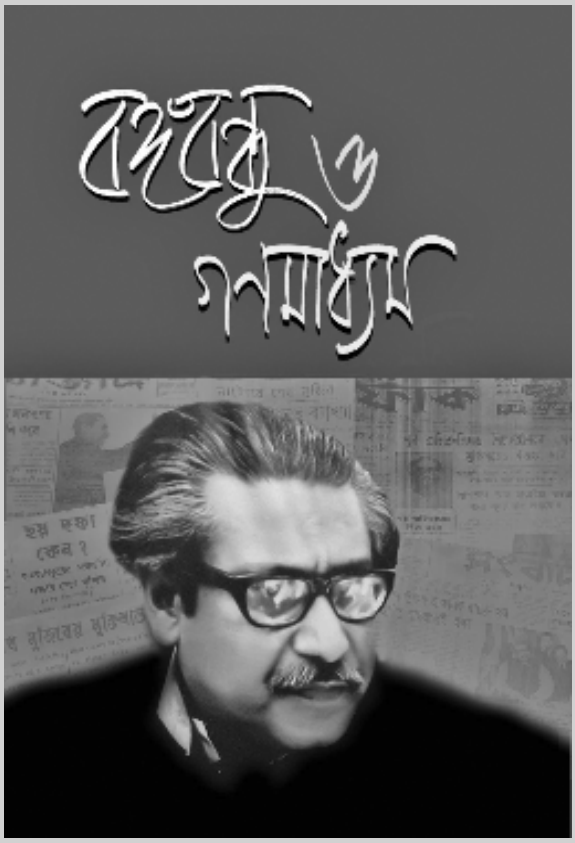

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

সৎ সাংবাদিকতার চর্চা এখন সময়ের দাবি

মো. সাখাওয়াত হোসেন

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সুগঠিত সমাজব্যবস্থা ও গঠনমূলক সামাজিক কাঠামোর জন্য গণমাধ্যম এক শক্তিশালী হাতিয়ারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আমাদের মহান স্বাধীনতা-সংগ্রামসহ বাংলা ও বাঙালির জীবনে সংঘটিত সব স্বাধিকার, গণতান্ত্রিক ও যৌক্তিক আন্দোলন-সংগ্রামে মুক্তিকামী মানুষের পাশে থেকে যথাযথ দায়িত্ব পালনে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সর্বোপরি গণমাধ্যম সমাজের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে থাকে, যার ভিত্তিতে ওই সমাজকে সহজেই মূল্যায়ন সম্ভব হয়। সমাজের অভ্যন্তরীণ যে কোনো ধরনের সমস্যা, ত্রুটিবিচ্যুতি, সম্ভাবনা ও সামগ্রিক পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে নানাবিধ বিষয় সংবাদমাধ্যমে খবরের শিরোনাম হয়ে থাকে। গণমাধ্যমের আলোচিত, আলোড়িত খবরের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারপ্রধানরা বিভিন্ন বার্তা পেয়ে থাকেন, যেখানে নাগরিক সমস্যা ও সম্ভাবনাসহ বিজ্ঞজনদের পরামর্শ ও মতামত পাওয়া যায়। তবে সেক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে নিরপেক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে, অন্যথায় নাগরিকরা গণমাধ্যমের ওপর আস্থার জায়গা ধরে রাখতে পারবেন না। গণমাধ্যম হারাবে তার বিশ্বাসযোগ্যতা, নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা হারাবে গণমাধ্যম। কাজেই গণমাধ্যমকে যেমন প্রগতিশীলতার চর্চা করতে হবে, ঠিক তেমনি নিরপেক্ষতার পরিচয় দিতে হবে এবং পাশাপাশি গণমাধ্যমের স্বাধীনতাও নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই গণমাধ্যম বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগী হিসেবে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভূমিকা রাখতে পারবে।

তবে সেক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে নিরপেক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে, অন্যথায় নাগরিকরা গণমাধ্যমের ওপর আস্থার জায়গা ধরে রাখতে পারবেন না। গণমাধ্যম হারাবে তার বিশ্বাসযোগ্যতা, নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা হারাবে গণমাধ্যম

একজন সাংবাদিকের যেসব গুণাবলি থাকা প্রয়োজন, তার মধ্যে অন্যতম হলো– সংবাদ বোঝার ক্ষমতা, প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিশ্রমী, সংবাদ বাছাই করার ক্ষমতা, সৎ ও বুদ্ধিমান, প্রজ্ঞাবান, সাহসী ও অধ্যবসায়ী, সচেতন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী, উপস্থিত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন এবং নিরপেক্ষ চরিত্রের অধিকারী। উল্লিখিত গুণাবলিসম্পন্ন যে কোনো সাংবাদিক গণমাধ্যমের জন্য কিংবা যে কোনো রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে প্রকৃত সংবাদকর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন; কিন্তু বাংলাদেশে কতজন সাংবাদিক আছেন অমন গুণাবলিসম্পন্ন? তবে আমরা আশা করব, প্রকৃত সদিচ্ছা নিয়ে যারা সাংবাদিকতা পেশায় ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহী, তারা অবশ্যই উল্লিখিত গুণাবলিসম্পন্ন হবেন, তাহলে বাংলাদেশের গণমাধ্যম সত্যিকার অর্থে গণমানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে।

বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে অসংখ্য সাংবাদিক, নামসর্বস্ব প্রিন্ট মিডিয়া, অনলাইন মিডিয়া রয়েছে; কিন্তু সেসব সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যম প্রকৃত অর্থে রেজিস্ট্রার্ড কি না, এ বিষয়ে নজরদারি ও যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। জাতীয় পত্রিকা ছাড়াও জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অসংখ্য সংবাদমাধ্যম রয়েছে এবং সেগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন রয়েছে। বাংলাদেশের মতো ভূখণ্ডে হাজার হাজার মিডিয়ার যৌক্তিকতা কতটুকু, বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে এ প্রশ্নে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সবাই বিষয়টি নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করে আলোচনার মাধ্যমে বাস্তবতার অনুশীলন করা উচিত বলে মনে করি। কেননা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংবাদমাধ্যম খবরের নিরপেক্ষতা নিয়ে সবার মনে সন্দেহের উদ্রেক তৈরি করে। বিশেষ করে হলুদ সাংবাদিকতাকে প্রলুব্ধ করে থাকে।

সংবাদমাধ্যম যখন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কোনো ব্যক্তি, সংগঠন কিংবা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মিথ্যা, বানোয়াট, কুরুচিপূর্ণ, বিদ্বেষপূর্ণ ও অবমাননাকর সংবাদ পরিবেশন করে থাকে, তখন সেটি হলুদ সাংবাদিকতার নামান্তর। হলুদ সাংবাদিকতা পরিহার ব্যতিরেকে সংবাদমাধ্যম সাধারণ জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস কোনোটাই অর্জন করতে পারবে না। সত্য অনুসন্ধানের নিমিত্তে প্রত্যেক সাংবাদিকের অনুসন্ধানী উদ্যম থাকা প্রয়োজন। সংবাদকে খবরের কাগজে পরিবেশনের আগে ওই সংবাদটির প্রকৃত সত্য খোঁজা, বোঝা ও জানার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করা প্রয়োজন। তবে অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সাংবাদিককে নানা রকমের পদ্ধতি অবলম্বন ও প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করতে হয়। অন্যের ফসল তুলে ধরলে বা শুনে লেখা বা গুজবে বিভ্রান্ত হয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করলে হবে না এবং সেটা কখনো অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মধ্যে পড়ে না। বিচক্ষণ এবং অনুসন্ধিৎসু চোখ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পথকে উন্মুক্ত করে থাকে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকের নানারূপ পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে পত্রিকার জন্য সংবাদ সংগ্রহ করতে হয়। শোনা কথায় বিশ্বাস না করে কিংবা বর্তমানে অনলাইন যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত যে কোনো সংবাদের ওপর আস্থা না রেখে সরেজমিনে ঘটনার স্থান পরিদর্শন করে তৎসংশ্লিষ্ট স্থানে বসবাসরতদের মধ্য থেকে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার সঠিকতা নিরূপণের মাধ্যমে খবরের কাগজে প্রকাশ করা উচিত। সংবাদের তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণার নানা পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। যেমন সরাসরি কথা বলা, বিশ্বস্ত সোর্স নিয়োগ করা, গোয়েন্দার মতো নজরদারি করা, সমাজের মধ্যে বসবাসরত মানুষকে নিয়ে বসে আলোচনা করে সমাধান করার মাধ্যমে অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিক মনের খোরাক অর্জিত হয়।

জটিল বিষয়ে কিংবা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য নিয়মিতভাবে দিনের পর দিন পর্যবেক্ষণ করে সব ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে সঠিক তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে একেবারে নিশ্চিত হয়েই সংবাদ পরিবেশন করা উচিত। পাশাপাশি তথ্যের অপলাপ বিকৃতি রোধে অনলাইনের ওপর নির্ভর করা যেতে পারে। কারও প্ররোচনায় কিংবা কারও বিরুদ্ধে ঈর্ষান্বিত হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করে সংবাদ পরিবেশন করা কোনোভাবেই শোভনীয় নয়। একজন প্রকৃত সাংবাদিকের মূল কাজ হচ্ছে যথাযথ ঘটনার আলোকে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করে সঠিক সংবাদটি পরিবেশন করা। উল্লেখ করা যেতে পারে, কারও বিরুদ্ধাচরণ করে প্রকাশিত সংবাদ যেভাবে ফোকাস করে প্রচারিত হয়, প্রতিবাদলিপি ঠিক ততটাই কম গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়। সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিষয়টা অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

কাজেই সংবাদ পরিবেশন এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের আরও বেশি মনোযোগী, গবেষণাপ্রসূত ও নিরপেক্ষ মানসিকতার সমন্বয়ে সংবাদ প্রকাশ করতে হবে। কেননা হলুদ সাংবাদিকতা এবং গুজবের ভয়াবহ পরিণতি সামগ্রিক স্থিতাবস্থাকে নষ্ট করে দেয়। পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে নেমে আসে হিংসা-বিদ্বেষের কালো থাবা এবং ওই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য দুঃসহ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে সমাজে বসবাসরত প্রত্যেকেই যদি উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, তাহলে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রকৃত অর্থেই সরকারের জন্য অসহনীয় হয়ে উঠবে। আমাদের দেশে গুজবে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী মানুষের সংখ্যা যেমন রয়েছে, আবার তেমনি গুজব সৃষ্টিরও নানা উপাদান ও আলামত পাওয়া যায় অহরহ।

পেশাদারি সাংবাদিকতার জন্য আরও বেশি সচেতন ও নজরদারির চর্চা করা প্রয়োজন। কেননা উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সাংবাদিকদের দৌরাত্ম্যের চিত্রের সংবাদ মাঝেমধ্যে সংবাদমাধ্যমে জানা যায়। বিশেষ করে নিরীহ এবং সামাজিকভাবে খানিকটা পিছিয়ে থাকা মানুষের কাছে সাংবাদিক অনেক সময় ত্রাস হিসেবে পরিচিত পায়– এমন অভিযোগ রয়েছে। কাজেই এসব বিষয়ে সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষকে আরও বেশি জবাবদিহিতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে।

অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সাংবাদিককে অধিক সহনশীল, মনোযোগী, সুচিন্তক ও প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে সংবাদ পরিবেশন করা উচিত। ইতোমধ্যে গুজবের মারাত্মক প্রভাব, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা ধরনের সংবাদের ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে অবগত হয়েছি আমরা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, লবণের মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত খবরের পরিপ্রেক্ষিতে সারাদেশে মজুতদারদের লবণ মজুত করার পাঁয়তারা ও সাধারণ ক্রেতা-ভোক্তাদের অতিরিক্ত দামে লবণ কিনে সংগ্রহ করার কর্মপ্রচেষ্টা আমরা দেখেছি। ফলে সারাদেশে যে গুজবের সৃষ্টি হয়, তার লাগাম টানতে সরকারকে প্রজ্ঞাপন জারি করতে হয়েছিল। কাজেই অপরাধবিষয়ক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের নীতি-নৈতিকতার সমন্বয়ে সৎ সাংবাদিকতার চর্চার অনুশীলন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। অন্যথায় সাংবাদিকতা ও সাংবাদিক-সমাজের প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের জায়গা ধীরে ধীরে তলানিতে নেমে যাবে।

তথসূত্র

১. শামীম আল আমিন (২০১৬) গণমাধ্যম এবং সাংবাদিকতা, চতুর্থ মুদ্রণ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।
২. কুররাতুল-আইন-তাহমিনা (২০১৬) চর্চা করুন, খবর লিখুন: পাঁচরঙা যুক্তি-পরামর্শ, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

লেখক: প্রভাষক, ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

অপরাধ প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা ও প্রতিবন্ধকতা

পারভীন সুলতানা রাব্বী

সমাজে অপরাধ পরিস্থিতি কোনো স্থিতিশীল বিষয় নয়। অপরাধ কখনো বৃদ্ধি পায় আবার কখনো বা নতুন নতুন অপরাধ সংঘটিত হয়। অপরাধের ধরন পালটে যায়, পালটে যায় অপরাধীর বৈশিষ্ট্য। দেখা যায়, যাদের অপরাধ করার কথা নয়, তারাও অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। তাই গণমাধ্যম শুধু অপরাধবিষয়ক রিপোর্টিং করে দায় সারতে পারে না। সমাজে সামগ্রিকভাবে অপরাধ পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয় গণমাধ্যমকেই। সমাজে অপরাধ দমন ও অপরাধপ্রবণতা হ্রাসে গণমাধ্যমগুলোকে অপরাধ প্রতিবেদনের (crime reporting) মান বজায় রাখার গুরুদায়িত্ব পালনে ব্রতী হতে হয়।

প্রচারমাধ্যমে প্রতিনিয়ত অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। সংবাদপত্র বা টেলিভিশন সব মাধ্যমেই গুরুত্ব সহকারে খুন, জখম, ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণ, ধর্ষণের ঘটনা বা দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অপরাধের ঘটনা প্রকাশিত হয়। কারণ অপরাধমূলক ঘটনায় সংবাদমূল্য আছে অর্থাৎ পাঠক ও দর্শক-শ্রোতার মনে এ বিষয়ে জানার আগ্রহ আছে। তাই তো বলা হয়, Bad news is good news.

অপরাধ শব্দটি ব্যবহারের ব্যাপকতা থাকলেও আইনের পরিভাষায় এর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে। অপরাধ বলতে এমন কাজ বোঝায়, যা দ্বারা দেশের বর্তমানে প্রচলিত কোনো আইন লঙ্ঘিত হয়। মন্দকাজ মাত্রই আইনের ভাষায় তা অপরাধ হয় না। যেমন কাউকে কথা দিয়ে কথা না রাখা নিঃসন্দেহে মন্দকাজ, নৈতিকতাবিবর্জিত কাজ, তবে এক্ষেত্রে আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ বলে গণ্য হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

দর্শক-পাঠকশ্রেণির জানার আগ্রহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেই অপরাধমূলক ঘটনার বিবরণ প্রকাশ এবং সমাজে বিরাজমান অপরাধ পরিস্থিতির প্রতি আলোকপাত করে গণমাধ্যমগুলো অপরাধমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে জাতীয় প্রচেষ্টায় এক পরোক্ষ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

আবার অপরাধের তালিকা পরিবর্তনশীল। যেমন– একই ধরনের কাজ স্থান-কাল-পাত্রভেদে অপরাধ বলে ধার্য হয় না। যেমন– যৌতুক আদানপ্রদান, বণ্যপ্রাণী শিকার বা হত্যা, মাদক গ্রহণ, দুর্নীতি– এসব কর্মকাণ্ড একদা নৈতিকতাবিবর্জিত হলেও আইনগতভাবে অপরাধ বলে বিবেচিত হতো না। কিন্তু বর্তমানে এগুলো নিয়ে আইন তৈরি হওয়ায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হয়। যেমন– বনে গিয়ে বিনোদনের জন্য বা খাওয়ার জন্য বন্যপ্রাণী শিকার বা হত্যা, বিয়েতে যৌতুক দেওয়া-নেওয়া– এসব অতীতে অপরাধ হিসেবে আইনের আওতায় আনার সুযোগ ছিল না। সময়ের প্রয়োজনে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের লক্ষ্যে আইন প্রণীত হয়েছে, যৌতুক নিরোধ আইন, মাদকবিরোধী আইন, দুর্নীতিবিরোধী আইনসহ সমাজের শৃঙ্খলা, সভ্যতা, সহনশীলতা বজায় রাখার জন্য জনস্বার্থে এসব আইনের প্রচলন ঘটেছে। তাই সুন্দরবনে গিয়ে হরিণ, বাঘ বা কোনো বন্যপ্রাণী শিকার বা হত্যা করলে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

কোনো একটি অপরাধ সংঘটিত হলে একপক্ষ অপরাধ করে, অন্যপক্ষ অপরাধের শিকার (victim) হয়। যেমন খুনের ঘটনায় একজন খুন করে, অন্যজন খুনের শিকার হয়। যে খুন করে সে অপরাধ করে (অপরাধী) আর যে খুনের শিকার হয় সে অপরাধের শিকার (victim)। আবার এমন কিছু অপরাধ আছে যার অন্যপক্ষ নেই। যেমন– যিনি মাদক গ্রহণ করেন, তিনি একপক্ষ এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার অন্যপক্ষ নেই। তবে এখানে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, একজন অন্যপক্ষ আছে। অর্থাৎ যিনি মাদক গ্রহণ করছেন, তিনি নিজে যেমন একপক্ষ হয়ে অপরাধ (crime) করছেন আবার মাদক গ্রহণের ফলে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন অন্যপক্ষ (victim) হিসেবে। অপরাধী তার অপরাধের মাধ্যমে নিজের ক্ষতি করছে। পাশাপাশি নিজ পরিবারের অর্থ, স্বাস্থ্য ও সামাজিক মর্যাদাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আর সমাজে বসবাসরত প্রতিটি মানুষই সমাজের আর্থসামাজিক অবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই সামাজিক প্রেক্ষাপটে একজন মানুষের ক্ষতিও সামাজিক ক্ষতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এভাবে সমাজে সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের অপরাধের দ্বারা অপরাধকারী নিজে, তার পরিবার, সমাজ তথা পুরো রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি অপরাধ কালক্রমে ব্যক্তি, পরিবার তথা সমাজের অর্থ ও শ্রমঘণ্টা নষ্ট করে সমাজের বোঝায় (burden) পরিণত হয়। সার্বিকভাবে অপরাধ বলতে এমন কাজ করা বোঝায় (understanding), যা দ্বারা দেশের প্রচলিত কোনো আইন লঙ্ঘিত হয় এবং এক বা একাধিক ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোনো কোনো অপরাধে গোটা সমাজ বা রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যেমন– ওষুধে ভেজাল মেশানো এমন এক অপরাধ, যা দ্বারা পুরো সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট আইন লঙ্ঘন করলে অপরাধ সংঘটিত হয় এবং অপরাধী আইনত দণ্ডনীয় হয়। আবার গুরুত্বভেদে অপরাধ দুই প্রকার হয়– (১) গুরু অপরাধ ও (২) লঘু অপরাধ। হত্যা, অপহরণ, ডাকাতি, ধর্ষণ, দুর্নীতি প্রভৃতি গুরু অপরাধ আবার ট্রাফিক পুলিশের নির্দেশ অমান্য করা কিংবা 'নো পার্কিং' লেখা স্থানে গাড়ি দাঁড় করানো লঘু অপরাধ।

বাস্তবিকভাবে অপরাধমূলক প্রতিবেদন (Reporting) পাঠক ও দর্শকশ্রোতাকে বেশি আকৃষ্ট করে। তবে শুধু দর্শকশ্রোতা বা পাঠককে আকৃষ্ট করাই অপরাধ প্রতিবেদনের (Crime Reporting) কাজ বা উদ্দেশ্য নয় এবং উদ্দেশ্য হওয়াও সংগত নয়। দর্শকশ্রোতা ও পাঠকশ্রেণি (Vewers & Readers) মূলত টেলিভিশন দেখে বা পত্রিকা পাঠ করে সমাজে সংঘটিত ঘটনাবলির তথ্য জানার জন্য। সেসব তথ্যই মনুষকে বেশি আকৃষ্ট করে, যা সমাজে অনিয়মিত, অশৃঙ্খলিত বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা স্বাভাবিকতাকে ভঙ্গ করে। পাঠক-দর্শকশ্রেণি সমাজে সংঘটিত নানা অপকর্ম-অপঘটনা থেকে সতর্ক থাকতে চায় বা নিরাপদ থাকতে চায়।

দর্শক-পাঠকশ্রেণির জানার আগ্রহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেই অপরাধমূলক ঘটনার বিবরণ প্রকাশ এবং সমাজে বিরাজমান অপরাধ পরিস্থিতির প্রতি আলোকপাত করে গণমাধ্যমগুলো অপরাধমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে জাতীয় প্রচেষ্টায় এক পরোক্ষ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

> অপরাধ প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, এ ধরনের রিপোর্টিংয়ে তথ্য খুব সহজে পাওয়া যায় না। যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তা বিশ্বাসযোগ্যভাবে পরিবেশনের জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়

এ ধরনের প্রতিবেদন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অপরাধ দমন তৎপরতা বৃদ্ধি করে, অপরাধের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে, সম্ভাব্য অপরাধীর মনে অপরাধ করে পার পাওয়া যাবে না– এমন আশঙ্কা তৈরি করে এবং সমাজবিজ্ঞানীদের অপরাধ পরিস্থিতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে উৎসাহ জোগায়। অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড একটি সামাজিক ব্যাধি। তাই অপরাধীর সাজা দেওয়াই বড়ো কথা নয়। অপরাধপ্রবণতার মূল যেসব সামাজিক কারণ সক্রিয়, তা চিহ্নিত করে দূর করার সম্ভাব্য পদক্ষেপ নির্ধারণ করার প্রয়োজনকেও ছোটো করে দেখার সুযোগ নেই। সুতরাং বলা যায়, সমাজকে বাসযোগ্য স্থিতিশীল রাখতে অপরাধ প্রতিবেদন (Crime Reporting) একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

তবে সাদামাটা রিপোর্ট এবং অপরাধবিষয়ক রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রায়োগিক পার্থক্য আছে। অপরাধ প্রতিবেদন রচনাকারীকে (Crime Reporter) যথেষ্ট সতর্ক ও কৌশলী হওয়ার প্রয়োজন আছে।

কারণ এক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে শুধু sympathy নয়, Empathy কৌশল কাজে লাগাতে হবে। অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদন করতে যথেষ্ট কৌশল অবলম্বন করতে না পারলে লক্ষ্যে পৌঁছানো বেশ কঠিন। এ ধরনের প্রতিবেদন তৈরিতে যেমন নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করতে হয়, তেমনি নীতিগত দিকও বিবেচনায় রাখতে হয়। মনে রাখা জরুরি, অপরাধ প্রতিবেদন গোয়েন্দা প্রতিবেদন নয়।

Crime Reporting-এ অপরাধের ধরন, পরিবেশ ও পরিস্থিতিগত কৌশল প্রণয়ন সাপেক্ষে নীতিগত দিক বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাংবাদিকতায় নীতি-নৈতিকতা ও কৌশলগত দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে Crime Reporting করা মোটেই সহজসাধ্য হবে না। সাংবাদিকতায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদনের মধ্যে অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ ও প্রচারের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রতিবন্ধকতাগুলো যে একেবারেই ভিন্নতর, সেটার বিবরণ পাওয়া যায় সাংবাদিকদের কাছে। গণমাধ্যমে অপরাধ নিয়ে কাজ করা বিশিষ্ট সাংবাদিকরা তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় সমাজে এ ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রতিবন্ধকতাগুলো তুলে ধরেন।

সমাজে অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা, প্রতিবেদন তৈরিতে প্রতিবন্ধকতা এবং তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাধাগুলোর বিষয়ে এনটিভির সাবেক নির্বাহী প্রযোজক মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, সমাজে নানা ধরনের ঘটনা ঘটে, যার মধ্যে ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ ঘটনাই অপরাধ সম্পর্কিত। এ ঘটনাগুলো সাধারণ মানুষের জানা দরকার দুটো কারণে– প্রথমত, সচেতন হওয়ার জন্য এবং দ্বিতীয়ত, যারা অপরাধ করে, তারা যে সমাজের ঘৃণ্য ব্যক্তি তা প্রকাশের জন্য।

অপরাধমূলক প্রতিবেদন করতে গেলে প্রথম হুমকি আসে নিজের জীবনের ওপর, দ্বিতীয় হুমকি আসে পরিবারের ওপর এবং তৃতীয় হুমকি আসে চাকরির ওপর। আর এই বিভিন্ন ধরনের হুমকি মোকাবিলা করাটাই চ্যালেঞ্জ।

তথ্য সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা নিয়ে তিনি বলেন, একটি ক্রাইম রিপোর্টের দুটো পক্ষ থাকে। ক্রাইম করা আর ক্রাইমের শিকার হওয়া। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্রাইমের শিকার হন সমাজের নিরীহ মানুষ। যারা ক্রাইম করেন, তারা অনেকক্ষেত্রেই সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি। এই প্রভাবশালী মানুষ তথ্য সংগ্রহে নানারকম বাধা সৃষ্টি করে। একধরনের বাধা হলো প্রভাববিস্তার করা বা ঘটানো (তথ্য না দিতে বলা হয়), আরেক ধরনের বাধা হলো টাকা। টাকা ছড়িয়ে তথ্য সংগ্রহে বাধা দেওয়া।

একই বিষয়ে অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ বর্ণনায় এটিএন বাংলার সিনিয়র সাংবাদিক মানস ঘোষ বলেন, নানা ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ঘটে সমাজে। সেসব ঘটনা নিয়ে থানা পুলিশ তদন্ত করে। তাদের বাইরে থেকে এর বিশ্লেষণ ও গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য পত্রিকা ও টিভির এত প্রচারণা। মানুষ ঘটনার প্রকৃত কারণ ও অনুসন্ধানমূলক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেখতে চায়। ঘটনার পেছনের কারণ জানার বিশাল চাহিদা রয়েছে পাঠক-দর্শক-শ্রোতার মাঝে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে গণমাধ্যমে অপরাধমূলক প্রতিবেদন প্রচারের গুরুত্ব অনেক বেশি।

সাংবাদিকতায় যত ধরনের রিপোর্টিং আছে, এর মধ্যে অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ বিট ক্রাইম বিট। এই ধরনের রিপোর্টিংয়ে সরাসরি ঘটনার ভেতরে ঢুকতে হয় রিপোর্টারকে। অপরাধীরা এটা ভালোভাবে নেয় না। প্রশাসনের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা কখনো কখনো পাওয়া যায় না। এতে অপরাধীরা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এ ধরনের নানাবিধ কারণে রিপোর্টারের জীবন বিপন্ন হওয়ায় আশঙ্কা তৈরি হয়। অপরাধের কারণ খুঁজতে গিয়ে ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হয় বলে অনেক সতর্ক থাকতে হয় এই বিটের রিপোর্টারদের।

অপরাধমূলক প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে তথ্য সংগৃহীত হয় সাধারণত (১) যিনি ঘটনায় শিকার, (২) যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, (৩) আত্মীয়স্বজনের অভিযোগ, (৪) প্রশাসনের অভিযোগ– এমন কিছু সূত্র থেকে। এসব জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে রিপোর্টারের বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এই বিভ্রান্তি অনেকক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে। এটাও অন্যতম কারণ। তিনি যেন বিভ্রান্তির মধ্যে না পড়েন। রিপোর্টার যদি ভিকটিমের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ঝুঁকে যায় তবে তথ্য সংগ্রহে পক্ষপাতমূলক হওয়ার ঝুঁকি থাকে। যিনি অভিযুক্ত বা অপরাধী, তারা যদি সমাজে ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রভাবশালী হয়, তখন হুমকির মধ্যে ফেলে দেয়। প্রশাসনের কাছ থেকে সঠিক তথ্য না পাওয়ার কারণে রিপোর্টার অসহায় হয়ে যান। প্রশাসন সঠিক তথ্য না দিলে রিপোর্ট বাধাগ্রস্ত হয়।

একই বিষয়ে জানতে চাওয়া হয় দীর্ঘদিন অপরাধবিষয়ক রিপোর্টিং নিয়ে কাজ করা সিনিয়র সাংবাদিক বদরুদ্দোজা বাবুর কাছে। তিনি তার বর্ণনায় বলেন, সমাজে কার দ্বারা কোথায় কখন কীভাবে ক্রাইম সংঘটিত হয়, হলো বা হচ্ছে, তা মানুষ জানলে সতর্ক হতে পারে। থানায় Pressure create হয়। যে রাস্তায় এই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে বা ক্রাইম হয়, সেই রাস্তায় লোকজন যেন সাবধানে চলাফেরা করতে পারে সেজন্য তথ্য জানা দরকার মানুষের।

অপরাধবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সাহায্য করা। এ ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে কর্তৃপক্ষ চাপ অনুভব (pressure fill) করে। একটি ঘটনা তিন মাসেও সুরাহা হচ্ছে না– এমন প্রতিবেদনে তারা চাপ অনুভব করে এবং একধরনের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ রাখে। এতে সমাজে অপরাধ বন্ধ এবং সার্বিকভাবে সমাজের উপকার হতে পারে।

অপরাধবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো, যারা অপরাধী তারা যে কোনো সময় আক্রমণ করতে পারে। আক্রমণের শিকার হওয়া একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। যারা আন্ডারগ্রাউন্ড জীবনযাপন করে, তারা ভালোমন্দ বিচার করতে পারে না। তাই রিপোর্টারকে সাবধানে কাজ করতে হয়।

অপরাধ প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, এ ধরনের রিপোর্টিংয়ে তথ্য খুব সহজে পাওয়া যায় না। যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তা বিশ্বাসযোগ্যভাবে পরিবেশনের জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। যেমন– একজন শীর্ষ সন্ত্রাসী কীভাবে শীর্ষ সন্ত্রাসী হলো, সেই তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে। এগুলো গল্পের ওপর নির্ভর করে। এই গল্পের ভিত্তিতে সঠিক তথ্য যাচাই করে বের করা কঠিন। যেমন– সরকারি কর্মকর্তারা তথ্য দেন না। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট জালিয়াতি হয়। এখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যথাযথ সহযোগিতা না পেলে কিছু করার থাকে না। তখন তথ্য সংগ্রহ কঠিন হয়ে পড়ে। তথ্য সংগ্রহ একটি আর্ট। অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদন তৈরিতে অপরাধবিষয়ক সাংবাদিককে ফলপ্রসূ যোগাযোগকারীর ভূমিকা পালনে সচেষ্ট থাকতে হয়। অর্থাৎ একজন অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদককে Effective communicator হতে হবে। অপরাধ প্রতিবেদকের কাজ শুরু হয় কোনো গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পরমুহূর্ত থেকে আর সংঘটিত অপরাধ থেকে মামলা বিচারের জন্য আদালতে না ওঠা অবধি তা অব্যাহত থাকে। এ ধরনের প্রতিবেদন নিয়ে কাজ করতে গেলে নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে এবং সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই এই ধরনের প্রতিবেদন লেখা চালিয়ে যেতে হবে।_

তথ্যসূত্র

১. ক্রাইম রিপোর্টিং, জওয়াদুর রহমান, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ঢাকা, মে ২০১৮
২. মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, সাবেক নির্বাহী প্রযোজক, এনটিভি, ঢাকা, বাংলাদেশ, ৬ জানুয়ারি, ২০২০
৩. বদরুদ্দোজা বাবু, হেড অব ইনভেস্টিগেশন, হেল্প ডেস্ক, এমআরডিআই, ঢাকা, বাংলাদেশ, ৬ জানুয়ারি, ২০২০
৪. মানস ঘোষ, সিনিয়র নিউজ এডিটর, এটিএন বাংলা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ৬ জানুয়ারি, ২০২০

লেখক: প্রশিক্ষক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

বাংলাদেশে গণমাধ্যম সাক্ষরতার সাম্প্রতিক চিত্র

সংকলন: * সৈয়দ কামরুল হাসান
**** উর্মিলা সরকার**

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশ বিদ্যালয়পড়ুয়া কিশোর-কিশোরী। বয়স ও বৈশিষ্ট্যের কারণে এই কিশোর-কিশোরীরা এদেশের গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত। এই তরুণ ছেলেমেয়েরা গুজব, ভুয়া সংবাদ, মিথ্যা সংবাদ, অসম্পূর্ণ সংবাদের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। কিন্তু প্রতিনিয়ত অনলাইন-জগতে অর্ধসত্য, মিথ্যা ও ভুয়া সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই এই সত্য ও ভুয়া সংবাদের পার্থক্য বুঝতে অক্ষম। এমনকি তারা সংবাদের সত্যতা এবং খবরের প্রকৃত উৎস পর্যন্ত যাচাই করতে পারে না। এই ধরনের ভুয়া সংবাদ বিশ্বাস করা এবং দৈনন্দিন জীবনে ছড়িয়ে পড়ার কারণে বিভিন্ন ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আইনি সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই এই সত্য ও ভুয়া সংবাদের পার্থক্য বুঝতে অক্ষম। এমনকি তারা সংবাদের সত্যতা এবং খবরের প্রকৃত উৎস পর্যন্ত যাচাই করতে পারে না

উপরিউক্ত বিষয় বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের গণমাধ্যমে অধিগম্যতা, গণমাধ্যম বিষয়ে জ্ঞান এবং গণমাধ্যম ব্যবহারের যে প্রান্তিক যোগ্যতা, তা যাচাই করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ওই গবেষণাটি চলতি বছরের এপ্রিল-জুন সময়ে সাউথ এশিয়া সেন্টার ফর মিডিয়া ইন ডেভেলপমেন্টের (সাকমিড) উদ্যোগে ফ্রি প্রেস আনলিমিটেডের আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত হয়। ২০১৮ সালে সাউথ এশিয়া সেন্টার ফর মিডিয়া ইন ডেভেলপমেন্ট প্রথমবারের মতো মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের গণমাধ্যম সাক্ষরতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে ঢাকা শহরে একটি ভিত্তি জরিপ (Baseline Survey) পরিচালনা করে। এরই ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় পর্যায়ে বৃহত্তর পরিসরে ২০১৯ সালে দেশের ৮টি

বিভাগের ২৪টি জেলার ২৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (১৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৮টি মাদ্‌রাসা) মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের গণমাধ্যম সাক্ষরতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে অপর একটি গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ের ২৪০০ জন শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষভাবে জরিপে অংশগ্রহণ করে। গবেষণায় প্রশ্নোত্তর ছাড়াও শিক্ষক ও অভিভাবকের সঙ্গে ৫টি দলীয় আলোচনা এবং ৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিস্তারিত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। যাঁদের মতামত ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে, তাঁরা হলেন– মোস্তাফা জব্বার, মন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়; ড. গোলাম রহমান, সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার-বাংলাদেশ; ইকবাল হোসেন, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, ইউনিসেফ; মো. মসিউজ্জামান, সদস্য, পাঠ্যক্রম, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড; শ্যামল দত্ত, সম্পাদক, দৈনিক ভোরের কাগজ।

উল্লিখিত সমীক্ষায় গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে ইউনেস্কোর তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত তাত্ত্বিক কাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ডকুমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। সমীক্ষা পরিচালনাকালীন কিছু পরিবর্তনশীল সূচকও বিবেচনা করা হয়েছে, যেমন– শহর/গ্রাম, নারী/পুরুষ এবং বিদ্যালয়/মাদ্‌রাসা এবং বিভিন্ন শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী।

উপরিউক্ত সমীক্ষার পটভূমি তুলে ধরতে গিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান গণমাধ্যম সাক্ষরতা এবং দক্ষিণ এশিয়ার গণমাধ্যম সাক্ষরতার চিত্র সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের দ্রুত প্রসারের ফলে আমরা দেখেছি যে দুই দশক ধরে বাংলাদেশে গণমাধ্যম বিশেষ করে ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যমের ব্যবহার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম বিশেষ করে ফেসবুক অত্যন্ত জনপ্রিয়। আজকাল তথ্য আদানপ্রদান, যোগাযোগ, শিক্ষা, বিনোদন, প্রায় সব ক্ষেত্রেই মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করছে। ফলে মানুষ প্রতিনিয়ত অসংখ্য তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করছে। কিন্তু এই বিশাল তথ্যভান্ডার থেকে মানুষ কোন তথ্যগুলো ব্যবহার করবে অথবা কোনগুলো বিশ্বাস করবে, তা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার মাধ্যমিক পর্যায়ের সব বিদ্যালয় ও মাদ্‌রাসার পাঠ্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নামে একটি বিষয় সংযোজন করে। এই গবেষণার মাধ্যমে জানার চেষ্টা করা হয়েছে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই তথ্য ও ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে সক্ষম কি না। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারা অথবা না পারা কোনোভাবে ডিজিটাল সাক্ষরতার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলছে কি না অথবা কতটুকু প্রভাব ফেলছে, তা চিহ্নিত করা।

প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় গণমাধ্যম সাক্ষরতাবিষয়ক কোনো আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম নেই বললেই চলে। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানেরও প্রায় একই অবস্থা। বাংলাদেশেও শুধু বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান সাকমিড ব্যতীত আর কোনো সংস্থা নেই যেটি শিক্ষার্থীদের গণমাধ্যম সাক্ষরতার বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা এবং এক্ষেত্রে করণীয় নির্ধারণে কাজ করার জন্য এগিয়ে এসেছে। কেবল ২০১৪ সালে সীমিতভাবে কিশোর-কিশোরীদের নিউজ লিটারেসি এবং শিশুবিষয়ক খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে নীতি-নৈতিকতার চর্চা বিষয়ের ওপর একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। এ ছাড়াও ইউনিসেফ বাংলাদেশ, গ্রামীণফোন ও টেলিনর গ্রুপের শিশুদের অনলাইন নিরাপত্তা বিষয়ে একটি কার্যক্রম বর্তমানে চালু আছে।

সাকমিড কর্তৃক পরিচালিত বর্তমান গবেষণায় প্রধান গবেষকের ভূমিকা পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আসাদুজ্জামান খান। সহযোগী গবেষকের ভূমিকায় ছিলেন সাকমিডের প্রকল্প ব্যবস্থাপক সৈয়দ কামরুল হাসান এবং সাকমিডের প্রকল্প সমন্বয়কারী আফিয়া সুলতানা। গবেষণাপত্রটি মূল্যায়ন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও বাংলাদেশ সরকারের সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার গোলাম রহমান এবং ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের (ইউল্যাব) যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. জুড উইলিয়ম হেনিলো। সাকমিডের উদ্যোগে গবেষণাকর্মটি বই আকারে মুদ্রিত হয়ে শীঘ্রই বাজারে আসছে। এই নিবন্ধে গবেষণায় প্রাপ্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল পাঠকসমীপে তুলে ধরা হলো।

প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় গণমাধ্যম সাক্ষরতাবিষয়ক কোনো আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম নেই বললেই চলে। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানেরও প্রায় একই অবস্থা

গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল

গণমাধ্যমে অভিগম্যতা

গণমাধ্যম সাক্ষরতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে পরিচালিত গবেষণায় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল পাওয়া গেছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বাড়িতে এবং বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমে প্রবেশ করার সুযোগ রয়েছে। গণমাধ্যমের মধ্যে রয়েছে– দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বই (পাঠ্যবইয়ের বাইরে), রেডিও, স্যাটেলাইট সংযোগসহ টেলিভিশন, স্যাটেলাইট সংযোগ ছাড়া টেলিভিশন, ব্যক্তিগত কম্পিউটার, মোবাইল ফোন (ইন্টারনেটসহ এবং ইন্টারনেট ছাড়া)।

গবেষণার উপাত্ত থেকে জানা যায়, ৯২ শতাংশ শিক্ষার্থীর বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের বই পড়ার সুযোগ রয়েছে, ৮৮.৪ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর স্যাটেলাইটসহ টিভি দেখার সুযোগ রয়েছে। এমনকি বাড়িতে ছেলেমেয়েদের মুঠোফোন ব্যবহার করারও সুযোগ আছে। মোট জরিপকৃত শিক্ষার্থীর মধ্যে ৮৫.৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর ইন্টারনেটসহ মোবাইল ফোন ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। (কিন্তু বিদ্যালয়ে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা আইনানুযায়ী নিষিদ্ধ হওয়ায় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে কি না– এমন কোনো প্রশ্ন তাদের করা হয়নি।)

গণমাধ্যমের ব্যবহার

বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যম ব্যবহারের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অনেক শিক্ষার্থীই সেই গণমাধ্যমটি ব্যবহার করছে না। যেমন– শতকরা ৪৪ ভাগ শিক্ষার্থীর পত্রিকা পড়ার সুযোগ থাকলেও তারা কেউই নিয়মিত পত্রিকা পড়ছে না। প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে দেখা যায়, ৮১ শতাংশ শিক্ষার্থী টেলিভিশন দেখে। এমনকি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ হলেও বেশকিছু ছাত্রছাত্রী বাসায় মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। গবেষণা থেকে আরও উঠে আসে, ২৬৬ জন শিক্ষার্থী ইন্টারনেটসহ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে।

বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যম ব্যবহারের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অনেক শিক্ষার্থীই সেই গণমাধ্যমটি ব্যবহার করছে না। যেমন– শতকরা ৪৪ ভাগ শিক্ষার্থীর পত্রিকা পড়ার সুযোগ থাকলেও তারা কেউই নিয়মিত পত্রিকা পড়ছে না

গণমাধ্যম ব্যবহারের তুলনামূলক চিত্রঃ নারী-পুরুষ/ বিদ্যালয়-মাদ্‌রাসা/শহর-গ্রাম

গণমাধ্যম ব্যবহারের ধরন ও ব্যবহারের সময়সীমা জানার জন্য নারী ও পুরুষ, বিদ্যালয়-মাদ্‌রাসা, শহর ও গ্রামের অবস্থান বিবেচনাপূর্বক একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ওই সমীক্ষায় দেখা যায়, মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীদের তুলনায় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পত্রিকা পড়ার দিক থেকে এগিয়ে আছে। ৫৮.৭ শতাংশ বিদ্যালয়পড়ুয়া ছেলেমেয়ে নিয়মিত বাড়িতে খবরের কাগজ পড়ে এবং ৪৯.৮ শতাংশ মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থী নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ে। ছাত্রছাত্রীদের একটি বড়ো অংশ বাসায় পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্যান্য বই নিয়মিত পড়ে, তাদের মধ্যে ৯২.২ শতাংশ শহরের ছেলেমেয়ে এবং ৯৩.৫ শতাংশ গ্রামের। ৮৭.১ শতাংশ বিদ্যালয়গামী কিশোর-কিশোরী এবং ৬৯.২ শতাংশ মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থী স্যাটেলাইট সংযোগসহ টেলিভিশন দেখে। সুতরাং বলা যায়, স্যাটেলাইটসহ টেলিভিশন ব্যবহারের দিক থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তুলনামূলকভাবে মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীদের চেয়ে এগিয়ে আছে। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে আরও দেখা যায়, ৫৯.২ শতাংশ বিদ্যালয়পড়ুয়া এবং ৬২.৩ শতাংশ মাদ্‌রাসায়পড়ুয়া শিক্ষার্থী রেডিও ব্যবহার করছে। উল্লেখ্য, ৬১.৪ শতাংশ শহরের শিক্ষার্থী এবং ৬১.৪ শতাংশ গ্রামের শিক্ষার্থী সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে।

কম্পিউটার ব্যবহারের তুলনামূলক চিত্র

শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার ব্যবহারের দিক থেকেও অনুরূপ ফলাফল পাওয়া যায়। ২৩.৩ শতাংশ মাদ্‌রাসার ছাত্রছাত্রী ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার ব্যবহার করে। একইভাবে ৩১.৮ শতাংশ বিদ্যালয়পড়ুয়া শিক্ষার্থী ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার ব্যবহার করে। ২২.৩ শতাংশ নারী শিক্ষার্থী এবং ৩৫ শতাংশ পুরুষ শিক্ষার্থী ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার ব্যবহার করে। এর থেকে অনুমেয় যে, নারী শিক্ষার্থীদের তুলনায় পুরুষ শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার ব্যবহারে এগিয়ে আছে। এমনকি ইন্টারনেট ছাড়া কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ৩২.৮ শতাংশ ছাত্র এবং ২১.৫ শতাংশ ছাত্রী ইন্টারনেট ছাড়া কম্পিউটার ব্যবহার করে। কারণ হিসেবে বলা যায়, মেয়ে শিক্ষার্থীদেরকে সাধারণত তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে খুব বেশি উৎসাহ দেওয়া হয় না। একই সঙ্গে গবেষণার ফলাফলে পাওয়া যায়, ২২.৭ শতাংশ গ্রামের ছেলেমেয়ে ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার ব্যবহার করে। অন্যদিকে, ৩২ শতাংশ শহরের ছেলেমেয়ে ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার ব্যবহার করে। কারণ গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহর অঞ্চলে কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের বিস্তৃতি বেশি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা

গবেষণা থেকে আরও বেরিয়ে আসে, ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমকে তথ্য গ্রহণ এবং শিক্ষণীয় বিষয়ের উৎস হিসেবে বিবেচনা করে। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোর সুবিধা কী জানতে চাইলে বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই এর উত্তরে বলে, খুব সহজেই তথ্য ও খবরাখবর পাওয়া যায়। ৮৬.৬ শতাংশ শিক্ষার্থী মনে করে, তথ্য পাওয়াই হলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সবচেয়ে বড়ো সুবিধা। এ ছাড়াও তাদের মতে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর অন্য সুবিধাগুলো হলো– পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ, শিক্ষা ও বিনোদনের উৎস, নিজের মতামত প্রকাশ করা এবং নিজেকে আপডেট রাখা। সুবিধার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বেশকিছু অসুবিধাও রয়েছে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৭৪.৩ শতাংশ শিক্ষার্থী সামাজিক

যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করার কারণে পড়াশোনার ক্ষতি হয় বলে উল্লেখ করে এবং ৬৮ শতাংশ শিক্ষার্থী এটিকে একটি আসক্তি হিসেবে বিবেচনা করে। এমনকি শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনার সময়ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পড়াশোনায় বিশেষ ক্ষতি করছে বলে তারা জানিয়েছেন। শহরের বেশকিছু বিদ্যালয়ের শিক্ষকও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গেমসের প্রতি ছেলেমেয়েদের আসক্তির কথা উল্লেখ করেন। প্রায় সময়ই ছাত্রছাত্রীরা শ্রেণিকক্ষে নিদ্রাচ্ছন্ন এবং ক্লান্ত থাকে। ৬০.৩ শতাংশ ছাত্রছাত্রী মনে করে, ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ভুয়া সংবাদের মাধ্যমে আমরা অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছি। এ ছাড়াও ফেসবুকের বেশকিছু নেতিবাচক দিক শিক্ষার্থীরা উল্লেখ করে, যেমন– অ্যাকাউন্ট হ্যাক হওয়া, কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনার শিকার হওয়া, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যঝুঁকি ইত্যাদি।

গণমাধ্যম ব্যবহারের দক্ষতা

গবেষণায় দেখা যায়, মাত্র ১২.৭ শতাংশ শিক্ষার্থী নতুন কোনো জায়গা খুঁজে বের করার জন্য প্রায়ই গুগল ম্যাপ ব্যবহার করে। অধিকাংশ শিক্ষার্থী বলে, পড়াশোনা ও স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়, কম্পিউটার ও মোবাইল ফোনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করার জন্য তারা ইন্টারনেটের সহযোগিতা নিয়ে থাকে। জরিপকৃত শিক্ষার্থীর ৭০.৩ শতাংশ দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকে। অন্যদিকে, ২৯.৭ শতাংশ শিক্ষার্থী কখনোই কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করে না। ৭১.৪ শতাংশ শিক্ষার্থী ফটোশপ অথবা বিভিন্ন অ্যাপ ব্যবহার করে ছবি এডিট করতে পারে। ৬৮.৪ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর কম্পিউটার ব্যবহারের দক্ষতা রয়েছে। অপরপক্ষে, ৩১.৭ শতাংশ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীর কম্পিউটার অপারেট করার মতো কোনো দক্ষতা নেই।

সাইবার-জগতে হয়রানির শিকার

গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, ৩৮.৪ শতাংশ শিক্ষার্থী জানায়, তারা কোনোদিনই সাইবার-জগতে কোনোরূপ হয়রানির শিকার হননি। অন্যদিকে, ২৪.৫ শতাংশ শিক্ষার্থী সাইবার-জগতে হয়রানির শিকার হওয়ার কথা উল্লেখ করেছে এবং বিষয়টি তারা মা-বাবার সঙ্গে শেয়ারও করেছে। জরিপে অংশগ্রহণকারী মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৮.৩ শতাংশ জানায়, অনলাইনে কোনো হয়রানির শিকার হলে ৯৯৯ নম্বরে কল দিয়ে জানানোর বিষয়টি সম্পর্কে তারা অবগত আছে। এ ছাড়াও ২৬.১ শতাংশ ছেলেমেয়ে মনে করে, অনলাইনে হয়রানির শিকার হলে বিষয়টি মা-বাবার সঙ্গে শেয়ার করা উচিত। মাত্র ৭ শতাংশ ছেলেমেয়ে জানায়, অনলাইন হয়রানির বিষয়টি পুলিশকে জানানো উচিত। কিন্তু ২৬.৮ শতাংশ ছাত্রছাত্রী জানায়, অনলাইনে হয়রানির শিকার হলে কী করতে হবে– এ বিষয়ে তারা কিছুই জানে না।

আইসিটি আইন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা

গণমাধ্যম সাক্ষরতার একটি প্রধান নির্ধারক হলো তথ্যপ্রযুক্তি আইন এবং গণমাধ্যমবিষয়ক আইন সংক্রান্ত জ্ঞান। এ গবেষণার মাধ্যমে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা তথ্যপ্রযুক্তি আইন, মানহানি আইন ও তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবগত কি না, জানার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা তথ্যপ্রযুক্তি আইন জানে কি না– এমন প্রশ্নের উত্তরে ৮৪৮ জন (২৪০০ জনের মধ্যে) শিক্ষার্থী জানে না বলে উল্লেখ করে। ৬২৩ জন জানায়, তারা শুধু ওই আইনের নাম শুনেছে। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে আরও জানা যায়, ৫০১ জন শিক্ষার্থী তথ্যপ্রযুক্তি আইনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত আছে এবং ৩১৬ জন শিক্ষার্থী ওই আইনের প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে জানে। শুধু এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী সাইবার হয়রানির শিকার হলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে বলে জানায়।

শিক্ষক ও অভিভাবকদের দৃষ্টিতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও গণমাধ্যম সাক্ষরতা: কতিপয় সুপারিশ

গবেষণার অংশ হিসেবে জরিপকৃত শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ও শিক্ষকদের ওপর ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ে মতামত গ্রহণের জন্য কয়েকটি দলীয় আলোচনা পরিচালনা করা হয়। দলীয় আলোচনা থেকে জানা যায়, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য সব বয়সের শিক্ষার্থীদের কাছে যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম, যেমন– মুঠোফোন, ফেসবুক, ইমো খুব সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। যদিও বেশির ভাগ শিক্ষার্থী যোগাযোগের জন্য তাদের অভিভাবকদের মুঠোফোন ব্যবহার করে থাকে। খুব অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর নিজস্ব মুঠোফোন আছে। তারপরও সামজিক যোগোযোগের বিভিন্ন মাধ্যম– ফেসবুক, টুইটার, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারে শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট সক্রিয়। এ বিষয়ে অভিভাবক ও শিক্ষক উভয়েই জানান, প্রযুক্তির অসংখ্য ইতিবাচক দিক থাকলেও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক দিকও রয়েছে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে প্রযুক্তির ইতিবাচক দিকগুলো কাজে লাগিয়ে উপকৃত হচ্ছে। এমনকি তারা পাঠসংশ্লিষ্ট অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করা, ইলেকট্রনিক ডিকশনারি ব্যবহার এবং বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারছে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে। সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়াভিত্তিক শ্রেণিকক্ষেও তারা অংশগ্রহণ করছে। ইন্টারনেটের বহুমুখী ব্যবহারে প্রাত্যহিক জীবন সহজ থেকে সহজতর হয়ে উঠছে। আবার একই সঙ্গে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির কারণও হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ইন্টারনেটে মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি, ইন্টারেনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন হয়রানির শিকার হওয়া, যেমন– ছবি এডিট করে বিভ্রান্তি তৈরি করা, দীর্ঘ সময় বন্ধুদের সঙ্গে চ্যাট, ফেসবুকিং করা, যার ফলে লেখাপড়ায় অমনোযোগিতা, যৌন উসকানিমূলক ভিডিও দেখা, যা নীতি-নৈতিকতার পরিপন্থি, মিথ্যা কথা বলা, মানসিক অস্থিরতা ইত্যাদি। উল্লিখিত নেতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মকে সচেতন করে তুলতে হবে। এই বিষয়ে শিক্ষক ও অভিভাবককে একযোগে কাজ করতে হবে। প্রত্যেককেই নিজ নিজ জায়গা থেকে দায়িত্বশীল অচরণ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের সচেতন করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নেওয়া যেতে পারে বলে মনে করেন অভিভাবক ও শিক্ষকরা।

* পাঠ্যসূচিতে তথ্যপ্রযুক্তি সঠিকভাবে ব্যবহারের নির্দেশনা সংবলিত অধ্যায় সংযোজন করতে হবে।
* শিক্ষকদের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের যথাযথ দিকনির্দেশনা দিতে হবে।
* শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে ধারণাপ্রদায়ী ওয়ার্কশপ, সেমিনার, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। উপর্যুক্ত কার্যক্রমে এলাকার স্থানীয় প্রশাসন, ধর্মীয় নেতা, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের যুক্ত করতে হবে।
* সপ্তাহে একদিন অ্যাসেম্বলিতে সাইবার-জগতে সচেতন থাকার উপায়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
* বিদ্যালয়ের অভিভাবক সমাবেশের সময় গণমাধ্যম সাক্ষরতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে হবে।
* বিদ্যালয়ের পাশাপাশি ইউনিয়ন পর্যায়ে গণমাধ্যম সাক্ষরতা ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
* প্রতি সপ্তাহে তথ্যপ্রযুক্তির ওপর একটি করে ব্যবহারিক ক্লাস পরিচালনা করা যেতে পারে।
* সরকার পর্নোগ্রাফির বিভিন্ন সাইটগুলো বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

মূল গবেষণাপত্র থেকে সংকলিত
লেখক: * উপপরিচালক (সাকমিড)
**** প্রোগ্রাম অফিসার (সাকমিড)**

সামরিক বাহিনী ও গণমাধ্যম

নূর ইসলাম হাবিব

গণমাধ্যম সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গণমাধ্যম কোনো বিষয়ে ব্যক্তি, গ্রুপ এমনকি নীতিনির্ধারকদেরও প্রভাবিত করতে পারে। জনমত গঠনে গণমাধ্যমের রয়েছে বিরাট ভূমিকা। সরকারের সফল কাজের পক্ষে এবং জনগণের কল্যাণ ব্যাহত হয়– এমন কাজের বিপক্ষে জনমত গড়ে তোলে গণমাধ্যম। কোনো সামাজিক ইস্যু কিংবা রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জাতীয় উন্নয়নে অগ্রাধিকার, জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ, জাতীয় সমস্যা চিহ্নিতকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও গণমাধ্যম ভূমিকা রাখে।

গণমাধ্যম সমাজে 'ওয়াচডগ'-এর ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যম সেসব ব্যক্তির ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করে, যাদের ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থান জনগণকে প্রভাবিত করে। গণমাধ্যমকে কাজ করতে হয় নানাবিধ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপের মধ্যে। গণমাধ্যম প্রায়ই বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছ থেকে ভয়ভীতি ও হুমকির সম্মুখীন হয়। তারপরও গণমাধ্যম সত্যের সন্ধান করে, সত্য তুলে ধরে, সমাজের অসংগতি তুলে আনে। সত্য যত কঠিনই হোক, সেখানে আপসহীন গণমাধ্যম। কখনো কখনো জীবন বিপন্ন করেও গণমাধ্যমকর্মী সত্য প্রকাশ করে। গণমাধ্যমকর্মী সত্যানুসন্ধান করতে গিয়ে পেশাগত মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। যেমন– বস্তুনিষ্ঠতা, পক্ষপাতহীনতা, সঠিকতা ইত্যাদি। সাংবাদিকতা প্রকৃতিগতভাবেই অনুসন্ধিৎসু হয়ে থাকে। গণমাধ্যম সর্বত্র তার গ্রহণযোগ্যতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ধরে রাখতে চেষ্টা করে। জাতীয় সংকটকালে

সত্য যত কঠিনই হোক, সেখানে আপসহীন গণমাধ্যম। কখনো কখনো জীবন বিপন্ন করেও গণমাধ্যমকর্মী সত্য প্রকাশ করে। গণমাধ্যমকর্মী সত্যানুসন্ধান করতে গিয়ে পেশাগত মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন

জনগণের পাশে দাঁড়ায় গণমাধ্যম। অত্যাচারিত, নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর হয়ে কথা বলে গণমাধ্যম। Media provide voice to the voiceless. দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, অপরাধকর্ম, মানবাধিকার লঙ্ঘন, নারী ও শিশু নির্যাতন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় গণমাধ্যম।

গণতান্ত্রিক পশ্চিমা বিশ্বে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত। বাংলাদেশেও বাক্‌স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংবিধানে নিশ্চিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন পাস করা হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমান গণতান্ত্রিক পরিবেশে গণমাধ্যম ব্যাপক স্বাধীনতা ভোগ করছে। এখানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অবারিত।

যুদ্ধকালে গণমাধ্যমের ভূমিকা সব সময়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান যুগে এর গুরুত্ব আরও বেড়েছে। বর্তমান সময়ে যুদ্ধ কেবল সামরিক বাহিনীর একার পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে জড়িত থাকে বহু পক্ষ। যুদ্ধকালে গণমাধ্যমের থাকে বিরাট ভূমিকা এমনকি সৈন্যদের মনোবলের ওপর প্রভাব ফেলে গণমাধ্যম। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ সৈন্যদের মনোবল ভেঙে দিতে পারে। আবার শত্রুপক্ষের ওপর সফল আক্রমণের খবর সৈন্যদের মনোবল চাঙা করে এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা জোগায়।

স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল ও তথ্যপ্রযুক্তির আবিষ্কার গণমাধ্যমের প্রভাব ও বিস্তারকে প্রসারিত করেছে। ফলে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রক্রিয়ার বাইরে থাকতে পারে না। সামরিক বাহিনী গণমাধ্যমের প্রভাবের বাইরে নয়।

বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী দেশে-বিদেশে তাদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য সুনাম অর্জন করেছে। বিশেষ করে বিশ্বশান্তি রক্ষায় বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী জাতীয় উন্নয়ন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাস দমন, অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা এবং বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় কাজ করে আসছে।

গণমাধ্যমকর্মীরা প্রায়ই বলে থাকেন, গণমাধ্যমের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর একটা দূরত্ব রয়েছে (Communication gap)। কোনো ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলে তাৎক্ষণিকভাবে সামরিক বাহিনীর মতামত পাওয়া যায় না বলে তাদের অভিযোগ আছে। যখন সামরিক বাহিনী সম্পর্কে সংবাদ লেখা হয়, তখন তথ্যপ্রাপ্তিতে সমস্যা হয়। সংশ্লিষ্ট কোনো কর্মকর্তাকেও পাওয়া যায় না। সামরিক কর্তৃপক্ষ জাতীয় নিরাপত্তা ও 'অফিসিয়াল সিকরেট অ্যাক্ট'-এর নামে তথ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে। তাদের আরও অভিযোগ– সামরিক বাহিনীর সদস্যরা গণমাধ্যমের প্রতি বন্ধুবৎসল নয় (Not media friendly)।

গণমাধ্যম সম্পর্কে সামরিক বাহিনীরও বিশেষ কিছু পর্যবেক্ষণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো অপারেশনাল চাহিদা এবং সামরিক সংগঠন সম্পর্কে গণমাধ্যমকর্মীদের জ্ঞানের স্বল্পতা। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের অধীনে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী যে প্রশংসনীয়

যুদ্ধকালে গণমাধ্যমের ভূমিকা সব সময়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান যুগে এর গুরুত্ব আরও বেড়েছে। বর্তমান সময়ে যুদ্ধ কেবল সামরিক বাহিনীর একার পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে জড়িত থাকে বহু পক্ষ

দ্বারা মিডিয়া ম্যানিপুলেশনের সুযোগও বেড়েছে। ইরাক যুদ্ধে সাংবাদিকতায় এক নতুন ধারণার উদ্ভব হয়, সেটা হলো এমবেডেড জার্নালিজম। ইরাক যুদ্ধে গণমাধ্যম অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রসারের ফলে দর্শকশ্রোতা, পাঠক মনে করতে পারে তাদের তথ্য জানার সুযোগ বেড়েছে এবং সত্য জানার অধিকারও নিশ্চিত হয়েছে। আসলে বিষয়টি সবক্ষেত্রে তা নয়, গণমাধ্যম কখনো কখনো ব্যবহৃত হচ্ছে সত্য লুকাতে এবং জনমত বিভ্রান্ত করতে। বিশেষ করে যুদ্ধকালে এবং দেশে ও আন্তর্জাতিকভাবে যুদ্ধ জয়ের উদ্দেশ্যে।

সশস্ত্রবাহিনীর সঙ্গে গণমাধ্যমের সম্পর্ক খুবই স্পর্শকাতর। কেননা উভয়েরই রয়েছে সমাজ ও রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা। সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রতিষ্ঠান। অপরদিকে গণমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। জাতীয় নিরাপত্তা বিধানে সামরিক বাহিনী ও গণমাধ্যম যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রেখে চলেছে। গণমাধ্যম জনগণ ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ তৈরিতে সাহায্য করে। সমাজের অন্যান্য উপাদানকে একই মঞ্চে নিয়ে আসে। সামরিক বাহিনীও সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে এ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে, সেসব বিষয়ে গণমাধ্যমের ধারণা পর্যাপ্ত নয়। তারা মনে করে, গণমাধ্যম তুলনামূলকভাবে কম বস্তুনিষ্ঠ। গণমাধ্যম পক্ষপাতমূলক, একপেশে, বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ পরিবেশন করে। গণমাধ্যম সব সময় ব্যর্থতাকে গুরুত্ব দেয়, সাফল্যকে নয় এবং অপ্রচলিত ও অস্বাভাবিক ঘটনাকে ফলাও করে প্রচার করে। সামরিক বাহিনীর অভাব-অভিযোগও গণমাধ্যমে অনুপস্থিত।

বলা হয়, গণমাধ্যম সাধারণত প্রতিরক্ষা বাজেট, প্রতিরক্ষা ক্রয়, বড়ো ধরনের কোনো ব্যর্থতা, শৃঙ্খলা ভঙ্গ, মানবাধিকার লঙ্ঘন, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, অন্য দেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি, গুরুত্বপূর্ণ পদোন্নতি, নিয়োগ, অবসর, অসদাচরণ ও সেনানিবাস সম্প্রসারণ বিষয়ে প্রচার/প্রকাশে আগ্রহী। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদেশি সামরিক প্রতিনিধির সফর, যৌথ মহড়া/অনুশীলন, সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর বার্ষিক মহড়া, শান্তিরক্ষা মিশন ইত্যাদি বিষয়েও আগ্রহী। তাছাড়া জাতি গঠনে এবং উন্নয়নমূলক কাজে সামরিক বাহিনীর অংশগ্রহণ, সন্ত্রাস দমন ও বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সশস্ত্রবাহিনীতে নারীদের যোগদান ইত্যাদি বিষয়েও গণমাধ্যম সংবাদ/ফিচার প্রকাশ করে থাকে।

গণমাধ্যম থেকে কোনো প্রতিষ্ঠান নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে না। তাই ক্রম অগ্রসরমান ও প্রভাববিস্তারী গণমাধ্যমের গুরুত্ব অনুধাবন করে সামরিক বাহিনীকে গণমাধ্যম নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। সামরিক বাহিনীকে আয়ত্ত করতে হবে তাদের সাফল্যগাথা, সাহস ও বীরত্বগাথা মিডিয়াকে বলার কৌশল। গণমাধ্যমকর্মীদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে কম্ব্যাট ইউনিটে, অনুশীলন এলাকায় ও সেনানিবাসের বিভিন্ন স্থাপনায়। যথাসময়ে গণমাধ্যমকে তথ্য সরবরাহ ও তথ্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন সম্ভব। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দিতে হবে।

প্রতিরক্ষা বাজেট, প্রতিরক্ষা ক্রয়, অন্যদেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে মিডিয়া ব্রিফিং গণমাধ্যমকর্মীরা স্বাগত জানায়। প্রতিরক্ষা বিষয়ে যেমন– সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই, জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় গণমাধ্যম ও সামরিক বাহিনীর ভূমিকা, সামরিক কূটনীতি বিষয়ে মাঝেমধ্যে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম করা যেতে পারে। প্রতিরক্ষা তথ্য প্রচারের মাধ্যমে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সশস্ত্রবাহিনীর সক্ষমতা বিষয়ে জনগণের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস তৈরি করা যায়। প্রতিরক্ষা তথ্য প্রচারে সম্প্রতি গঠিত Defence Journalist Association of Bangladesh সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

নিয়মিত যোগাযোগ গণমাধ্যমের সঙ্গে আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করে। গণমাধ্যমকর্মীর ওপর বিশ্বাস স্থাপন ভালো ফল বয়ে আনে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় গণমাধ্যমের প্রভাব বিবেচনায় রাখা যেতে পারে। যথাযথ সমালোচনা বিবেচনায় নিয়ে ভবিষ্যৎ ভুল থেকে বিরত থাকা যেতে পারে। গণমাধ্যম সব সময়ই দ্রুত তথ্য যাচাই চায়। কেননা তারা কাজ করে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে। তাছাড়া রয়েছে গণমাধ্যমের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা। অনলাইন নিউজ পোর্টাল বা পত্রপত্রিকার অনলাইন সংস্করণের চাহিদা আরও তাৎক্ষণিক। এজন্য যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ের মধ্যে মিডিয়াকে তথ্য দিতে হবে। মিডিয়ার সঙ্গে কোনো ইস্যুতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে কথা বলার অনুমতি দিতে হবে। নীরব থাকলে তার ফল সব সময় খারাপ হয়। গণমাধ্যমের গঠনমূলক সমালোচনা ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করলে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। মানবাধিকার বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। মানবাধিকার বিষয়ে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। সামরিক বাহিনীর সদস্যদের গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) একমাত্র সংস্থা হিসেবে সামরিক বাহিনী ও গণমাধ্যমের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নে সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর পক্ষে প্রতিরক্ষা তথ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে আইএসপিআর। গণমাধ্যম ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে সেতুবন্ধের দায়িত্ব পালন করে আইএসপিআর। গণমাধ্যম ও সশস্ত্রবাহিনী উভয়ই আইএসপিআরের কাছ থেকে সহায়তা নিতে পারে তাদের মধ্যকার দূরত্ব হ্রাস করতে, পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে, ভুল বোঝাবুঝি দূর করে সমঝোতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে আইএসপিআরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিশ্বাস, আস্থা এবং সৌহার্দপূর্ণ মিডিয়া-মিলিটারি সম্পর্ক গঠনে আইএসপিআর নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। যদিও এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে প্রতিরক্ষা গণমাধ্যম নীতিমালা নেই এবং সামরিক বাহিনী ও গণমাধ্যমকর্মীদের প্রশিক্ষণের সুবিধাও নেই। তারপরও বর্তমানে বাংলাদেশে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে গণমাধ্যমের সম্পর্ক খুবই ভালো।

সব শেষে বলা যায়, সামরিক বাহিনী অনেক ভালো কাজ করছে জনকল্যাণে, যা গণমাধ্যমের সাহায্যে প্রচারের প্রয়োজন রয়েছে। সশস্ত্রবাহিনী জনগণের প্রতিষ্ঠান। জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সশস্ত্রবাহিনী অতন্দ্রপ্রহরীর কাজ করে। এ কাজটি সফলভাবে করার জন্য জনগণের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করতে হবে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের সহায়তা প্রয়োজন। গণমাধ্যমেরও প্রতিরক্ষা তথ্য প্রয়োজন, প্রতিরক্ষা তথ্যের সঠিকতা যাচাই প্রয়োজন। তাছাড়া যুদ্ধ ও সংঘর্ষ চলাকালে তাদের প্রয়োজন নিরাপত্তা ও সামরিক বাহিনীর সহায়তা। এজন্যই সামরিক বাহিনী ও গণমাধ্যমের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ সম্পর্ক খুব প্রয়োজন। কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ সম্পর্ক অব্যাহত রাখতে হবে পারস্পরিক স্বার্থে।

লেখক: সহকারী পরিচালক, আইএসপিআর

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

মোবাইল সাংবাদিকতা কেন, কীভাবে

নাসিমূল আহসান

মোবাইল ও সাংবাদিকতা

তথ্যপ্রযুক্তি বদলে দিচ্ছে সব। খুব সকালে গরম চায়ের কাপের সঙ্গে পত্রিকা পড়ার গল্পটা সেকেলে হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। নিউমিডিয়া আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পালটে দিচ্ছে মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রির প্রচলিত পাঠক-মালিক-সাংবাদিক সম্পর্কের ধারণা। সংবাদ তৈরি আর বিতরণে মিডিয়া কোম্পানিকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

গণমাধ্যম। সাংবাদিকতার প্রচলিত আদল ভেঙে আমরা ঢুকে পড়েছি নাগরিক সাংবাদিকতার যুগে। কোনো এক নাগরিক সাংবাদিকের মুঠোফোনে তোলা ভিডিওচিত্র নিয়ে হইচই পড়ে যাচ্ছে পৃথিবীজুড়ে। ফেসবুকের একটি স্ট্যাটাস হয়ে উঠছে সংবাদপত্রের লিডস্টোরি। বিখ্যাত পরিসংখ্যানবিষয়ক প্রতিষ্ঠান স্ট্যাটিস্টা জানাচ্ছে, ৩.৩ বিলিয়ন মানুষ স্মার্টফোন ব্যবহার করেন, যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪২.৬৩ শতাংশ।

সাংবাদিকতার প্রচলিত আদল ভেঙে আমরা ঢুকে পড়েছি নাগরিক সাংবাদিকতার যুগে। কোনো এক নাগরিক সাংবাদিকের মুঠোফোনে তোলা ভিডিওচিত্র নিয়ে হইচই পড়ে যাচ্ছে পৃথিবীজুড়ে

করপোরেট কনগ্লুমারেট জার্নালিজমকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাজারে এসেছে উদ্যোক্তা সাংবাদিকতার ধারণা। সাংবাদিকতা শিল্পে আগ্রহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান অল্প পুঁজিতে তৈরি করছে অনলাইন পত্রিকা। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে বৈশ্বিক তথ্যগ্রামে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন হ্যাঁ, আর এই স্মার্টফোন ইউজাররাই হয়ে উঠছেন নতুন যুগের সাংবাদিক। কনটেন্ট নির্মাতা। যাদেরকে ২০১৫ সাল থেকে 'মোজো' নামে অভিহিত করে পোর্ট মেয়ারস নিউজ প্রেস নামের গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান। সাধারণত স্মার্টফোন বা ট্যাবলেট পিসির মতো ইলেকট্রনিকস

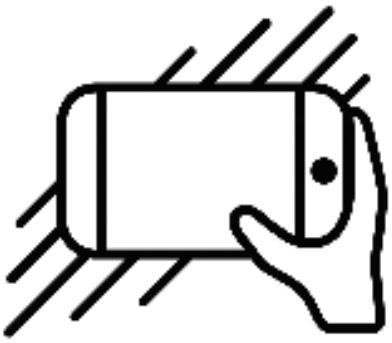

প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংবাদ সংগ্রহ, সম্পাদনা ও প্রচারের কাজ করাকেই আমরা মোবাইল সাংবাদিকতা হিসেবে অভিহিত করছি। নিকোলে মালায়ারভ বিখ্যাত অনলাইন পত্রিকা 'মিডিয়াম'-এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে জানান, ২০২০ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপী মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা গিয়ে ঠেকবে ৫.৫ বিলিয়নে। আর এই জনগোষ্ঠীর প্রায় বেশির ভাগ সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকবেন দিনের অনেকটা সময়। মূলত এরাই নির্ধারণ করে দিচ্ছেন সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ। কনটেন্ট নির্মাতা হিসেবে যেমন, কনজিউমার হিসেবেও তেমন। আর এ কারণেই মোবাইল সাংবাদিকতা নিয়ে সারা পৃথিবীতে নতুন করে ভাববার, কাজ করার পরিসর তৈরি হয়েছে। এই প্রবন্ধে আমরা বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে মোবাইল সাংবাদিকতার নানা দিক নিয়ে কথা তুলতে চাই। পাশাপাশি একজন নাগরিক সাংবাদিক কিংবা গণমাধ্যম শিক্ষার্থী বা কর্মী হিসেবে আপনি কীভাবে মোবাইল সাংবাদিক হিসেবে বেড়ে উঠতে পারবেন, এ ব্যাপারে প্রাথমিক আলোচনাও এগিয়ে নিতে চাই।

মূলত সারা পৃথিবীতেই মোবাইল প্রযুক্তিনির্ভর সাংবাদিকতার চর্চা একই সঙ্গে নাগরিক সাংবাদিকতা ও প্রচলিত গণমাধ্যমের সাংবাদিকতার চর্চার জায়গায় বড়োসড়ো পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। সেটা যেমন কনটেন্ট তৈরি ও পরিবেশনে, তেমনি আয়োজনে। মোবাইলের মাধ্যমে একজন সাধারণ নাগরিক বহনযোগ্য ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার করে এবং ইন্টারনেটের সহায়তায় সংবাদ তৈরি ও সম্পাদনা করে নিজের কমিউনিটিতে যেমন দ্রুত একটি ঘটনা বা সংবাদকে পৌঁছে দিতে পারছেন, তেমনি একজন মূলধারার গণমাধ্যমকর্মী মোবাইল প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে মফস্বলে বসে সংবাদ ঘটনার সরাসরি সম্প্রচার, জরুরি ছবি ও ফুটেজ পাঠাতে পারছেন কম খরচে। মোবাইল সাংবাদিক যে কেবল মোবাইল ব্যবহার করেই সাংবাদিকতা করবেন, এমনটা মোটেই নয়। অনেক সাংবাদিক স্মার্টফোন ব্যবহারের পাশাপাশি ডিএসএলআর ব্যবহার করছেন, তবে স্মার্টফোনকেই মোবাইল সাংবাদিকতার প্রাণ হিসেবে বিবেচনা করছেন বোদ্ধারা, যার মাধ্যমে রেডিও, পডকাস্ট থেকে শুরু করে টেলিভিশন, তথ্যচিত্র ও সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য ভিডিও তৈরি হয়ে থাকে।

আয়ারল্যান্ডের আরটিই নেটওয়ার্কের ইনোভেশনস প্রধান গ্লেন মালক্যাহি স্মার্টফোন ব্যবহার করে ভিডিওধারণ, সম্পাদনা, লেখা এবং প্রকাশ করার প্রক্রিয়াকে মোজোর 'শুদ্ধতম ধারণা' হিসেবে অ্যাখ্যা দেন। তার মতে, মোবাইল সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে এমনভাবে ক্ষমতায়িত করা, যাতে সাধারণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তিনি সম্ভাব্য সবচেয়ে ভালো ভিডিও স্টোরি তৈরি করতে পারেন। অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক সাংবাদিক, লেখক এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত টেলিভিশন প্রোডিউসার ইভো বুরামের মতে, মোজো হচ্ছে দক্ষ ডিজিটাল স্টোরিটেলিং এবং টুলসের এমন সমন্বয়, যা প্রাথমিক ইউজার জেনারেটেড কনটেন্ট (ইউজিসি) থেকে একটি পরিপূর্ণ ইউজার জেনারেটেড স্টোরির (ইউজিএস) জন্ম দেয়।

কেন মোবাইল সাংবাদিকতা

ভিডিও জার্নালিজম, রেডিও সাংবাদিকতা, ফটোগ্রাফি, তথ্যচিত্র তৈরি, ইনফোগ্রাফিক্স তৈরি, নিউজ লেখা, ই-মেইল করা, যার যার প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সার্ভারে সম্পাদিত ফুটেজ আপলোড করা কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ায় কনটেন্ট বা নিউজ শেয়ার করা– যাবতীয় কাজ করা যায় এই স্মার্টফোনে। এসব কারণেই দিনকে দিন মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে জনপ্রিয় হচ্ছে স্মার্টফোনের চর্চা।

বাংলাদেশের দিকে তাকান। একজন ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট যখন একটি সংবাদ কাভার করতে বের হন, সে এক মহা আয়োজন। বিশাল ক্যামেরা, তার সঙ্গে এক বা একাধিক ক্যামেরা পারসন, ভারী ট্রাইপড, একগাদা তার, সাউন্ড ডিভাইস, বুম আর সঙ্গে গাড়ি তো আছেই। কিন্তু এই জায়গাটা একটু একটু করে ভেঙে দেবে মোবাইল সাংবাদিকতা। মোবিলিটির প্রশ্ন আছে, আছে অ্যাফোর্ডেবিলিটির প্রশ্ন। দ্রুত, তাৎক্ষণিক, ব্রেকিং নিউজ করার জন্য এখন বিশ্বজুড়ে মোবাইলকেই সবচেয়ে ভালো টুলস হিসেবে বিবেচনা করছে নিউজরুম। পাশাপাশি সাংবাদিকতায় মোবাইলসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক টুলসের সহজ বহনযোগ্যতা মোবাইল সাংবাদিকতাকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলছে। এছাড়া খুব ভারী ও বড়ো রিপোর্টিং টুলসের (ক্যামেরা) তুলনায় মোবাইল ভিড়ের মধ্যে সাংবাদিকের ঝুঁকি যেমন কমায়, তেমনি ভিড়ের মধ্যে খুব কাছ থেকে ফুটেজ সংগ্রহ করার সুযোগ করে দেয়। আমাদের চ্যানেলগুলো এখনো যেখানে HD ফুটেজ ব্যবহার করছে বড়ো বড়ো টেলিভিশন ক্যামেরা ব্যবহার করে, সেখানে ভালো মানের স্মার্টফোন একজন সাংবাদিককে 4K মানের ফুটেজ দিচ্ছে খুব সহজে। এছাড়া মোবাইলের মাধ্যমে যখন-তখন রিয়েল টাইমে লাইভ স্ট্রিমিং করা এখন যতটা সহজ, তা ১০ বছর আগেও ছিল কল্পনাতীত। বিশ্বজুড়ে কনভারজেন্স জার্নালিজমের কথা হচ্ছে। সাংবাদিকতার এই নতুন ধারণার হাওয়া এসে লেগেছে বাংলাদেশের গণমাধ্যমেও। দৈনিক পত্রিকা সারাদিনের সেরা সংবাদ নিয়ে পরের দিন পাঠকের হাতে পৌঁছুচ্ছে ঠিকই; কিন্তু নতুন যুগের সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জের কারণে তাকে একটি অনলাইন করতে হচ্ছে। সেখানে প্রতিমুহূর্তে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো তাৎক্ষণিকভাবে পাঠকের জন্য প্রকাশ তো হচ্ছেই, তেমনি অনেক সময় ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভিডিও শেয়ারের বিষয়টি ঘটছে নিয়মিত। আর এসব বিষয় মাথায় রেখেই মোবাইল সাংবাদিকতা অপরিহার্য হয়ে উঠছে।

সাধারণত স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা পছন্দের অ্যাপ দিয়ে ছবি বা ভিডিও তৈরি, সামাজিক যোগাযোগের সাইট ভিজিট করা অথবা

ইন্টারনেটে দ্রুত বার্তা আদানপ্রদান ও কথা বলার কাজ করে থাকেন। এছাড়া স্মার্টফোনের সাহায্যে আজ গণমাধ্যমের সংবাদ জানার কাজ আগের চেয়ে অনেক সহজতর হয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বের নামিদামি গণমাধ্যমের বার্তাকক্ষে সংবাদ পৌঁছে দিতে স্মার্টফোন নিয়মিত ব্যবহৃত হচ্ছে। বিবিসি তাদের প্রযুক্তিবিষয়ক অনুষ্ঠান ক্লিকসহ বেশ কয়েকটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানের পুরোটাই ধারণ ও সম্পাদনার কাজ করেছে স্মার্টফোনের মাধ্যমে। বাংলাদেশের গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে টেলিভিশন মোবাইলের সবটুকু সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত অনেক টেলিভিশন সংবাদকর্মী ইদানীং বিভিন্ন ঘটনার ফুটেজ তাদের স্মার্টফোনে ধারণ করেন। এমনকি অনেকক্ষেত্রে সরাসরি সম্প্রচার করার কাজটিও সাংবাদিকরা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে স্মার্টফোনের মাধ্যমে করতে শুরু করেছেন। এই চর্চা যেমন গণামাধ্যম প্রতিষ্ঠানের খরচ কমিয়ে দিচ্ছে, তেমনি এটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রেরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমাদের গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকদেরও মোবাইলের মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনার সংবাদ, ছবি ও ভিডিও গ্রহণে আগ্রহী করে তুলতে পারেন। এটা করতে পারলে গণমাধ্যমে রিয়েল টাইমে আরও সংবাদ ফুটেজ আসবে, যা সাংবাদিকতার চর্চাকে বৈচিত্র্যের দিকে নিয়ে যাবে। আমরা এমন অনেক ঘটনা দেখেছি, যেখানে সাধারণ জনগণ ছবি বা ভিডিও প্রকাশ করেছেন, আর তার পরপরই সেটি হয়ে উঠেছে টক অব দ্য টাউন!

মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিকে তার প্রয়োজনেই মোবাইল সাংবাদিকতার দিকে ঝুঁকতে হবে। নিজের কর্মীদের কাছ থেকে এখন আর কেবল সংবাদবিবরণী নয়, সঙ্গে ঘটনার ছবি ও ভিডিও ফুটেজ আদায়ের কাজটিও করতে হবে। এ অবস্থার বিবেচনায় গণমাধ্যমে টিকে থাকতে হলে সাংবাদিকদেরও মোবাইল ব্যবহার করে ভিডিও স্টোরি তৈরি করা জানতে হবে। সংবাদের পাশাপাশি ছবি, ভিডিও ফুটেজ পাঠাতে হবে।

কীভাবে মোবাইল সাংবাদিকতা

প্রচলিত সাংবাদিকতায় সংবাদগল্প বলার যে ধরন, একে আমূল বদলে দিতে পারে মোবাইলের ব্যবহার। মোবাইল সাংবাদিকতায় একজন গণমাধ্যমকর্মী কেবল দরকারি সোর্স থেকে তথ্য ও মতামত নিয়ে একটি সাদামাটা হার্ড নিউজ পাঠিয়ে দিলেই আর চলছে না, তাকে ভিডিও স্টোরিটেলিং বুঝতে হচ্ছে। ফুটেজ সংগ্রহ, ছবি তোলার ব্যাকরণ, ভালো অডিও নেওয়ার কলাকৌশল থেকে শুরু করে লাইটিং, সব ব্যাপারেই খুঁটিনাটি জানতে হচ্ছে। মোবাইলের মাধ্যমে সংবাদ সংগ্রহ ও সংবাদগল্প প্রস্তুতের জন্য কয়েকটি বিশেষ পদক্ষেপ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো:

১. পরিকল্পনা: মোবাইল ফোনের ব্যবহার করে ভালো স্টোরি বলতে হলে একজন সাংবাদিককে প্রথমে জুতসই পরিকল্পনা সাজিয়ে নিতে হবে। প্রথমত এমন একটি স্টোরি অ্যাঙ্গেল বেছে নিতে হবে, যেটি দিয়ে তিনি একটি ভালো স্টোরি পাঠক-দর্শকের সামনে হাজির করতে পারেন। গুরুত্বপূর্ণ সোর্স বা সংবাদ উৎস কারা হবে, সে বিষয়েও তার পরিপূর্ণ ধারণা থাকতে হবে। এছাড়া পরিকল্পনার মধ্যে আরও জরুরি যে বিষয়টি থাকতে হবে সেটি হচ্ছে, ভিডিওর মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত গল্পটি বলার যথাযথ ছক। কী কী ফুটেজ তিনি গ্রহণ করবেন, কোন কোন বি-রোলগুলো তার স্টোরিটেলিং ও সম্পাদনাকে সহজ করে তুলবে, সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখতে হবে সাংবাদিককে। আর এর সঙ্গে একটা ড্রাফট স্ক্রিপ্ট তো থাকতেই হবে।

২. সংবাদ সংগ্রহ: পরিকল্পনা ধাপে সাংবাদিক তার সংবাদ উৎস ও সূত্রের যে তালিকা তৈরি করেছেন, সেগুলো নিয়ে গবেষণা করতে হবে। সোর্সদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলো যাচাই করতে হবে।

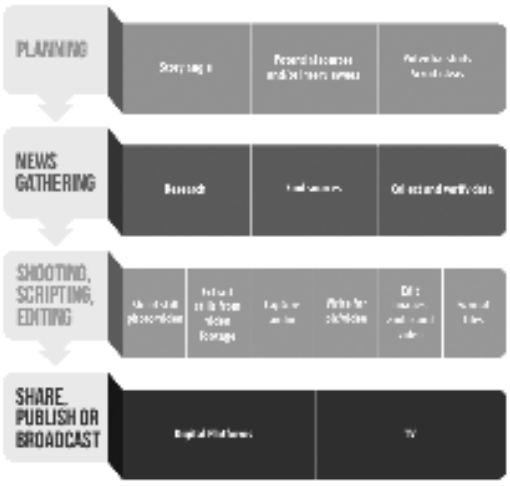

ছবি: আলজাজিরা মিডিয়া ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার

৩. চিত্রগ্রহণ, স্ক্রিপ্টিং ও ভিডিও সম্পাদনা: মোবাইলে স্টোরিটেলিংয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ এটি। একজন প্রতিবেদক তার গল্পটা মোবাইল ডিভাইস দিয়ে কীভাবে বললেন, কতটা শক্তিশালীভাবে বলতে পারবেন, সেটা নির্ভর করবে এই ধাপে তার দক্ষতার ওপর। একজন মোবাইল সাংবাদিককে ফটোগ্রাফি ও ভিজুয়াল তৈরির ব্যাকরণগুলো জেনে নিতে হবে, জেনে নিতে হবে শট ডিভিশনের নানা বিভাজন। তিনি তার গল্পটি কীভাবে সাজাবেন, কী কী ধরনের, কোন কোন অ্যাঙ্গেলে ফুটেজ ও ছবি সংগ্রহ করবেন, সে বিষয়ে তার স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। ফুটেজ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম আলো (যদি লাগে), সে ব্যাপারে তাকে সচেতন থাকতে হবে। ফুটেজের অডিও শ্রবণযোগ্য কি না, ভিড়, হট্টগোল সামলে ভালো সাউন্ড বাইট নেওয়ার বিদ্যাটাও তাকে শিখে নিতে হবে। এর সঙ্গে স্ক্রিপ্টিং, ভিডিও সম্পাদনা, মোবাইল ফোনে ব্যবহারযোগ্য ভিডিও সম্পাদনা সফটওয়্যার ও সম্পাদনার কলাকৌশল সম্পর্কে তাকে জানতে হবে।

৪. প্রতিবেদন প্রকাশ করা: মোবাইলের মাধ্যমে মনের মতো ভিজুয়াল গল্পটি বলতে পারার পর সেটিকে প্রকাশ-প্রচারের বিষয়ে ভাবতে হবে সাংবাদিককে। যিনি টেলিভিশনে কাজ করেন, তিনি তার স্টেশনে সংবাদ প্রতিবেদনটি পাঠিয়ে দিলেই হচ্ছে। কিন্তু নাগরিক সাংবাদিককে ভাবতে হবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে। কীভাবে, কোন সময়ে সংবাদটি তিনি প্রকাশ করবেন, এ বিষয়ে তার জানাশোনাও থাকতে হবে।

মোবাইল সাংবাদিক হতে চাইলে

মোবাইল ফোনের ব্যবহার করে তাক লাগানো, দর্শক আগ্রহী প্রতিবেদন তৈরির জন্য দক্ষতা আর জ্ঞানের সমন্বয় থাকতে হবে একজন সংবাদকর্মীর মাঝে। প্রথমত মোবাইল প্রযুক্তি তাকে বুঝতে হবে। এই ডিভাইসটি দিয়ে তিনি কীভাবে একটি ভালো গল্প বলতে পারেন, সে বিষয়টি তাকে জানতে হবে। সাংবাদিকতায় নিত্যনতুন ব্যবহৃত অ্যাপস, যন্ত্রপাতি সম্পর্কে সব সময় আপডেট থাকতে হবে। সাধ্যের মধ্যে কোন ডিভাইসটি তার ফুটেজকে নিউজি করে তুলবে, টেলিভিশনের কিংবা ইউটিউবের দর্শককে আগ্রহী করে তুলবে, এ সম্পর্কে জানতে হবে। ভালো সাউন্ড ডিজাইনিং, বহনযোগ্য, সাশ্রয়ী সাউন্ড ডিভাইস সম্পর্কে জানতে হবে।

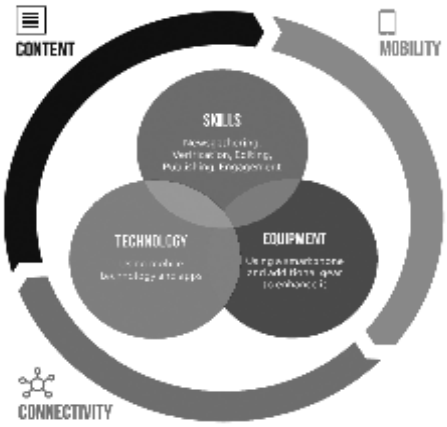

ছবি: আলজাজিরা মিডিয়া ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার

মোবাইল সহযোগী যন্ত্র

মোবাইল সাংবাদিক হতে চাইলে কিছু খুব সাধারণ অথচ মৌলিক ও জরুরি ডিভাইস আপনার থাকতেই হবে। এই ডিভাইসগুলো মোবাইল সাংবাদিক হিসেবে যেমন আপনার পেশাদারিত্বকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেবে, তেমনি মোবাইলের মাধ্যমে তোলা সংবাদের ছবি ও ভিডিওকে মানসম্মত ও প্রচারযোগ্য করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রথমত, আপনি যদি একজন মোবাইল সাংবাদিক হিসেবে কাজ করতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই একটি ভালো মানের স্মার্টফোনের অধিকারী হতে হবে। সেক্ষেত্রে ফোন কিনতে গিয়ে আপনি যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখবেন, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ফোনটির ছবি বা ভিডিও কোয়ালিটি কেমন? ফোনের ডাটা স্টোরেজ ক্যাপাসিটি পর্যাপ্ত কি না? মোবাইল সাংবাদিকতায় অন্য যেসব ডিভাইস কিংবা হালকা প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়, সেগুলো মোবাইলটিতে সহজে ব্যবহার করা যাবে কি না? আপনার বাজেটের মধ্যে সঠিক মোবাইলটি কেনার জন্য আপনি নির্দিষ্ট মোবাইল সম্পর্কে অনলাইনে যেসব ইউজার রিভিউ থাকে সেগুলো পড়ে যেমন ধারণা পেতে পারেন, তেমনি দোকানে গিয়ে মোবাইলটি তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহার করেও দেখতে পারেন। এই দুটো প্রক্রিয়া আপনাকে সঠিক মোবাইলটি কিনতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। মোবাইল সাংবাদিকতা করতে মোবাইল সহায়ক বিভিন্ন ছোটোখাটো যেসব ডিভাইস সম্পর্কে আপনার জানা দরকার, নিচে সেগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

মোবাইলের নিরাপত্তা

মোবাইল সাংবাদিকতা করতে গেলে আপনাকে প্রথমেই আপনার ফোনের নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। মোবাইলের নিরাপত্তায় আপনি যেসব ডিভাইস ব্যবহার করতে পারেন, সেগুলো হলো:

১. নিরাপত্তা কাভার: সাধারণত যারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে, তাদের অধিকাংশই নিজেদের মোবাইলের নিরাপত্তার জন্য নিরাপত্তা কাভার বা Protective case ব্যবহার করে থাকেন। এটি ব্যবহারের ফলে সংবাদের ছবি বা ফুটেজ সংগ্রহের সময় মোবাইলটি হাত থেকে পড়ে গেলেও সেটি নিরাপদ থাকবে।

২. স্ক্রিন প্রোটেকটর: মোবাইল ফোনের স্ক্রিন বেশ সংবেদনশীল। সামান্য আঙুলের ছাপ কিংবা কোনো কিছুর দাগ পড়লে সেটা চিরস্থায়ীভাবে মোবাইল স্ক্রিনে লেগে থাকতে পারে। এজন্য সাধারণত আমরা স্ক্রিন প্রোটেকটর ব্যবহার করে থাকি। মোবাইলের স্ক্রিন প্রোটেকটর আপনার ফোনের স্ক্রিন ফেটে যাওয়া কিংবা অপ্রত্যাশিত দাগের হাত থেকে রক্ষা করবে।

৩. পরিচ্ছন্ন কাপড়: সাধারণত মোবাইলের আই গ্লাস কিংবা মোবাইল ক্যামেরা লেন্সকে নিয়মিত পরিষ্কারের জন্য মোবাইল সাংবাদিক হিসেবে আপনার কাছে নরম কাপড়ের টুকরো থাকা উচিত। কোনো ঘটনা বা ইভেন্টের ছবি কিংবা ভিডিও সংগ্রহের আগে মোবাইলের ক্যামেরা লেন্সকে পরিষ্কার করে নিলে সেটা নিশ্চিতভাবে আপনাকে আরও স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন ছবি ও ফুটেজ দিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৪. পাওয়ার ব্যাংক: কারও একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে গেলেন কিংবা হঠাৎ করে কোনো ঘটনার ছবি বা ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহের প্রয়োজন হয়ে পড়ল; কিন্তু দেখলেন মোবাইলে পর্যাপ্ত চার্জ নেই। এ ধরনের পরিস্থিতি একজন মোবাইল সাংবাদিকের জন্য খুবই বিব্রতকর ও অপ্রত্যাশিত। এরকম পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য সব সময় সঙ্গে একটি মোবাইল চার্জার কিংবা পাওয়ার ব্যাংক রাখা একান্ত দরকারি।

৫. ট্রাইপড: ট্রাইপড হচ্ছে একটি মোবাইল মাউন্টিং ডিভাইস, প্যান (ডান থেকে বামের শট), টিল্টসহ (উপর থেকে নিচের শট) স্মুথ শট গ্রহণের জন্য যার ওপর মোবাইলকে রেখে ভিডিও ধারণ করা হয়। সাধারণত ভিডিও ক্যামেরায় ট্রাইপডের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তবে সম্প্রতি মোবাইলের মাধ্যমে ভিডিও গ্রহণের জন্য ট্রাইপডের ব্যবহার আবশ্যিক ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ট্রাইপড যেহেতু তিন পা (পড) বিশিষ্ট হয়, এ কারণে এটির উপর মোবাইল রেখে খুব সহজে আপনি স্মুথ ভিডিও পেতে পারেন।

ট্রাইপডের উপরের দিকে সাধারণত মোবাইলকে শক্তভাবে লাগিয়ে রাখার জন্য একটি হেড থাকে। এছাড়া হেডের নিচে প্যানিং রড নামের একটি বড়ো লাঠির মতো অংশ থাকে, যেটা ব্যবহার করে মোবাইল ফোনকে আপনি ডান থেকে বামে বা বাম থেকে ডানে ঘোরানোর পাশাপাশি উপরে-নিচেও ওঠানামা করাতে পারবেন। আর এর ফলে আপনি খুব সহজে মোবাইল দিয়েই প্যান বা টিল্ট শট নিতে

পারবেন। এছাড়া ট্রাইপডে যে তিনটি পা থাকে, সেগুলো সাধারণত সিঙ্গেল ফোল্ড, ডাবল ফোল্ড ও ট্রিপল ফোল্ড হয়ে থাকে। প্রতিটি ফোল্ডারেই লেগ লক থাকে। আপনি আপনার প্রয়োজন মতো ট্রাইপডের ফোল্ডারগুলো খুলে মোবাইলকে রেকর্ডিংয়ের জন্য কাঙ্ক্ষিত উচ্চতায় রেখে লেগ লকগুলো আটকিয়ে দিয়ে রেকর্ডিং করতে পারবেন। এছাড়া ট্রাইপডের নিচের দিকে স্প্রেডার লাগানো থাকে। এটির মাধ্যমে আপনি ট্রাইপডকে প্রয়োজন মতো ভূমিতে ছড়িয়ে দিয়ে ভিডিও রেকর্ডিং করতে পারবেন। মোবাইল সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সাধারণত খুব হালকা, বহনযোগ্য ট্রাইপড ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৬. **মনোপড ও সেলফি স্টিক:** ট্রাইপডের পাশাপাশি মোবাইল সাংবাদিকরা মনোপডও ব্যবহার করে থাকেন। মনোপড কিংবা ট্রাইপডের ব্যবহারের উদ্দেশ্য মোটামুটি এক হলেও অনেকে সহজ বহনযোগ্যতার জন্য মনোপড ব্যবহার করে থাকেন। মনোপডে যে একটি পা থাকে, সাধারণত সেটির নিচের দিকে তিনটি স্প্রেডার থাকে। এই তিনটি স্প্রেডার ছড়িয়ে দিয়ে খুব সহজেই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহের কাজটি আপনি করতে পারবেন। তবে মনোপডের চেয়ে সেলফি স্টিকের জনপ্রিয়তা বেশি। সেলফি স্টিককে হাতে নিয়ে ক্যামেরা পজিশনকে আপনার পছন্দমতো জায়গায় নিয়ে সহজেই ছবি বা ভিডিও করতে পারবেন। সাধারণত ভিড়ের মধ্য থেকে একটু দূরের দৃশ্য নিতে চাইলে সেলফি স্টিক আপনার জন্য দারুণ সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারে।

মোবাইল সাংবাদিকতায় অ্যাপস ও অন্যান্য

বিশ্বজুড়ে স্মার্টফোন ইউজার বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিদিন বাড়ছে অ্যাপের সংখ্যা। নানা সুবিধা আর উপযোগিতা নিয়ে প্রতিদিন এসব অ্যাপ হাজির হচ্ছে আপনার কাছে। এসব অ্যাপের মধ্যে অনেক অ্যাপই আছে, যেটা মোবাইল সাংবাদিকতায় কাজে লাগতে পারে। সাংবাদিকতায় মোবাইলের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে চাইলে এসব অ্যাপ ব্যবহারের বিকল্প নেই। এখন বেশির ভাগ সাংবাদিকই নোটপ্যাড নিয়ে কোনো স্টোরি কাভার করতে বের হন না। তিনি কনফারেন্স বা অন্য কোনো ইভেন্ট চলাকালীন নোট টুকে রাখার খুব জনপ্রিয় অ্যাপ 'কালারনোট' দিয়ে ডিজিটালি তথ্য সংগ্রহের কাজ চালিয়ে নেন। এবার সেটি অফিসে পাঠানোর জন্য ইমেইল সার্ভিস প্রোভাইডার যেমন গুগল, ইয়াহুর মোবাইল অ্যাপ দিয়ে সহজে কাজটি করে ফেলেন। মোবাইলে ধারণকৃত খুব বড়ো সাইজের ভিডিও ফুটেজ পাঠাতে হবে? সেটারও সমাধান দিয়ে দিচ্ছে মোবাইল অ্যাপস। গুগল প্লে স্টোরে আপনি অনেক অ্যাপ পাবেন, যেটা দিয়ে বড়ো বড়ো ফাইল সহজেই মোবাইল দিয়ে পাঠাতে পারছেন। এছাড়া ছবি সম্পাদনা, ভিডিও এডিটিংসহ যাবতীয় সব কাজ মোবাইলে করার জন্য দারুণ সব অ্যাপ আছে গুগল প্লে স্টোরে।

একজন সাংবাদিক ছবি তোলা ও সম্পাদনার জন্য যেসব অ্যাপ ব্যবহার করতে পারেন, এর মধ্যে Pro Camera: (iOS) , Snapseed (iOS/Android), ProShot (iOS/Android), VSCO (iOS/Android) প্রভৃতি অন্যতম।

ভিডিও রেকর্ডিংয়ের জন্য কার্যকরী অ্যাপগুলোর মধ্যে Filmic Pro (iOS/Android), Open Camera (Android only), Cinema 4K (Android only), Cinema FV-5 (Android only), Lapse it (iOS / Android) প্রভৃতি অন্যতম।

ভিডিও সম্পাদনার জন্য LumaFusion (iOS only), KineMaster (iOS/Android), PowerDirector (Android only), Alight Motion (Android), iMovie (iOS only) প্রভৃতি অন্যতম। এগুলো মূলত মাল্টি ট্র্যাক ভিডিও এডিটিং অ্যাপস। এছাড়া আরও সহজ কিছু ভিডিও অ্যাপ রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে Quik (iOS/Android), Animoto (iOS/Android), Apple Clips (iOS), Splice (iOS), Enlight VideoLeap (iOS), CuteCut (iOS/Android), Movie Maker (Android), Vlogit (iOS/Android) ইত্যাদি ব্যবহার করে দেখতে পারেন।

ভিডিও ফুটেজে সাব-টাইটেল ক্যাপশন ও লোগো বসানোর জন্য আলাদা কিছু অ্যাপ আছে। যেগুলোর মধ্যে Phonto (iOS/Android), Vont (iOS), DIY Subtitle (iOS), Movie Maker (Android), Autocap (Android) প্রভৃতি অন্যতম।

একজন মোবাইল সাংবাদিকের জন্য স্মার্টফোনের মাধ্যমে ভিডিও ফুটেজ ও ছবি সংগ্রহের পাশাপাশি অডিও রেকর্ডিং ও এডিটিংয়ের কাজটাও দারুণ জরুরি। আপনি প্রাথমিকভাবে মোবাইলের মাধ্যমে অডিও রেকর্ডিংয়ের জন্য RecForge Lite (Android only) ও Voice Record Pro (iOS/Android) অ্যাপ দুটি ব্যবহার করে দেখতে পারেন। এছাড়া অডিও সম্পাদনার জন্য Ferrite (iOS), AudioEvolution Mobile Studio (Android), n-Track (Android) প্রভৃতি অ্যাপের সুনাম ও উপযোগিতা বেশ ভালো। এছাড়া টেক্সট ও ভিডিও অ্যানিমেশন, লাইভ স্ট্রিমিং প্রভৃতি কাজের জন্য দরকারি অনেক অ্যাপ আছে, যেগুলো আপনার গল্প বলাকে আরও শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় করতে সহায়তা করতে পারে।

সাংবাদিক ও প্রশিক্ষক বার্নহার্ড লিলের ব্যক্তিগত টুইটার অ্যাকাউন্টে তিনি একটি আলাদা তালিকা তৈরি করেছেন মোবাইল সাংবাদিকতায় আগ্রহীদের জন্য। সেটাও এখানে শেয়ার করা হলো:

সাংবাদিকতায় মোবাইল অ্যাপস ব্যবহারে আপনার স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীলতাই শেষকথা। আপনি যে প্ল্যাটফর্মে, যে অ্যাপ ব্যবহার করে আপনার প্রতিবেদনটি সঠিকভাবে তৈরি করতে পারেন, নিয়মিত কাজের জন্য সেটাই বেছে নেবেন।

সাংবাদিকতায় স্মার্টফোনের ব্যবহার বাড়াতে চাইলে, হয়ে উঠতে চাইলে একজন পুরোদস্তুর মোবাইল সাংবাদিক, আপনাকে মোবাইলের উপরিউক্ত প্রযুক্তিগুলো আয়ত্ত করতে হবে। একটি সংবাদ সংগ্রহ করতে যাওয়ার আগে সংবাদ সংক্রান্ত তথ্যগত বিভিন্ন সোর্স ও বিষয়াদি সম্পর্কে সচেতন থাকার পাশাপাশি আপনার মোবাইল ফোনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন টুলস ও প্রয়োজনীয় বহনযোগ্য যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক আছে কি না, সেগুলো দেখে নিতে হবে। ভালো পরিকল্পনা, সচেতন প্রস্তুতি, প্রয়োজনীয় দক্ষতা আপনাকে আপনার স্মার্টফোন দারুণ সব রিপোর্ট তৈরির সুযোগ করে দিতে পারে। বদলে দিতে পারে সাংবাদিক হিসেবে আপনার ক্যারিয়ার।

লেখক: সহকারী প্রশিক্ষক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো

নাসিরুদ্দিন চৌধুরী

সে একটা সময় এসেছিল আমাদের জীবনে। অদ্ভুত, আশ্চর্য, ভয়ংকর সময়– চরম বিভীষিকাময় জিঘাংসাপূর্ণ, প্রতিহিংসামূলক, প্রতারক সময়। তখন ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু, আশরাফ-আতরাফ ভেদাভেদ লুপ্ত হয়ে সব মানুষ একাকার হয়ে গিয়েছিল। চুরি, ডাকাতি, জোচ্চুরি, রাহাজানি, ছিনতাই, এমনকি খুন-জখম, মারামারি-কাটাকাটিও কমে গিয়েছিল। পকেটমার, দালালও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক হয়ে পড়েছিল; মুক্তিযুদ্ধের কোনো কাজে লাগতে পারলে তারা নিজেদের ঘৃণিত জীবনটা ধন্য মনে করত।

মুক্তিযুদ্ধ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। জীবনে যত ভালো কাজ করেছি, তন্মধ্যে মুক্তিযুদ্ধই সর্বাগ্রে স্থান পাবে। দেশের স্বাধীনতার জন্য, মাতৃভূমির পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য সংগ্রাম ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারার চেয়ে গৌরবময় কাজ আর কিছু হতে পারে না। যদি স্বাধীনতার বেদিমূলে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ জীবনটাই বিলিয়ে দিতে পারতাম, তাহলে আমার গৌরব আরও বৃদ্ধি পেত। আমাদের বয়সি কিংবা আমাদের চেয়ে কিছু বেশি বয়স যাদের ছিল, তাদের মধ্যে অনেকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি। আমি মনে করি, তাদের চেয়ে দুর্ভাগা আর কেউ হতে পারে না। আমরা বাঙালি জাতির সেই সৌভাগ্যবান প্রজন্ম, যাদের জীবনকালে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধ করতে না পারলেও কোনো না কোনোভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন, তাঁরা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান।

বাঙালির একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধু যে ২৩ বছর সংগ্রাম করেছেন, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছেন, জীবনের সোনালি দিনগুলো কারাগারে কাটিয়ে দিয়েছেন, বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি জাতিসত্তার অনুভব সঞ্চারিত করেছেন এবং স্বাধীন রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে নবজাগ্রত জাতিকে স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে প্রবৃত্ত করেছেন, তারপরই না মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে

১৯৭১ সালের ছাব্বিশে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা

ঘোষণা এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জাতিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানানোর পর যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল এবং ১৬ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্বপর্যন্ত যা স্থায়ী হয়েছিল, তাকেই আমরা 'মুক্তিযুদ্ধ' নামে অভিহিত করি। এই কালিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে 'মুক্তিযুদ্ধ' শব্দের আক্ষরিক পরিতৃপ্তি ঘটে বটে; কিন্তু 'মুক্তিযুদ্ধ' শব্দের আরও গূঢ়ার্থ, বহুতর বিস্তৃত তাৎপর্য অনবহিত থেকে যায়। মুক্তিযুদ্ধ হঠাৎ করে শুরু হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ একটি ইতিহাসের পরম্পরা, যে ইতিহাসকে স্বাধীনতা-সংগ্রাম নামে আখ্যায়িত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা-সংগ্রামের অনিবার্য পরিণতি। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধে উত্তরণ।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস খোঁজার জন্য আরও ২৩ বছর পিছিয়ে যেতে হবে। ১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গ ভারত-বিভক্তির ফলে সৃজিত নয়া রাষ্ট্র পাকিস্তানের অধিভুক্ত হয়। যে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম, সেখানে একটি 'স্টেটস' শব্দ ছিল, যা দিয়ে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে একাধিক রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু ছেচল্লিশ সালে মুসলিম লীগের দিল্লি কনভেনশনে তা সংশোধন করে 'স্টেট' শব্দ বসিয়ে পাকিস্তান নামক একক রাষ্ট্র গঠন করা হয়। পাঞ্জাবি সামরিক-বেসামরিক আমলারা নবগঠিত রাষ্ট্রের শাসনরজ্জু কব্জা করে 'পূর্ববঙ্গ', পরে যার নামকরণ করা হয় 'পূর্ব পাকিস্তান', সেটি পাকিস্তানের একটি উপনিবেশে পরিণত হয়। বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতিকে পদদলিত করে পাকিস্তানের রথের চাকা এগিয়ে চলে। বঙ্গবন্ধু বাঙালির পীড়নযন্ত্র পাকিস্তানকে ধ্বংসের জন্য তাঁর জন্মাবধি চেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি ১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাকিস্তানে বিরোধীদলীয় রাজনীতির সূচনা করেন এবং পরবর্তী ২৩ বছর প্রকাশ্য ও গোপনে নানা প্রক্রিয়ায় পাকিস্তানকে বধ করার উপায় খুঁজতে থাকেন। উনপঞ্চাশ সালে আওয়ামী লীগ, বায়ান্ন সালে ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নতে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, সাতান্নতে স্বল্পমেয়াদি আওয়ামী লীগ সরকারের যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন, বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন, চৌষট্টির দাঙ্গাবিরোধী কার্যক্রম, ছেষট্টির ছয়-দফা আন্দোলন, আটষট্টির আগরতলা মামলা বাতিল আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচনে জনগণের ম্যান্ডেট লাভ আওয়ামী লীগের এবং একাত্তরের মার্চের উত্তাল অসহযোগ আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধে পূর্ণাহুতি দেয়। সুতরাং শুধু মুক্তিযুদ্ধ বললে নয় মাসের যুদ্ধই প্রকটিত হবে, যুদ্ধের পেছনের পটভূমি, প্রস্তুতি উহ্য থেকে যায়। বাঙালির একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধু যে ২৩ বছর সংগ্রাম করেছেন, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছেন, জীবনের সোনালি দিনগুলো কারাগারে কাটিয়ে দিয়েছেন, বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি জাতিসত্তার অনুভব সঞ্চারিত করেছেন এবং স্বাধীন রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে নবজাগ্রত জাতিকে স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে প্রবৃত্ত করেছেন, তারপরই না মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের এই প্রস্তুতিপর্বকে একসঙ্গে ধরেই মুক্তিযুদ্ধ। এই প্রস্তুতিমূলক আন্দোলন, সংগ্রাম ও সংগঠনকে বলা হয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম।

সংগত কারণে আমার মুক্তিযুদ্ধের এই স্মৃতিচারণ স্বাধীনতা-সংগ্রাম থেকে শুরু হয়ে মুক্তিযুদ্ধে প্রবেশ করেছে। সেজন্য লেখার কলেবর বেড়েছে। তাতে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের বছরে আমাদের গ্রামে একটি নতুন কলেজ স্থাপিত হয়। কলেজের নাম হুলাইন ছালেহ-নূর কলেজ। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার একটি গ্রাম হুলাইন, আমার ইউনিয়নের নাম হাবিলাসদ্বীপ। আমার কলেজ-জীবনের সূচনাও উনসত্তরে, নবপ্রতিষ্ঠিত কলেজে। চরকানাই হাইস্কুল থেকে এসএসসি পাস করে ভর্তি হয়েছিলাম সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ঘরের পাশের সেই কলেজে। হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নটা পটিয়া থানার সীমান্তবর্তী একটি ইউনিয়ন। কর্ণফুলি নদী থেকে পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত একটি খাল পটিয়া ও বোয়ালখালী থানার সীমান্ত রচনা করেছে। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়ক উত্তরে কালুরঘাটের দিক থেকে এসে মিলিটারির পোল থেকে হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নের বুক চিরে দক্ষিণ সীমান্ত রচনা করে পটিয়া সদর অভিমুখে চলে গেছে।

একটা আগুনে সময়ে ওই যে কলেজটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেটি পটিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারে তো বটেই, রাজনৈতিক চেতনার বিকাশেও বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। আমি তখন পুরোদস্তুর একজন রাজনৈতিক কর্মী। করতাম ছাত্রলীগ। তবে আমার ছাত্ররাজনীতির সূচনা ছাত্র ইউনিয়ন দিয়ে। চরকানাই হাইস্কুলে সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় আমি ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য হয়ে ছাত্ররাজনীতিতে যোগদান করি। পরে নবম শ্রেণিতে উঠতে না উঠতে আমি দল পরিবর্তন করে ছাত্রলীগে যোগদান করি। এর একটা কারণ হচ্ছে, আমাদের পার্শ্ববর্তী মনসাগ্রামের ছাত্রলীগ নেতা এসএম ইউসুফ চট্টগ্রাম জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে তার এলাকায় ছাত্রলীগের তৎপরতা জোরদার করার জন্য জোর চেষ্টা শুরু করেছিলেন।

হুলাইন ছালেহ-নূর কলেজ প্রতিষ্ঠার পর সেটি পশ্চিম পটিয়া তথা আমাদের এলাকায় ছাত্রলীগ ও ছাত্ররাজনীতির বিস্তারের নিয়ামক হয়ে ওঠে। কলেজ থেকে বড়োজোর ৩০০ গজ পশ্চিমে পাঁচরিয়া দিঘির পাড়, উনসত্তরের গণআন্দোলন থেকে পশ্চিম পটিয়ার রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন মেনন-মতিয়া উভয় গ্রুপ ঐক্যবদ্ধভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। বছরের শুরুতে গণঅভ্যুত্থানে আইয়ুব শাহীর পতন ঘটে। আগরতলা মামলা প্রত্যাহার হয় এবং বঙ্গবন্ধুসহ ওই মামলার সব আসামি মুক্তিলাভ করেন। আগরতলা মামলার দুজন আসামি ছিলেন পটিয়া ও বোয়ালখালী থানার অধিবাসী। তাঁরা হলেন পটিয়া থানার হাবিলাসদ্বীপ গ্রামের ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী ও বোয়ালখালীর সারোয়াতলী গ্রামের বিধান কৃষ্ণ সেন। কারামুক্তির পর পাঁচরিয়া দিঘির পাড়ে তাঁদের বিরাট সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। কিছু আগে-পরে চট্টগ্রামের সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ কারামুক্ত হলে তাঁদেরও পাঁচরিয়া দিঘির পাড়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেসময় পাঁচরিয়া দিঘির উত্তর পাড়ে অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশে আগত ছাত্রনেতাদের মধ্যে এসএম ইউসুফ, আবু তাহের মাসুদ, শাহ আলম ও সুবীর বাবুর (যিনি পরে হোটেল শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা হয়েছিলেন) কথা মনে পড়ছে।

উনসত্তরের গণআন্দোলনে পশ্চিম পটিয়া আঞ্চলিক ছাত্রলীগ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। চরকানাই নিবাসী ছাত্রনেতা আবদুল হক এই কমিটির সভাপতি ও মনসা নিবাসী নুরুল ইসলাম ছিলেন সম্পাদক। চরকানাই হাইস্কুল ছিল ছাত্রলীগের বড়ো ঘাঁটি। এ স্কুলে যারা ছাত্রলীগ করতেন তারা হলেন– নুরুল ইসলাম (মনসা), আবু তৈয়ব, আবু তাহের ও ইউসুফ উদ্দিন এস্কারী (বিনিনেহারা), নাসিরুদ্দিন চৌধুরী (লেখক-হুলাইন), মোহাম্মদ রফিক, নুরুল ইমান চৌধুরী ও মাহমুদুর রহমান (চরকানাই)।

কলেজ প্রতিষ্ঠার পর বছর গড়িয়ে যেতে না যেতেই সত্তর সালে, প্রাপ্তবয়স্কের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন (চুয়ান্নতেও হয়েছিল; কিন্তু তখন ছিল পৃথক নির্বাচনপ্রথা) অনুষ্ঠিত হলো। এই নির্বাচনে পটিয়া থেকে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন পটিয়া সদরের বাসিন্দা অধ্যাপক নুরুল ইসলাম চৌধুরী আর প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছিলেন পশ্চিম পটিয়ার কুসুমপুরা ইউনিয়নের গোরনখাইন গ্রামের সুলতান আহমদ কুসুমপুরী। সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে জয়লাভ করে একক ও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং পাকিস্তানে সরকার গঠনের দাবিদার হয়। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক জান্তা জেনারেল ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি শুরু করলে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঙালিদের

স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা ও আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একাত্তরের ৭ মার্চ ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক জনসভায় বজ্রকণ্ঠে প্রকারান্তরে প্রত্যাশিত স্বাধীনতার ঘোষণাই দিয়ে ফেলেন। সেদিন থেকে আরও পিছিয়ে ১ মার্চ, যেদিন ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চের পূর্বনির্ধারিত সংসদ অধিবেশন আকস্মিকভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন, সেদিন থেকেই বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতাযুদ্ধ প্রকাশ্যে শুরু হয়ে যায়।

পটিয়ায় সত্তরের নির্বাচনে, বলা বাহুল্য, আওয়ামী লীগের দুই প্রার্থীই বিজয় লাভ করেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঘোষণার পর সারাদেশের মতো পটিয়ায়ও স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। পশ্চিম পটিয়ার বিভিন্ন স্থান যেমন– মনসার টেক, পাঁচরিয়া দিঘির পাড়, চরকানাই ফুলতল, জিরি ফকিরা মসজিদ, কালারপোল প্রভৃতি স্থানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। পটিয়া থানায় প্রথম ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় পশ্চিম পটিয়ায়। হুলাইন ছালেহ-নূর কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত এক ছাত্র সমাবেশে পশ্চিম পটিয়া ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। ছাত্রনেতা নুরুল ইসলাম (মনসা) সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক এবং ফরিদ বাঙালি (জিরি) ও আলী নূর (মনসা) যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। পরিষদের সদস্য ছিলেন নাসিরুদ্দিন চৌধুরী (লেখক), মোহাম্মদ আসলাম ও রফিক আহমদ খান (হুলাইন), নুরুল আলম (গোরনখাইন), ফজল আহমদ ও আবু তাহের বাঙালি (জিরি), আবুল হাশেম (লড়িহরা), হামিদুল হক (সাদারপাড়া), হারুনুর রশিদ (এয়াকুবদণ্ডী, মুক্তিযুদ্ধে শহিদ), ফেরদৌস চৌধুরী (মোহাম্মদনগর), নুরুল আমিন, রফিকুল আলম চৌধুরী ও মোহাম্মদ রফিক (চরকানাই), নুরুল আফসার (নাইখাইন), মুক্তিমান বড়ুয়া (পাঁচরিয়া), এমএন ইসলাম (বর্তমান জুলধা), রশিদ আহমদ (চরপাথরঘাটা), আবু তাহের বাঙালি (দৌলতপুর), ইউনুস ও এয়াকুব (চরলক্ষ্যা) এবং কামাল (শাহমীরপুর) প্রমুখ।

অসহযোগ আন্দোলনে ৫নং হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ছিলেন অ্যাডভোকেট জালাল উদ্দিন আহমদ, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি নূর মোহাম্মদ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক আবু সৈয়দ। নুর মোহাম্মদ চৌধুরী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও হুলাইন ছালেহ-নূর কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

অসহযোগ আন্দোলনকে সফল করে তুলতে যারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডা. নুরুল হাছান চৌধুরী, কামাল উদ্দিন চৌধুরী, আবদুল হক, মোহাম্মদ রফিক, রফিকুল আলম চৌধুরী, আবু তাহের (১), আবু তাহের (২), মফিজুর রহমান, আবদুস সালাম মুন্সি, মোহাম্মদ সৈয়দ, মোহাম্মদ মহসিন, নুরুজ্জমা ড্রাইভার ও নুরুল হক ফকির (চরকানাই), মোহাম্মদ ইউসুফ, আবদুস সবুর ও নুরুন্নবী (পূর্ব পাঁচরিয়া), সাধন মহাজন, অমর কৃষ্ণ চৌধুরী, সুধীর দাশ, নুরুল হক, স্বপন কুমার চৌধুরী ও তপু চৌধুরী (হাবিলাসদ্বীপ) প্রমুখ আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতা। চরকানাই ফুলতলে একটি শক্তিশালী সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সেখানে একটি চেকপোস্ট ও প্রাথমিক ট্রেনিং সেন্টার ছিল। আনসার কমান্ডার শওকত আলী ও ফজল আহমদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেন।

কালারপোল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন ছাত্রনেতা ফেরদৌস চৌধুরী ও সম্পাদক নুর হোসেন। এছাড়া এখানে একটি চেকপোস্ট ছিল, যাকে কেন্দ্র করে সক্রিয় ছিলেন অধ্যাপক জাফর আহমদ মোস্তফা, আলী আহমদ, অ্যাডভোকেট নূর মোহাম্মদ, আবুল কাশেম, জালাল প্রমুখ। এ সময় কালারপোলে এমন একটি ঘটনা ঘটে, যা স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকবে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর কালারপোল ফাঁড়ির সব পুলিশ ওসি রাজ্জাকের নেতৃত্বে ছাত্রদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে। তাদের অস্ত্র দিয়ে ২৫ মার্চ পর্যন্ত স্থানীয় ছাত্র যুবকদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় কালারপোলে এমন একটি ঘটনা ঘটে, যা স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকবে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর কালারপোল ফাঁড়ির সব পুলিশ ওসি রাজ্জাকের নেতৃত্বে ছাত্রদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে। তাদের অস্ত্র দিয়ে ২৫ মার্চ পর্যন্ত স্থানীয় ছাত্র যুবকদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়

জিরি ফকিরা মসজিদ এলাকায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ছিলেন আবুল বশর চৌধুরী, ফরিদ উদ্দিন খান, ফজল আহমদ, ইসহাক, ফরিদুল আলম, আবু তাহের বাঙালি, এমদাদ, ফজলুল হক, আবদুল হাকিম, ফরিদ ও রুহুল আমিন (জিরি), এনামুল হক সিকদার, আবুল বশর, একরামুল হক ও জুলফিকার (গোরনখাইন), আবু তৈয়ব ও ইউসুফ এস্কারী (বিনিনেহারা), নুরুল আলম (গোরনখাইন) প্রমুখ।

ফকিরা মসজিদের সন্নিহিত গ্রাম গোরনখাইনে নবনির্বাচিত এমপিএ সুলতান আহমদ কুসুমপুরীর বাড়ি হওয়ায় তাঁর নির্বাচন থেকে জিরি, বুধপুরা, সাঁইদাইর, দ্বারক, আশিয়া, কর্ত্তালা বেলখাইন, কাশিয়াইশ, মহিরা, মহিরা হিখাইন, গোরনখাইন, বিনিনেহারা প্রভৃতি এলাকা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের দুর্গ হয়ে উঠেছিল। সুলতান আহমদ কুসুমপুরীকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আবদুস সবুর চেয়ারম্যান, আহমদ নবী সওদাগর, ইমাম শরীফ, ডা. মুসলিম উদ্দিন, নুরুল ইসলাম খান, সালেহ আহমদ, ডা. আবদুল হক, মধুসূদন নাথ, খলিলুর রহমান

(বর্তমানে বিশিষ্ট শিল্পপতি ও কেডিএস গ্রুপের চেয়ারম্যান), আলতাফ মাস্টার, আবুল হোসেন মাস্টার, ব্রজেন্দ্র লাল বর্দ্ধন (দ্বারক পেরপেরা), আহমদ ছফা (দ্বারক), সুলতান আহমদ (বুধপুরা), আহমদ শরিফ মনীর (সাঁইদাইর), জামালউদ্দিন ইয়াহিয়া, শামসুল হক ও আবুল বশর (কৈয়গ্রাম), মাস্টার রফিকুল আলম চৌধুরী, মুসা (কুসুমপুরা), ফরিদ চেয়ারম্যান (বিনিনেহারা), মোজাহেরুল হক চৌধুরী (বরলিয়া), অমিয় চৌধুরী (কর্তালা), আবদুস সবুর ও আহমদ নবী (আশিয়া), ডা. শৈবাল দাশ, মাহমুদুল হক ইঞ্জিনিয়ার, আলী আহমদ (শিকলবাহা), মোহাম্মদ মিয়া (মাস্টারহাট), আবুল বশর চৌধুরী, ইসহাক, ফরিদ, ফেরদৌস চৌধুরী, ফজল আহমদ (জিরি) প্রমুখ। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে উল্লিখিত এলাকাগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি হয়ে ওঠে এবং বুধপুরা বাজার পশ্চিম পটিয়ার মুক্তিযুদ্ধে অঘোষিত হেডকোয়ার্টার এবং মুক্ত এলাকায় পরিণত হয়। বাজারের বসন্ত বাবুর চায়ের দোকান ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের আড্ডাস্থল। ক্যাপ্টেন করিম বুধপুরায় অবস্থান করে বহুদিন দক্ষিণ চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন।

মনসার টেকে ন্যাপ নেতা এএনএম নূর উন নবীকে সভাপতি ও আওয়ামী লীগ নেতা আবুল হাশেম মাস্টারকে সাধারণ সম্পাদক করে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এর প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন ন্যাপের কেন্দ্রীয় নেতা চৌধুরী হারুনুর রশিদ। সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলেন কামাল উদ্দিন খান, আবদুল মালেক, আবু সৈয়দ মাস্টার, ডা. নুরুল ইসলাম ও পেটান শীল (মনসা), ডা. জাফর ও ডা. নুরুন্নবী (এয়াকুবদণ্ডী) খোরশেদ (দক্ষিণ হুলাইন)। অসহযোগ আন্দোলনে হাবিলাসদ্বীপ, হুলাইন, পাঁচরিয়া ও মনসা গ্রামের কমিউনিস্ট পার্টি, মোজাফফর ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁরা হলেন ব্যাংকার মফজল ও শাহজাহান (মনসা), মুক্তিমান বড়ুয়া, শক্তিমান বড়ুয়া, মধুসূদন নাথ ও দুলাল নাথ (পাঁচরিয়া), ধীরেন দাশ, বিমল দাশ, দেবেন্দ্র মহাজন, ননীগোপাল রায়, নৃপতি পাল, চারু বিশ্বাস, গৌরাঙ্গ নন্দী, অরুণ দত্ত ও বরুণ চৌধুরী (হাবিলাসদ্বীপ), মৌলভী আহমদ ছফা, মদিন উল্লাহ ও মামুনুর রশিদ (হুলাইন), শীলব্রত তালুকদার, নুরুল আনোয়ার, ইসহাক, কমরু ও বিভূতি বড়ুয়া (চরকানাই)।

ভাসানী ন্যাপপন্থি পূর্ব বাংলা ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরাও নানা কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবদান রাখেন। যাঁদের নাম মনে পড়ছে তাঁরা হলেন– আবু তৈয়ব (মনসা নিবাসী, টি কে শিল্পগোষ্ঠীর প্রয়াত চেয়ারম্যান), নুরুল আনোয়ার, আনোয়ার হোসেন খান, নুরুল আমিন, আবুল কাশেম, নুরুল আলম (১), নুরুল আলম (২) ও রফিক (হুলাইন)।

বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের ডাক এমন এক উন্মাদনা সৃষ্টি করল যে, সমগ্র বাঙালি জাতি যেন রাজপথে নেমে এলো। নিতান্ত অবোধ শিশু, অক্ষম বৃদ্ধ, পঙ্গু-রুগ্‌ণ মানুষ, নিতান্ত পর্দানশিন নারী ছাড়া আর কেউ ঘরে বসে থাকল না। প্রতিটি ঘর হয়ে উঠল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত দুর্গ। শহর-বন্দর-গ্রামে, মাঠে-ঘাটে-প্রান্তরে, অলি-গলি-রাজপথে লাঠি-সুরকি-বল্লম, লগি-বৈঠা হাতে মানুষ পাহারা দিতে শুরু করে। আক্ষরিক অর্থেই গোটা বাংলাদেশ হয়ে উঠেছিল দুর্ভেদ্য দুর্গ। প্রতিটি জাতির জীবনে এমন মুহূর্ত আসে, যখন সেই জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিমানুষের ব্যক্তিগত জীবন জাতীয় জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে একাকার হয়ে যায়। পরিবারকেন্দ্রিক ঘরোয়া জীবনের ছন্দ কেটে গিয়ে তা মহাজীবনে বিলীন হয়ে যায়। বাঙালি জাতির জীবনে একাত্তরের মার্চ তেমনই একটা সময় ছিল।

কূলপ্লাবী সেই জনবিস্ফোরণে আমারও ঘরে থাকার উপায় ছিল না। পাঁচরিয়া দিঘির পাড় ও ছালেহ-নূর কলেজকে কেন্দ্র করে পশ্চিম পটিয়ায় যে সংগ্রাম, অসহযোগ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল, সেই আন্দোলন-সংগ্রামের ঘনীভূত আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে আমিও ভেসে গিয়েছিলাম। মিটিং-মিছিল, আড্ডায়-আলোচনায়, জনরব-কলরবে জীবন খুঁজে পেত প্রাণস্পন্দন, মহাজীবনের স্ফূর্তির মাঝে আশ্রিত হয়ে ব্যক্তিজীবনের উদ্ভাস মিলেমিশে যেত। ঢাকা থেকে, চট্টগ্রাম শহর থেকে এক একটি খবর আসে, উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকে; ফুঁসে উঠি আমরা। পাঁচরিয়া দিঘি থেকে কখনো পটিয়া, কখনো নিমতল, মনসার টেক, কখনো চরকানাই ফুলতলে ছুটে ছুটে যাই। বন্দর থেকে পাকিস্তানি অস্ত্রবোঝাই সোয়াত জাহাজ অবরোধের খবর আসে, ছুটে যাই শহরপানে। চরকানাইর আবদুল হক, নুরুল আমিন, মোহাম্মদ রফিক, রফিকুল আলম চৌধুরী, মফিজুর রহমান, নুরুল আনোয়ার, শীলব্রত বড়ুয়া, মোহাম্মদ সৈয়দ, মোহাম্মদ মহসিন, মোহাম্মদ ইসহাক ও হাশেম; মনসার আবু তৈয়ব, নুরুল ইসলাম, মো. ইব্রাহিম, মো. ইউসুফ, সিরাজুল হক, আবুল কাশেম, নাজিমুল হক, আলীনুর ও আহমদ নুর; হুলাইনের আসলাম, রফিক আহমদ খান দুলাল, আমি, মাহফুজুর রহমান খান, রফিক আহমদ, নুরুল আলম, আবুল কাশেম, শফিকুর রহমান চৌধুরী ও মো. রফিক; দক্ষিণ হুলাইনের নুরুল আমিন ও নুরুল আলম, হাবিলাসদ্বীপের অমর চৌধুরী, সমীরণ চৌধুরী, গৌরাঙ্গ নন্দী, মৃদুল নন্দী, স্বপন দত্ত, স্বপন চৌধুরী, তপন দত্ত, নুরুল হক, ত্রিদিব দত্ত, অরুণ দত্ত, বরুণ চৌধুরী, বরুণ দত্ত, আশীষ সেন, সুধীর দাশ, পারুল, মাহবুবুর রহমান, শান্তি চৌধুরী, কাজল চৌধুরী, পাঁচরিয়ার স্বদেশ বড়ুয়া, মুক্তিমান বড়ুয়া ও হরিপদ, করনখাইনের অধ্যাপক শামসুল ইসলাম ও মোজাম্মেল, মুকুটনাইটের রোকেয়া আকতার মিনু, নাইখাইনের নুরুল আফসার, আর্যমিত্র বড়ুয়া, প্রদীপ বড়ুয়া ও নুর মোহাম্মদ; মনোজ বড়ুয়া (উনাইনপুরা), শাকপুরার স্বপন মহাজন ও স্মৃতি চৌধুরী, এয়াকুবদণ্ডীর মো. ইসহাক, লাখেরার লক্ষ্মী চৌধুরী, শান্তি বড়ুয়া ও আবুল হোসেন, পাইরোলের মোজাহেরুল ইসলাম; পূর্ব পাঁচরিয়ার মো. ইউসুফ, মো. নুরুন্নবী ও মো. সবুর, খায়রুল বশর (কধুরখিল), আবু জহুর ও নজরুল ইসলাম (গোমদণ্ডী), লড়িহরার আবুল হাশেম, সাদারপাড়ার হামিদুল হক, মাহবুব, আফসার, জিরির আবু তাহের বাঙালি, এমদাদুল হক, ফজলুল হক ও মো. ইউসুফ; ভেল্লাপাড়ার মোজাম্মেল হক, থানামহিরার এখলাস, আমিনুল হক, মোহাম্মদ হোসেন, মোহাম্মদনগরের এজহারুল হক ও এয়াকুব, সাততথৈয়ার নাজিমুদ্দিন, গোরনখাইনের নুরুল আলম, একরামুল হক ও জুলফিকার হায়দার, অসিত বর্ধন (দ্বারক পেরপেরা); নুরুল আমিন, আবদুল হাকিম ও আবদুর রহিম (মোহরা) প্রমুখ ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ পাঁচরিয়া ও ছালেহ-নূর কলেজকেন্দ্রিক স্বাধীনতাকামী ছাত্র-জনতার সংগঠন ও আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে হুলাইনের অ্যাডভোকেট জালালউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, নুর মোহাম্মদ চৌধুরী, মাস্টার আ জ ম নুরুল আলম, আবু সৈয়দ, ইউসুফ খান, আবুল হাশেম মাস্টার ও খোরশেদ আলম, হাবিলাসদ্বীপ নিবাসী সাধন মহাজন, ডিএল চৌধুরী (পরে ম্যাজিস্ট্রেট ও আইনজীবী), অশোক চৌধুরী, তমাল দাশ, চরকানাইয়ের কামালউদ্দিন চৌধুরী, আবু তাহের (১), আবু তাহের (২), ডা. নুরুল হাছান চৌধুরী, বিএসসি শামসুদ্দিন, নুরুল হক ফকির, ফয়েজ আহমদ, আবদুল মান্নান, মমতাজ উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা সত্তরের নির্বাচন থেকে সক্রিয় ছিলেন।

২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস। এদিনটিতে বঙ্গবন্ধু ছুটি ঘোষণা করেছিলেন। ঢাকায় ভোর ৫টায় বঙ্গবন্ধু তাঁর ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাসভবনে নিজ হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত লাল-সবুজ পতাকা উড়িয়ে দেন। স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দিনটিকে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন ও প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয়। সেই ঘোষণা অনুযায়ী আমরা ছালেহ-নূর কলেজ ও পাঁচরিয়া দিঘির পাড়ে পতাকা উত্তোলন, সভা-মিছিলের মাধ্যমে প্রতিরোধ দিবস পালন করি। কলেজের মাঠ থেকে সন্ধ্যায় একটি মশাল মিছিল নিয়ে বোয়ালখালী থানায় গিয়ে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে দিই। কালারপোল পুলিশ ফাঁড়িতে আগেই বাংলাদেশের পতাকা উড়ছিল, এবার বোয়ালখালী থানায় উড়ল। ফলে পশ্চিম পটিয়া ও বোয়ালখালী কার্যত ২৩ মার্চ

স্বাধীন হয়ে যায়। বোয়ালখালী থানায় পতাকা উত্তোলন করেছিলাম আমি, মোহাম্মদ আসলাম, রফিক আহমদ খাঁন, রফিক আহমদ (হুলাইন), আমিনুর রহমান, আবদুল হক, মোহাম্মদ রফিক, মফিজুর রহমান (চরকানাই), আবু তাহের বাঙালি, এমদাদ (জিরি), নুরুল আলম, জুলফিকার হায়দার (গোরনখাইন), ইউসুফ এস্কারী (বিনিনেহারা), নুরুল ইসলাম (মনসা), স্বপন চৌধুরী, নুরুল হক (হাবিলাসদ্বীপ), অসিত বর্ধন (পেরপেরা), মোহাম্মদ ইউসুফ (পূর্ব পাঁচরিয়া), আবদুল হাকিম, মহিউদ্দিন (মোহরা), মনজ বড়ুয়া (উনাইনপুরা), আফসার ও আর্য মিত্র বড়ুয়া (নাইখাইন)।

২৪ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অস্ত্র নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে আগত 'সোয়াত' জাহাজ থেকে বাঙালি শ্রমিকরা ওই অস্ত্র খালাসে অস্বীকৃতি জানালে পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বেধে যায়। শ্রমিকদের সঙ্গে স্থানীয় ছাত্র-জনতা যোগ দিয়ে জাহাজ থেকে অস্ত্র নামানোর স্থানে অবরোধ সৃষ্টি করে, পথে পথে ব্যারিকেড দিয়ে প্রতিরোধ ব্যূহ রচনা করা হয়। পাকিস্তানি বাহিনী বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর গুলি চালালে বহু মানুষ হতাহত হয়। এই ঘটনা দাবাগ্নির মতো ছড়িয়ে পড়লে চারদিক থেকে দলে দলে মানুষ বন্দর অভিমুখে ছুটে যেতে থাকে। এই অস্ত্র খালাসের জন্য চট্টগ্রাম সেনানিবাসের দায়িত্বে থাকা বাঙালি সেনা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে কৌশলে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। এই সংবাদ চাউর হয়ে পড়লে নানা জল্পনাকল্পনা শুরু হয়ে যায়।

এমনই এক চরম উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে ২৪ মার্চ আমি বাড়িতে কিছু না জানিয়ে পাঁচরিয়া দিঘির পাড় থেকে চট্টগ্রাম শহরে আসি। উদ্দেশ্য বন্দরে সংগ্রামী জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে সোয়াত জাহাজ প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণ এবং শহরের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। ২৪ মার্চ আমি শহরেই রাতযাপন করি। এর পরদিন তো ২৫ মার্চ। ঢাকায় ইয়াহিয়ার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আলোচনার শেষ দিন। আলোচনার ফলাফল কী হয়, তা জানার জন্য বাঙালি জাতির রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা। ভীতিকর চাপা উত্তেজনার মধ্যে শহরময় ছুটোছুটি করে কেটে গেল দিনটি। আমার সঙ্গে আমাদের পার্শ্ববর্তী মনসা গ্রামের ছাত্রনেতা মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরীও ছিলেন (বর্তমানে আমেরিকার বোস্টন অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা, পেশায় প্রকৌশলী)। ওদিকে ঢাকায় অপরাহ্নে ইয়াহিয়া খান গোপনে শহরে অবস্থিত প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যান। আলোচনা ভেঙে দিয়ে ইয়াহিয়ার পলায়নের এই সংবাদ চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ যখন পান, তখন দিবাবসানে রাত নেমে এসেছে। তারপর মধ্যযামে বাংলাদেশে পাকিস্তানিরা মানব ইতিহাসের বর্বরতম ও নৃশংসতম গণহত্যা শুরু করে। 'বাবর' জাহাজের অগ্নি উদ্গিরণ এবং প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দের বিভীষিকার মধ্যে ইউসুফ চৌধুরীসহ ওই রাতও অতিবাহিত করি শহরে। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন, রাতের শেষ প্রহরে চট্টগ্রামে এই ঘোষণা মাইকে এবং সাইক্লোস্টাইল কপি করে প্রচার ও বিতরণ শুরু হয়।

২৬ মার্চ পাকিস্তানি হানার সংবাদ জানাজানি হয়ে গেলে আমার পিতা নূর মুহম্মদ চৌধুরী সাহিত্যরত্ন উদ্বেগাকুল হয়ে চাচা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি নুর মোহাম্মদ চৌধুরীকে নিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় আমাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। ২৭ বা ২৮ মার্চ বিকেলে স্টেশন রোডে তারা আমাকে খুঁজে বের করেন। আমি রেস্টহাউস থেকে বেরিয়ে নিউমার্কেটের দিকে যাচ্ছিলাম। তাঁরা আমাকে জোর করে চাচার গাড়িতে উঠিয়ে একেবারে হুলাইনে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যান। তারপর আমি যাতে বাড়ি থেকে বের হতে না পারি, সেজন্য কঠোর নজরদারির মধ্যে রাখা হয়। আমার সব কাপড়চোপড় লুকিয়ে রাখা হয়। আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিই রাঙ্গুনিয়া পালিয়ে যাওয়ার এবং ঘর থেকে বের হওয়ার উপায় খুঁজতে থাকি। রাঙ্গুনিয়ার ইছামতী গ্রামে ছিল আমার শিক্ষক অধ্যাপক বিপ্রদাশ বড়ুয়ার বাড়ি। মার্চ শেষ হয়ে যায়। এপ্রিলের এক কি দুই তারিখে আমি পালানোর একটা সুযোগ পেয়ে যাই। সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে আমি একটা শার্ট খুঁজে পেতে সমর্থ হই এবং শার্টটি লুঙ্গির ভেতরে গুঁজে নিয়ে ওপরে একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে পুকুরপাড়ে যাওয়ার ভান করে ঘর থেকে বের হই। আমাদের বাড়ির সামনে জোড়া পুকুর। প্রথম পুকুর পার হয়ে আমি দ্বিতীয় পুকুরের পাড় ধরে হাঁটতে থাকি। সেই পুকুরের পশ্চিম পাড় দিয়ে উত্তর দিকে আমাদের পাড়া থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ। পাড়া পার হয়ে আমি লুঙ্গির ভেতর থেকে শার্টটা বের করে গায়ে দিই এবং জোরে জোরে হেঁটে আমাদের গ্রামের ত্রিসীমানা পেরিয়ে যাই। আমি হাবিলাসদ্বীপ গ্রাম ও সেই গ্রামের উত্তর পাশ দিয়ে পূর্ব-পশ্চিম বয়ে যাওয়া খাল পার হয়ে বোয়ালখালী থানায় প্রবেশ করি। আমার গন্তব্য ছিল বোয়ালখালী থানার কানুনগোপাড়া গ্রাম। সেখানে ছিল মরিয়ম ফুপুর বাড়ি। তাঁর ছেলে আলম, হায়দারের সঙ্গে ছিল আমার ভীষণ ভাব। ফুপুর বাড়িতে একরাত থেকে আমি ফুপাতো ভাই আলমের কাছ থেকে সাম্পান ভাড়া নিয়ে তার সাহায্যে কর্ণফুলি নদী পার হই। তাদের বাড়ির কাছেই ছিল নদী। ইতঃপূর্বে আমি কখনো রাঙ্গুনিয়া যাইনি। আলম আমাকে রাঙ্গুনিয়ার পথঘাট বাতলে দেয়। আমি নদী পার হয়ে

> যেটুকু মর্ম উদ্ধার করা গেল, তাতে বুঝতে পারলাম, রাউজান থেকে ফজলুল কাদের চৌধুরী দলবল নিয়ে জয় বাংলার লোকদের খুঁজতে বেরিয়েছে। 'তারা এদিকেও আসতে পারে এবং এসে যদি জানতে পারে আমরা তোমাদের আশ্রয় দিয়েছি, তাহলে আমাদের মেরে ফেলবে।'

খুঁজে খুঁজে ইছামতীতে বিপ্রদাশ স্যারের বাড়িতে পৌঁছে যাই। তিনি আমাকে দেখে অবাক হয়ে যান, আবার খুশিও হন। রাঙ্গুনিয়া তখনও মুক্ত এলাকা। বিপ্রদাশ স্যার শুধু আমার শিক্ষকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমার ফ্রেন্ডস গাইড ফিলোসফার। আমি আজ যা হয়েছি বা হতে সক্ষম হয়েছি, মনুষ্যত্বের তৌলে আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবন যদি কিঞ্চিৎ মূল্যপ্রাপ্তির হকদার হয়, তাহলে এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব বিপ্রদাশ স্যারের।

উনসত্তরে চরকানাই হাইস্কুল থেকে এসএসসি পাস করে যখন উচ্চ মাধ্যমিকে অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হলাম নবপ্রতিষ্ঠিত হুলাইন ছালেহ-নূর কলেজে; তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্ত একদল তরতাজা যুবক তাঁদের শিক্ষকতা জীবনের নবিশি করতে এসে জুটলেন সেই কলেজে। অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দিলেন শিক্ষাভিজ্ঞ প্রবীণ জেএল দে ও উপাধ্যক্ষ বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য। বাংলায় অধ্যাপক বিপ্রদাশ বড়ুয়া, যুক্তিবিদ্যায় অধ্যাপক আকবর আহমদ, অর্থনীতিতে অধ্যাপক আওরঙ্গজেব চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাসে অধ্যাপক আনোয়ার পাশা, পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপক দিলীপ চৌধুরী (তাঁর পদবি সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই। দিলীপ বাবু মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন), রসায়নে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। আমি যদিও মানবিকের ছাত্র ছিলাম, তথাপি সব বিভাগের, সব শ্রেণির শিক্ষকের স্নেহ ও ভালোবাসায় সিক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। তবে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিলাম বিপ্রদাশ স্যারের। তিনি থাকতেন পাঁচরিয়া দিঘির পশ্চিম পাড়ে তাঁর মামা অশ্বিনি মাস্টারের বাড়িতে। মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ওই বাড়িতে ছিল আমার নিত্য যাতায়াত। অশ্বিনী বাবু কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক এবং তাঁর ছেলে মুক্তিমান বড়ুয়া তখন ছাত্র ইউনিয়নের নেতা। ফলে বিপ্রদাশ স্যারের আগমনের পূর্ব থেকেই বাড়িটিতে প্রগতিশীল রাজনীতি ও সংস্কৃতিচর্চার মুক্ত হাওয়া বিরাজমান ছিল। বিপ্রদাশ স্যার আসার পর যেন ষোলোকলা পূর্ণ হলো। মাটির ঘরের দোতলায় স্যারের কক্ষে, যার দরজার ওপরে লেখা ছিল সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটি কবিতার লাইন 'সহে না সহে না জনতার জঘন্য মিতালী', সেই কক্ষে আশ্চর্য বিপ্রতীপে দিনের পর দিন সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, বিজ্ঞানের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা ও তর্কবিতর্কে সময় কোথা দিয়ে অধিক রাত অবধি গড়িয়ে যেত, তা টেরই পাওয়া যেত না। কত রঙিন স্বপ্নের জাল বোনা সেসব দিন। কোনো কোনোদিন আলোচনায় যোগ দিতেন স্বদেশ বাবু, ওই গ্রামেরই এক অগ্রসর মানুষ। বিপ্রদাশ স্যারের সংস্পর্শে এসে হঠাৎ আমার মনের জানালাটা খুলে গিয়েছিল। হুলাইন গ্রামের গণ্ডিতে বাঁধা পাঠ্যপুস্তকে ঠাসা আমার চিন্তাভাবনার ক্ষুদ্র জগৎটা হঠাৎ প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে বড়ো হতে শুরু করেছিল। পুরোনো বিশ্বাস, মূল্যবোধ, ধ্যানধারণা, সংস্কারের পাঁচিল ভেঙে পড়তে পড়তে একদিন আমি নিজেকে নতুন রূপে আবিষ্কার করেছিলাম। মার্কস, এঙ্গেলস, হেগেল, ডারউইন, ফ্রয়েড, নিটশে, কিয়ের্কেগার্ড, টলস্টয়, দস্তয়েভস্কি, পুশকিন, নেরুদা, খৈয়াম, সাদী, হাফিজ, রুমী, বালজাক, মঁপাসা, চেখভ, কাফকা, হুগো, পিকাসো, মিকেলেঞ্জেলো, ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও, মাইকেল ও ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, সার্ত্রে, রাসেল, দেকার্তে, সত্যজিৎ রায়– প্রভৃতি নাম ও তাঁদের সৃষ্টিকর্মের কথা তাঁর মুখেই প্রথম শুনি। ইউরোপীয় রেনেসাঁ, ফরাসি বিপ্লব, আধুনিক কবিতার কথা, গ্রিক ট্র্যাজেডির আলোচনা শুনতে শুনতে; বোদলেয়র, টিএস এলিয়ট, এজরা পাউন্ড, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, অচিন্ত্যকুমার, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন, সুকান্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, সিকান্দর আবু জাফর, হাসান হাফিজুর রহমান, শহীদ কাদরী, ফজল শাহাবুদ্দিন, বিভূতি-মানিক-তারাশঙ্কর-সমরেশ– এমনই অজস্র নাম, তাঁদের সাহিত্যাদর্শে গড়ে ওঠে আমার সাহিত্য রুচি। বিপ্রদাশ স্যার এ সময় আমার যে মন তৈরি করেন, সেই মন ও প্রাণের টানেই আমি মুক্তিযুদ্ধের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে অনার্সে ভর্তি হই।

একাত্তরের এপ্রিলের শুরুতে রাঙ্গুনিয়ার ইছামতী গ্রামে বিপ্রদাশ স্যারের বাড়িতে পৌঁছার পর গুরু-শিষ্য আলোচনায় বসে গেলাম কী করা যায়, সেটা স্থির করার জন্য। আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিলেন স্যারের ভগ্নিপতি বি কে বড়ুয়া। তিনি সিডিএ'র কর্মকর্তা ছিলেন। স্বাধীনতার বহু বছর পর এস্টেট অফিসার হিসেবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। দেশের খ্যাতিমান ব্যান্ডসংগীত-তারকা পার্থ বড়ুয়া তাঁর কীর্তিমান পুত্র। অনেক আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হলো আমরা রামগড় দিয়ে সীমান্ত পার হয়ে ভারত যাব। স্যারের এক প্রতিবেশী, পায়ের অসুখের জন্য যিনি খুঁড়িয়ে হাঁটতেন, তাঁর নামটা আমি মনে করতে পারছি না, তিনিও আমাদের সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু যেদিন আমার রওয়ানা হব, সেদিন কাপ্তাই রাস্তায় পাকিস্তানি সেনা টহল থাকায় তিনি যেতে চাইলেন না। রুগ্‌ণ পা নিয়ে দৌড়াতে পারবেন না ভেবেই হয়তো তিনি পিছিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা পিছিয়ে যাওয়াটা সমীচীন মনে করলাম না। তাই পূর্বনির্ধারিত দিনেই আমরা ইছাখালী সেতুর কাছাকাছি কোনো এক জায়গা দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যবোঝাই সাঁজোয়া যান চলাচলের ফাঁকে সুযোগ বুঝে ত্রস্তে কাপ্তাই রাস্তা পার হয়ে পাহাড়ি পথে রামগড় অভিমুখে যাত্রা করলাম। জোরে হেঁটেও আমাদের পক্ষে বেশিদূর যাওয়া সম্ভব হয়নি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সত্যিই পথ চলা দুষ্কর হয়ে পড়ে। এক জায়গায় পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে একটি সমতল উপত্যকার সৃষ্টি করেছে। সেখানে দেখতে পেলাম একটি মাচায় একটি আদিবাসী পরিবারের বসবাস। আশান্বিত হয়ে উঠলাম এই ভেবে যে, সেখানে হয়তো রাতটুকু কাটানোর জন্য মাথা গোঁজার ঠাঁই পাব। কিন্তু না, আমরা যখন সেই মাচায় উঠতে যাব, তখনই বাধাপ্রাপ্ত হলাম। মাচা ঘর থেকে দু-তিনজন নারী-পুরুষ আমাদের দিকে দা নিয়ে তেড়ে এসে বলল, কী চাই। আমরা বললাম, আমরা রামগড় যাচ্ছি, রাত হয়ে গেছে, আর তো যাওয়া যাচ্ছে না। রাতের জন্য একটু আশ্রয় চাই। জবাবে তারা যা বলল, তাতে আমরা আরও ভয় পেয়ে গেলাম। তারা বলল, 'তোমাদেরকে থাকতে দিলে বাঙালিরা আমাদের মেরে ফেলবে।' বাঙালি মানে তারা মুসলমানদের বোঝাতে চাইল। ভালো করে তারা বাংলায় কথা বলতে পারছিল না। যেটুকু মর্ম উদ্ধার করা গেল, তাতে বুঝতে পারলাম, রাউজান থেকে ফজলুল কাদের চৌধুরী দলবল নিয়ে জয় বাংলার লোকদের খুঁজতে বেরিয়েছে। 'তারা এদিকেও আসতে পারে এবং এসে যদি জানতে পারে আমরা তোমাদের আশ্রয় দিয়েছি, তাহলে আমাদের মেরে ফেলবে।' এরপর আর কথা চলে না। তবুও তারা দয়াপরবশ হয়ে বলল, 'তোমরা ইচ্ছা করলে আমাদের গোয়ালে থাকতে পার।' চারটে খেতেও দিল। খেয়ে-দেয়ে আমরা গোয়ালে ঢুকলাম এবং পশুর মলমূত্রের দুর্গন্ধের মধ্যে রাত কাটাতে গিয়ে এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম, যাক অন্তত পৈতৃক প্রাণটা তো রক্ষা পেল। গোয়ালের এক পাশে গরু-ছাগল আরেক পাশে আমরা, কোনোমতে বসার ব্যবস্থা করে নিলাম। সেই অজ্ঞাত স্থানের গোয়ালে সে রাতে যে দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল, তা এরকম– সারারাত গরু, ছাগলগুলো মলমূত্র ত্যাগ করে গেল। আর তার দুঃসহ দুর্গন্ধের মধ্যে আমরা গল্প করছি। ঘোরের মধ্যে কখন রাত কেটে গিয়েছিল, টেরই পাইনি। সকালে আবার আমাদের ক্লান্তিহীন পথচলা শুরু হলো। পথে পড়ল মানিকছড়ি, সেখানে রাজবাড়ীর আতিথ্য গ্রহণ করে সন্ধ্যায় রামগড় পৌঁছলাম। সেখানে চট্টগ্রামের প্রখ্যাত ছাত্রনেতা এসএম ইউসুফের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি আমার পার্শ্ববর্তী মনসা গ্রামের বাসিন্দা। তাছাড়া তিনি আমার রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু, আমি তাঁর ভাবশিষ্য। আমি চরকানাই হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে ছাত্ররাজনীতিতে যুক্ত হই এবং অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী ছিলাম। এসএম ইউসুফের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নবম শ্রেণি থেকে ছাত্রলীগের কর্মী হয়ে যাই। সেই এসএম ইউসুফকে রামগড় দেখতে

পেয়ে আমার এমন ভাব হলো, আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, নাসির তুমি এসে ভালোই করেছ। যাও, ভারতে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে এসো। আমি বললাম, ইউসুফ ভাই আমিও মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতেই এসেছি। বেশি কথা বলার সুযোগ পেলাম না। কারণ সেদিনই একটা গ্রুপ ট্রেনিংয়ের জন্য ভারতে যাচ্ছিল। সেখানে আবার মনসার ইউসুফ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হলো, আমি যেখানে ট্রেনিং নিই, তিনিও সেখান থেকে ট্রেনিং নেন। ইউসুফ ভাইয়ের সুপারিশে আমি সেই গ্রুপের সদস্য হলাম। স্যারের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলাম। তিনি বললেন, যাও, তুমি অস্ত্রের সৈনিক হও, আমি শব্দসৈনিক হব। এই বলে তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দিতে গেলেন। আমি অস্ত্র ও ট্রেনিংয়ের জন্য ভারত গেলাম।

অতঃপর আমি আমার গ্রুপের সঙ্গে একত্রিত হলাম। মেজর জিয়াউর রহমান সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং দিয়ে আমাদের ফেনী নদীতে নামিয়ে দিলেন। নামমাত্র নদী, শুকিয়ে সেটি তখন একটি খালে পরিণত হয়েছে। আমরা হেঁটে একই সঙ্গে খাল এবং সীমান্ত পার হয়ে ভারতের মাটিতে পা রাখলাম। সেই জায়গাটার নাম সাব্রুম। সেখানে পৌঁছে শুনলাম, সহপাঠী আমাদের গ্রামের আসলাম, রফিক আমার আগে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য ভারতে এসেছে। তাদের কমান্ডার পটিয়া থানায় করনখাইন গ্রামের অধ্যাপক শামসুল ইসলাম। তারা ট্রেনিং শেষ করে ফিরে আসছিল। সীমান্তে তাদের সঙ্গে দেখাও হলো। আমাদের প্রথমে বগাফা নামে একটি স্থানে ট্রেনিংয়ের জন্য নেওয়া হলো। সেটি ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) ট্রেনিং সেন্টার। সেখানে ১৫ দিনের ট্রেনিং নিয়েছিলাম। রাইফেল, পিস্তল/রিভলভার, গ্রেনেড, স্টেনগান, এসএলআর, এসএমজি চালনা এবং বিস্ফোরক তৈরি ও ব্যবহার শিখেছিলাম সেখানে। সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং শেষে আমাদের ৭ জনকে রেখে অন্যদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়। বলা হলো, আমরা স্পেশাল ট্রেনিংয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছি। স্পেশাল ট্রেনিং মানে মিডিয়াম মেশিনগান ও ৩ ইঞ্চি মর্টার চালনা শেখা। ৭ জনের মধ্যে ছিলাম: আমি, শাহ আলাম (পরবর্তীকালে নেভাল কমান্ডোদের নেতৃত্ব দিয়ে নৌ অপারেশনে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য বীরউত্তম খেতাব পান। স্বাধীনতার বেশ ক'বছর পর দুরারোগ্য কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। তাঁর নামে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে একটি মিলনায়তন রয়েছে), আবুল কালাম আজাদ (সীতাকুণ্ড– তিনি একজন ত্যাগী রাজনৈতিক নেতা, স্বাধীনতার বহু আগে থেকে নিউক্লিয়াসের সদস্য হয়ে স্বাধীনতার জন্য গোপনে অনেক কাজ করেন। স্বাধীনতার অনেক পরে তিনি সীতাকুণ্ড পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন, বর্তমানে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে বসবাস করেন), আবুল কাশেম চিশতি (রাঙ্গুনিয়া), মাহবুব (তিনি পরে ৮নং এফএফ গ্রুপের কমান্ডার নিযুক্ত হয়ে শহরে গেরিলাযুদ্ধ করেন-ঘাটফরহাদবেগ), রণবিক্রম ত্রিপুরা (খাগড়াছড়ি, এই সাহসীযোদ্ধা পরে অপারেশন ঈগলের কলাম কমান্ডার হয়ে যুদ্ধ করতে করতে বিজয়ীর বেশে দেশে প্রবেশ করেন), মনসুর উল আমিন বাবলু (পরে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন)। আমাদের অম্পিনগর নামে একটি স্থানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে স্পেশাল ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠানো হয়। সেখানে আরও পক্ষকাল (এক মাসও হতে পারে, এখন আমার সঠিক মনে নেই) ট্রেনিংয়ের পর আমাদের ত্রিপুরার হরিণা ক্যাম্পে পাঠানো হয়। ভারতের ছয় মাইল অভ্যন্তরে এই স্থানটি ছিল মুক্তিবাহিনীর মূল বেইজ ক্যাম্প এবং ১নং সেক্টর হেডকোয়ার্টার। এখানে পরিচিত অনেকের সঙ্গে দেখা হলো এবং নতুন করে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হলো। পৌঁছার দু-একদিন পর ১নং সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়া আমাদের অপারেশনের জন্য তৈরি হতে বললেন। তিনি আমাদের একরাতে বিএসএফের নালুয়া বর্ডার আউট পোস্টে নিয়ে গেলেন, সঙ্গে বিএলএফের ক্যাপ্টেন ঘোষ। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, বাংলাদেশ সীমান্তের খুব কাছে রয়েছি আমরা। অদূরে একটি ছোটো নদী দেখা যাচ্ছে, তার ওপর একটি ব্রিজ। মেজর জিয়া বললেন, ওটি শুভপুর ব্রিজ। ওই ব্রিজ ধ্বংস করতে হবে, সেজন্য রেকি করতে আসা। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে থেকে আমরা ব্রিজে কীভাবে যাব এবং কীভাবে এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে কোন পথে ফিরে আসব, সেসব এবং অপারেশন পরিকল্পনার খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনার পর আমরা আবার মেজর জিয়ার সঙ্গে হরিণা ফিরে এলাম। সেসময় ব্রিজে খুব কড়া পাহারা থাকায় মেজর জিয়া ও ক্যাপ্টেন ঘোষ আলোচনা করে তখন ব্রিজ ধ্বংসের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হওয়া সমীচীন হবে না মনে করে অপারেশনের পরিকল্পনা স্থগিত করেন।

সেই জায়গাটার নাম সাব্রুম। সেখানে পৌঁছে শুনলাম, সহপাঠী আমাদের গ্রামের আসলাম, রফিক আমার আগে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য ভারতে এসেছে। তাদের কমান্ডার পটিয়া থানায় করনখাইন গ্রামের অধ্যাপক শামসুল ইসলাম

এ ঘটনার দু-তিনদিন পর কর্নেল (অব.) রব হরিণা ক্যাম্পে এলেন। তিনি তখন বাংলাদেশ বাহিনীর চিফ অব স্টাফ। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, তিনি অফিসার পদে লোক রিক্রুট করতে এসেছেন। আমি যোগ দিতে চাইলাম। একদিন আগ্রহী প্রার্থীদের ইন্টারভিউতে ডাকা হলো। শওকত, ওয়ালি এ সময়ই কমিশনপ্রাপ্ত হয়। আমার পালা যখন এলো, তখন কর্নেল রব জানতে চাইলেন আমার পড়াশোনা কদ্দূর? যখন বললাম আমি এইচএসসি পরীক্ষার্থী, তখন তিনি বললেন,

আমরা তো ন্যূনতম এইচএসসি পাস না হলে এখন নিচ্ছি না। পরে যদি নতুন সিদ্ধান্ত হয়, তখন তোমার বিষয়টা বিবেচনা করে দেখব। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসার হতে না পেরে মনে দুঃখ পেয়েছিলাম; কিন্তু তখন আমার আর কিই বা করার ছিল।

হরিণায় আবার ইউসুফ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি বললেন, পলিটিক্যালি মোটিভেটেড একটি গেরিলাবাহিনী গঠন করা হচ্ছে। শুধু ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরাই এ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। বাহিনীর নাম বেঙ্গল লিবারেশন ফোর্স বা বিএলএফ। এটিই বহুল আলোচিত মুজিববাহিনী। ইউসুফ ভাই বললেন, নাসির, তুমি এই প্রশিক্ষণটা নিয়ে বিএলএফ সদস্য হিসেবে দেশে ফিরে যাও। ভারতের উত্তর প্রদেশের টানডুয়া ও আসামের হাফলং (বর্তমানে মিজোরাম) এ দুই জায়গায় ট্রেনিং হচ্ছে। তোমাকে টানডুয়া পাঠানোর ইচ্ছা ছিল; কিন্তু এখন সেখানে কোনো গ্রুপ যাচ্ছে না। হাফলংয়ে একটি ব্যাচ যাচ্ছে। টানডুয়ার জন্য অপেক্ষা করে সময় নষ্ট না করে তুমি হাফলং চলে যাও। তিনি আমার অভিভাবকতুল্য। তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে এবার বিএলএফ ট্রেনিংয়ের জন্য আসামের হাফলং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গেলাম। সেখানে এক মাস প্রশিক্ষণ নিই। বিএলএফের চার শীর্ষ কমান্ডারের মধ্যে তিনজন, শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান ও তোফায়েল আহমেদ টানদুয়ায় সামরিক প্রশিক্ষণ নেন ও বিএলএফ সদস্যদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দেন। একজন কমান্ডার আবদুর রাজ্জাক হাফলং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ছিলেন। আমি যখন সেখানে পৌঁছি, তখন চোখ ওঠা রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ করেছিলাম।

যা-ই হোক, হাফলং থেকে ট্রেনিং নিয়ে হরিণা ফিরে আসি। এবার আমার দেশে ফেরার পালা। কর্ণফুলির দক্ষিণাঞ্চলের পাঁচ থানা পটিয়া, বোয়ালখালী, আনোয়ারা, সাতকানিয়া ও বাঁশখালী থানায় কাজ করার জন্য আমাদের ৬ জনকে নিয়ে একটি টিম গঠন করা হলো। কমান্ডার নির্বাচিত হলেন শোভনদণ্ডীর নুরুল আনোয়ার (মুক্তিযুদ্ধে শহিদ), ডেপুটি কমান্ডার নির্বাচিত হলেন আনোয়ারার ইদ্রিস আনোয়ারি (মুক্তিযুদ্ধে শহিদ)। বাকি চার সদস্যের মধ্যে একজন আমি, আর তিনজনের মধ্যে একজনের নামই আমার মনে আছে। তার নাম অজিত, বাড়ি পটিয়ায় (বর্তমানে চন্দনাইশ)। অজিত স্বাধীনতার পর হাজারি গলিতে একটি দোকান খুলেছিল। অনেক পরে, সম্ভবত নব্বইয়ের দশকে সে দুষ্কৃতকারীদের হাতে নিহত হয় বলে শুনেছি।

ইন্ডাকশন অর্থাৎ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের আগে মনি ভাই (শেখ ফজলুল হক মনি) আমাদের ব্রিফিং দেন। মান্নান ভাইও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বৈষ্ণবপুর নামক একটি স্থান দিয়ে আমরা ফেনী নদী পার হয়ে অধিকৃত বাংলাদেশে প্রবেশ করি। আমাদের বৈষ্ণবপুর সীমান্তে নিয়ে গিয়েছিলেন স্বপনদা, সঙ্গে ছাবের ভাইও ছিলেন। সম্ভবত চট্টগ্রাম কলেজের ভিপি জালাল ভাইও ছিলেন। ছাবের ভাই না স্বপনদা গাড়ি ড্রাইভ করছিলেন, সেটা এখন মনে পড়ছে না। ফেরার পথে ফেনী নদীর আরেক রূপ দেখলাম। যাওয়ার সময়ে দেখেছিলাম মরা নদী, এখন দেখছি ভরা নদী। ফুলে-ফেঁপে ওঠা নদীর পানি দুকূল উপচে পড়ার উপক্রম। নৌকায় পার হতে হলো। আমাদের সঙ্গে সমগ্র চট্টগ্রামের একশজনের একটি গ্রুপ ছিল। কম্বাইন্ড গ্রুপের কমান্ডার ছিলেন সম্ভবত মাদার্শার ইদ্রিস ভাই (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত ছাত্রনেতা-প্রয়াত)। রাঙ্গুনিয়ার বিএলএফ কমান্ডার নুরুল আলমের গ্রুপও (পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক) আমাদের সঙ্গে দেশে প্রবেশ করে। হাটহাজারীর জামাল ভাই (এসএম জামালউদ্দিন), আফসার ভাই (নুরুল আফসার, পরে খাদ্য ও চিনিশিল্প সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা-প্রয়াত), হাশেম ভাই (মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার ও বিজয় মেলা পরিষদের সাবেক মহাসচিব আবুল হাশেম) আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন। পথিমধ্যে আমরা দুজায়গায় পাকিস্তানি বাহিনীর অ্যামবুশের সম্মুখীন হই। এই খণ্ডযুদ্ধ ছিল আমাদের দীর্ঘ ট্রেনিংয়ের পরীক্ষা। আমরা সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। একটি যুদ্ধে রাঙ্গুনিয়ার আলম ভাইয়ের গ্রুপের আমিন শরিফ খুব সাহসিকতা প্রদর্শন করেছিল। তার কাছে এলএমজি ছিল। আমাদের একজন সহযোদ্ধা প্রাণ হারান। মনে পড়ছে ফটিকছড়ির খিরাম পাহাড়ে আমরা সাময়িক যাত্রাবিরতি করেছিলাম। অস্ত্র, গুলি, বিস্ফোরকের বোঝা মাথায় বহন করে সাঁতরে হালদা নদী পার হয়েছিলাম। রাউজানেও আমরা একটি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলাম। যুদ্ধের স্থান মনে নেই, স্মৃতি প্রতারণা করছে, তাই বিবরণও দিতে পারছি না। সাম্পানে কর্ণফুলি পার হয়ে বোয়ালখালীর জ্যৈষ্ঠপুরায় আবুল হোসেনের শেল্টারে একদিন যাত্রাবিরতির পর আবার বোয়ালখালীর পূর্বপ্রান্তে পাহাড়ের পাদদেশে বোয়ালখালী ও পটিয়ার উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত পাহাড়ি পথ ধরে দীর্ঘ যাত্রা। পটিয়ায় থানার শোভনদণ্ডী গ্রামে পৌঁছে সেই পথচলার বিরতি। আনোয়ার আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এ সময় এমএ জাফর যোগ দিলেন আমাদের গ্রুপে। তিনি শোভনদণ্ডীরই বাসিন্দা, আনোয়ারের বন্ধু। জাফর স্বাধীনতার পর প্রথমে ছাত্রলীগ ও পরে পটিয়া থানা ও দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের নেতা হন। তিনি এখনও আওয়ামী লীগই করেন।

শোভনদণ্ডী থেকে আমরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ি। ইদ্রিস আনোয়ারি চলে যান আনোয়ারায় তার বাড়িতে, আমি পশ্চিম পটিয়ায় আমার বাড়িতে, অজিত এবং অন্যরাও নিজ নিজ বাড়িতে চলে গেল।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি রাজনৈতিক যুদ্ধ। রাজনৈতিক সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতিতে এই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। সশস্ত্র যুদ্ধ হলেও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দই ছিলেন এই যুদ্ধের পরিচালক, নীতিনির্ধারক ও নিয়ন্ত্রক। যুদ্ধের এই রাজনৈতিক দিকটি যাতে মুক্তিযোদ্ধারা বিস্মৃত না হন, সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য আমাদের ভেতরে পাঠানো হয়েছিল। তাই যুদ্ধ করার পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পলিটিক্যাল মোটিভেশনের একটি বাড়তি দায়িত্ব আমাদের ওপর পড়েছিল।

দক্ষিণ চট্টগ্রামে তখন দুটি বৃহৎ গেরিলা গ্রুপ মুক্তিযুদ্ধ করছিল। একটির নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন করিম, আরেকটির কমান্ডার ছিলেন সার্জেন্ট আলম। দুটি গ্রুপের অধীনেই একাধিক উপগ্রুপ যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল। করিম গ্রুপের গেরিলা তৎপরতা রাউজান, রাঙ্গুনিয়া, বোয়ালখালী, পটিয়া, আনোয়ারায় বিস্তৃত ছিল। ক্যাপ্টেন করিম শহরেও অপারেশন করেন। সার্জেন্ট আলম গ্রুপের গেরিলা তৎপরতা বোয়ালখালী, পটিয়া, আনোয়ারা ও বাঁশখালীতে বিস্তৃত ছিল। পটিয়া থানার বরকলে ছিল এই গ্রুপের প্রধান ঘাঁটি। বলা যায়, শাহজাহান ইসলামাবাদীর বাড়িকে কেন্দ্র করে বরকল, বরমা ও কানাইমাদারি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল মুক্তাঞ্চল। সার্জেন্ট আলম ছিলেন গ্রুপের অপারেশনাল কমান্ডার। প্রধান সংগঠক তথা রাজনৈতিক কমিশনার ছিলেন শাহজাহান ইসলামাবাদী ও মুরিদুল আলম। সার্জেন্ট আলম গ্রুপে যারা অপারেশনে কমান্ড করতেন তারা হলেন হাবিলদার আবু, হাবিলদার হাবিব, মহসিন খান ও শহীদ সবুর।

করিম গ্রুপে কমান্ড করতেন অধ্যাপক শামসুল ইসলাম, জাকের আহমদ ও আ হ ম নাসিরউদ্দিন। অধ্যাপক শামসুল ইসলাম, আহমদ শরীফ মনীর, আহমদ হোসেন পোস্টমাস্টার, ডা. শামসুল আলমকে এই গ্রুপের রাজনৈতিক কমিশনার বলা যেতে পারে।

করিম ও আলম দুই গ্রুপের সঙ্গেই আমি যোগাযোগ রেখে কাজ করার চেষ্টা করি। তবে শেষ পর্যন্ত আলম গ্রুপের সঙ্গেই অপারেশনে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হই। যেহেতু আমাদের বিএলএফ গ্রুপটা ভেঙে গিয়েছিল, তাই যুদ্ধ করার জন্য সেসময় দক্ষিণ চট্টগ্রামে যুদ্ধরত কোনো না কোনো গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করা ছাড়া আমার উপায় ছিল না। হাবিলদার আবুর সঙ্গে ওষখাইনে একটি অপারেশনে যাই। সেখানে টিক্কা খান নামে খ্যাতি পাওয়া একজন কুখ্যাত শান্তিবাহিনী তথা রাজাকার কমান্ডারকে হত্যা করার জন্য আবু সেই অপারেশন চালিয়েছিলেন। আনোয়ারা থানা অপারেশন ছিল দক্ষিণ চট্টগ্রামের মুক্তিযুদ্ধের খুব বড়ো একটি অপারেশন। সার্জেন্ট আলমের অধিনায়কত্বে অনেকগুলো গ্রুপ এই অপারেশনে অংশ নিয়েছিল। আমি

সেসময় বরকল থাকায় ওই অপারেশনে অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলাম। মহসিন খানের সঙ্গেও একটি অপারেশনে ছিলাম; কিন্তু কোথায়, সেটি এখন মনে করতে পারছি না।

আনোয়ারা থানা অপারেশনের পর আমি শহরে চলে আসি। শহরে পাথরঘাটায় শামসুল আলমের বাড়িতে একটি শেল্টার ছিল। শামসুল আলম হুলাইন গ্রামের দেলোয়ার হোসেন চৌধুরীর খালাতো ভাই। সেই সূত্রে যোগাযোগটা হয়। সেই বাসায় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতা রেজাউল হক মুশতাকের সঙ্গে আমার দেখা হয়। পরে আমি ঘাটফরহাদবেগে মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু এসএম মাহবুব উল আলমের বাসায় যাই। মাহবুব হরিণা থেকে এফএফের ৮নং গ্রুপের কমান্ডার নিযুক্ত হয়ে শহরে অপারেশন করছিল। মাহবুব ও আমি একসঙ্গে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বগাফা বিএসএফ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ট্রেনিং নিই, সেকথা আগেই বলেছি। মাহবুবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দু-তিনটি অপারেশনে অংশ নিই। একটি অপারেশন ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। ঈদের একদিন কী দুদিন আগে মাহবুব আর আমি অপারেশনটা করেছিলাম। মাহবুব ছিল অপারেশনের কমান্ডার। অপারেশনের তারিখ ১৮ নভেম্বর ১৯৭১।

চট্টগ্রাম শহরের মুক্তিযুদ্ধের একটি উল্লেখযোগ্য অপারেশন হলো চন্দনপুরা রাজাকার ক্যাম্প অপারেশন। এই অপারেশনটি করেছিলাম ৮নং এফএফ গ্রুপ কমান্ডার মাহবুব আর আমি।

মসজিদে মাইকের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ঘোষণা প্রচার করতে থাকে। চন্দনপুরার রাজাকার ক্যাম্পের রাজাকারদের অত্যাচার চরমে উঠলে সেদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এছাড়া প্রায় প্রতিদিন চন্দনপুরা অঞ্চল দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পটিয়া থেকে অস্ত্র আসত। রাজাকার বাহিনীর এ ক্যাম্পের কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র আনা-নেওয়ায় অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডাররা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এ অস্ত্র চট্টগ্রাম শহরে প্রবেশ করতে না পারলে অনেক অপারেশন বন্ধ হয়ে যাবে।

এ পরিস্থিতিতে চন্দনপুরা রাজাকার ক্যাম্প নিয়ে কী করা যায়, এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য বৈঠকে বসলেন ইঞ্জিনিয়ার আফছার উদ্দিন, মো. আলী ও কাজী ইনামুল হক দানু। তারা বৈঠক করে মাহবুবকে ডেকে নেন এবং সিদ্ধান্ত হয় যে অপারেশনটি পরিচালনা করবেন ৮নং এফএফ গ্রুপ কমান্ডার মাহবুব উল আলম। এই অপারেশনের জন্য মাহবুব পরদিন তার গ্রুপ নিয়ে আবার পৃথকভাবে গোপন বৈঠকে বসেন জয়নগর সেকান্দার আলীর বাসায়। বৈঠকে মাহবুবের সঙ্গে ছিলেন সেকান্দার আলী, শান্তনু চক্রবর্তী, মোহাম্মদ হোসেন (বাবুইয়া) ও শাহ আলম। তখন রমজান মাস এবং ঈদের দু-চারদিন আগে এ পরিকল্পনা হয়েছিল। কোন সময় কীভাবে অপারেশনটা করলে সুবিধা হবে, এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় তারা সিদ্ধান্ত নিলেন

এমতাবস্থায় তখন অপারেশন না করার পক্ষে সবাই মতামত দিয়েছিলেন। আমি মাহবুবকে বলেছিলাম কেউ না করলেও চল তুমি আর আমি অপারেশনটা করি। মাহবুব আমার কথায় রাজি হয়

একাত্তর সালের জুনে পূর্ব পাকিস্তানে রাজাকার অর্ডিন্যান্স '৭১ জারি হয়। এই অর্ডিন্যান্সের ক্ষমতাবলে ১৯৫৮ সালের আনসার অ্যাক্ট বাতিল ঘোষণা করা হয়। আনসার ও মুজাহিদ বাহিনীর বিপুলসংখ্যক সদস্য মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করার কারণে সরকার নতুন করে আইন জারি করতে বাধ্য হয়। সেই আইন হলো রাজাকার আইন। সেই আইনে পূর্ব পাকিস্তানের সব ব্যক্তিকে রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অস্ত্রে সজ্জিত করা হবে বলে ঘোষণা দিলে জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের উগ্রপন্থি হানাদার দোসররা রাজাকার বাহিনীর জন্ম দেয়। চট্টগ্রামে রাজাকার বাহিনীর নেতা হয় চট্টগ্রাম কলেজের ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি এনামুল হক মঞ্জু (চকরিয়া নিবাসী, স্বাধীনতার পর নব্বইয়ের দশকে সে চকরিয়া থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল)। তার তত্ত্বাবধানে চন্দনপুরায় একটি রাজাকার ক্যাম্প স্থাপিত হয়। এই ক্যাম্পের রাজাকাররা রাস্তায় একটি চেকপোস্ট বসিয়েছিল। শুধু চেকপোস্ট বসিয়ে তারা ক্ষান্ত হয়নি। রাস্তা থেকে সাধারণ মানুষকে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে তাদের টাকাপয়সা কেড়ে নিয়ে নিজেরা ভাগবাঁটোয়ারা করে নিত। অক্টোবরের প্রথমদিকে তারা চন্দনপুরা যে, ইফতারের সময় আক্রমণ হবে এবং মোহাম্মদ হোসেন বাবুইয়া অপারেশনে যাওয়ার জন্য ট্যাক্সি চালাবে।

আমি তখন মাহবুবের বাসায় ছিলাম। মাহবুবের কাছে অপারেশনের কথা শুনে বললাম, আমিও তোমার সঙ্গে অপারেশনে যাব। পরদিন মাহবুব আর আমি চকবাজারে সেকান্দরের শেল্টারে উঠলাম। সেখানে মাহবুব তাঁর অস্ত্র ৯ এমএম কার্বাইন ও ৪টা ম্যাগাজিন সেকান্দরকে দিলেন। আমাকেও একটা ৯ এমএম কার্বাইন সে দিল। সম্ভবত ঈদের পূর্বদিনই ১৮ নভেম্বর আমরা অপারেশনটি করেছিলাম। অপারেশনের আগে আমরা শান্তনুর বাসায় যাই। সেখানে শহরের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় এ কথা ওঠে আসে যে, ঈদের কারণে শহরে এখন কড়া পাহারা বসানো এবং বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সৈন্যরা টহল দিচ্ছে। এমতাবস্থায় তখন অপারেশন না করার পক্ষে সবাই মতামত দিয়েছিলেন। আমি মাহবুবকে বলেছিলাম কেউ না করলেও চল তুমি আর আমি অপারেশনটা করি। মাহবুব আমার কথায় রাজি হয়। মোহাম্মদ হোসেন বাবুইয়ার ট্যাক্সি করে আমরা রাজাকার ক্যাম্প আজম ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ আক্রমণ করার জন্য রওয়ানা

দিলাম। আমরা দুজনে সন্ধ্যা ৬টায় ইফতারের সময় এ ওয়ার্কশপে অতর্কিত আক্রমণ করি। আক্রমণের জন্য যে পরিকল্পনা স্থির হয়েছিল তাতে মাহবুব দরজা দিয়ে আক্রমণ ওপেন করবে আর আমি জানালায় দাঁড়িয়ে তাকে কাভার দেব। কিন্তু প্যারেড কোনায় ট্যাক্সি চলন্ত অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে আমরা যখন ওয়ার্কশপে পৌঁছে যার যার অবস্থান নিই, তখন দেখি মাহবুব দরজা দিয়ে ঢোকার সময় চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছে। আর সেটা দেখে ভেতর থেকে রাজাকাররা দাঁড়িয়ে তাকে ধরার জন্য দরজার দিকে ছুটে আসছে। আমি এ দৃশ্য দেখে একমুহূর্তও দেরি না করে আমার কার্বাইন থেকে ব্রাশফায়ার করে যখন নিশ্চিত হলাম যে, ভেতরে আর কেউ অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে নেই, তখন মাহবুবকে নিয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে ট্যাক্সিতে উঠে দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করে চলে আসি। পরদিন চট্টগ্রামের সংবাদপত্রে এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যে, চন্দনপুরায় দুষ্কৃতকারীদের হামলায় ৬/৭ জন নিহত হয়েছে।

মাহবুবের বাসা থেকে আমি কিছুদিনের জন্য আমার বাবা নুর মুহাম্মদ চৌধুরী সাহিত্যরত্নের কাছে আসি। আন্দরকিল্লাহ জামে মসজিদ থেকে পশ্চিমদিকে সিঁড়ি দিয়ে নজির আহমদ চৌধুরী রোডে নামার পর ঠিক বিপরীত দিকে বাবার একটি বইয়ের দোকান ছিল। দোকানের নাম ইউনাইটেড বুক স্টল। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষকদের একটি অফিস এবং চট্টগ্রামের লেখকদের আড্ডা ছিল। সেজন্য গুলিস্তান সাহিত্য মজলিশ ও চট্টগ্রাম লেখক সংঘের দুটি সাইনবোর্ডও ছিল। বাবার দোকানের পেছনে ছিল জামে মসজিদের মোহাদ্দেস সাহেবের বাড়ি। আমার বাবা তাদের ভাড়াটিয়া ছিলেন। যমুনা অয়েলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন, সমাজসেবী ও আন্দরকিল্লা ওয়ার্ডের সাবেক কমিশনার মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন এবং বর্তমানে চট্টগ্রাম সিটি করপোশেনের মেয়র, মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সিজেকেএস সাধারণ সম্পাদক ও আ জ ম নাছির উদ্দীন মোহাদ্দেস সাহেবের কৃতী প্রপৌত্র। নিরাপত্তার জন্য তাঁর দেউড়ির সামনের একটি ঘরের দোতলায় আমি কিছুদিন রাত্রিযাপন করি। সেই সময় আমার একটি ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়। সেটা হলো আলবদর বাহিনীর মৃত্যুপুরীতে আমাকে পক্ষকাল নরকবাস করতে হয়েছিল। তার আগে আলবদর বাহিনী ও তাদের হাতে আমার ধরা পড়ার কথা বলা দরকার।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দালাল জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘ আলবদর বাহিনী গঠন করার পর খুবই চালাকির সঙ্গে তাদের কিছু কর্মীকে ছাত্রলীগ কর্মী সাজিয়ে ভারতে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ট্রেনিংয়ে পাঠায়। এর মধ্যে সরাসরি আলবদর বাহিনীর সদস্যও ছিল। তেমনই এক আলবদর ক্যাডার, যার বাড়ি ছিল ফটিকছড়ি, সে আমাদের সঙ্গে ভারতে ট্রেনিং নেয়। কিন্তু কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারেনি। আমরা তো কিছুই জানতাম না, সরল বিশ্বাসে তাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গ্রহণ করি। কার সুপারিশে সে ট্রেনিংয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল, সেটাও তখন জানার চেষ্টা করিনি। কারণ তাকে তখন কেউ সন্দেহ করেনি।

নভেম্বরের শেষের কোনো একদিন দুপুরবেলা আমি আমার নজির আহমদ চৌধুরী রোডের হাইড আউট থেকে বের হয়ে রাস্তা ধরে দক্ষিণ দিকে হাঁটছি। তখন সেই রাস্তা যেখানে শেষ হয়ে টেলিগ্রাফ রোড নাম ধারণ করে নিচু হয়ে সিমেনা প্যালেসের দিকে নেমে গেছে, সেখানে মহামায়া ভবন দখল করে আলবদর বাহিনী যে তাদের ঘাঁটি করেছে, সেটা আমি জানতাম না। যাই হোক, আমার খেয়ালে আমি হাঁটছিলাম। হঠাৎ দেখি ভারতে ট্রেনিং সেন্টারে দেখা সেই ছেলে আমাকে ইশারা করছে। আমি তাকে দেখে খুব খুশি হলাম। কারণ একজন মুক্তিযোদ্ধার দেখা পেয়েছি। আমরা নিকটবর্তী একটি চায়ের দোকনে গিয়ে চা খেলাম। সে কথায় কথায় আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল তুমি কোথায় থাক। আমি সরল বিশ্বাসে আমার শেল্টার দেখিয়ে দিলাম। তাকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম তুমি কোথায় থাক। সে কোনো একটা জায়গার নাম বলেছিল। সেই রাতেই আমার ওপর বিপদ নেমে আসে। সে রাতেই আলবদর বাহিনী শেল্টার ঘেরাও করে এবং আমাকে ডালিম হোটেলে নিয়ে যায়। আমার হাত-চোখ বাঁধা। তারা মারতে মারতে আমাকে ডালিম হোটেলে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে একটি কক্ষের দরজা খুলে ধাক্কা দিয়ে আলবদর বাহিনী আমাকে ওই কক্ষের মধ্যে ফেলে দেয়। সেই কক্ষের একটি মাত্র দরজা, জানালা নেই। ভেন্টিলেশন ব্যবস্থাও নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকারে অনুভব করি কক্ষে আরও বন্দি রয়েছে। গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি করে আমাদের রাখা হয়েছিল। ঘরের কোনায় পায়খানা-প্রস্রাবের ব্যবস্থা। সেটি উপচে পড়ে মলমূত্র ঘরে ছড়িয়ে পড়ছিল। তার মধ্যেই আমাদের বসবাস। আর কিছুক্ষণ পরপর অন্য কক্ষে নিয়ে নির্যাতন চালানো হতো। নির্যাতন কক্ষ আলাদা ছিল। চারদিক থেকে শুধু নির্যাতিত ও মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের আর্তনাদ ভেসে আসছিল।

ডালিম হোটেল ছিল আলবদর বাহিনীর হেডকোয়ার্টার ও প্রধান নির্যাতন কেন্দ্র। আলবদর বাহিনীর কমান্ডার মীর কাসেম আলী সেখানেই বসত। এছাড়া আরও দুটি টর্চার সেল ছিল– একটি হলো নগরীর চাক্তাই চামড়ার গুদাম এবং অপরটি দেওয়ানহাটের দেওয়ান হোটেল। তবে হানাদার বাহিনীর প্রধান টর্চার সেল (সদর দপ্তর) ছিল চট্টগ্রামের সার্কিট হাউস। এছাড়া ফজলুল কাদের চৌধুরী ও সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরীর বাসভবন গুডস হিলও একটি নির্যাতন কেন্দ্র ছিল।

গুডস হিলে মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে নিয়ে নির্যাতন করা হতো, অনেককে হত্যা করা হয়। আমাকে নির্যাতন করা হয় ডালিম হোটেলে। সেখানে আমার ওপর এমন পৈশাচিক নির্যাতন চালানো হয়, যার অনেক কিছু প্রকাশ করার মতো নয়। যেমন কিল-ঘুসি, চড়-থাপ্পড়, লাঠিপেঠা, পা উপরে ছাদের বিমের সঙ্গে বেঁধে মাথা নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে লোহার রড দিয়ে পেটানো, শরীরে সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়াসহ নানা পদ্ধতিতে আলবদর বাহিনী নির্যাতন চালিয়েছে। আমার সহযোদ্ধাদেরও একইভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। অনেককে আলবদর বাহিনী মেরেও ফেলেছে।

একাত্তরের ১৪ ডিসেম্বর থেকে আলবদর বাহিনীর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। ১৬ ডিসেম্বর ডালিম হোটেলের পার্শ্ববর্তী হাজারী গলি থেকে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের আওয়াজ শোনা গেল। উৎফুল্ল জনতা ডালিম হোটেলের তালা ভেঙে আমাদের মুক্ত করে। তার আগে আলবদর বাহিনী পালিয়ে যায়। লোকজন আমাদের এই বলে মুক্ত করেন যে, আপনারা বেরিয়ে আসুন, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, আপনারা মুক্ত। আমরা বেরিয়ে আসি। নরক-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিই মুক্ত হাওয়ায়। মানুষের মধ্যে তখন বিজয়ের আনন্দ, ন'মাসের বিভীষিকাময় দুঃসহ জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। চারিদিক থেকে জাতির বিজয়ের আনন্দ-উল্লাস ভেসে আসছিল। থেকে থেকে শোনা যাচ্ছিল 'জয় বাংলা' ধ্বনি।

তথ্যসূত্র

১. (Gazetteer of Chittagong district (1908), L.S.S.O malley. P.76)
২. পদ্মিনীমোহন সেনগুপ্ত: দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (বঙ্গানুবাদ), ৪ জানুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ৪
৩. মোনায়েম সরকার (সম্পাদক): বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবন ও রাজনীতি (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮) পৃ. ৮৩
৪. ড. মোহাম্মদ হাননান: বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৬), পৃ. ৬২-৬৩
৫. শেখ মুজিবুর রহমান: অসমাপ্ত আত্মজীবনী (ঢাকা: ইউপিএল, ২০১২) পৃ. ৩১
৬. শেখ মুজিবুর রহমান: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক

মুক্তিযুদ্ধের কয়েকটি ঘটনা

স্বপন দাশ গুপ্ত

ছয়টি থানার সমন্বয়ে বিক্রমপুর তথা মুন্সিগঞ্জ জেলা গঠিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর সারাদেশের মতো বিক্রমপুরের প্রতিটি ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এই সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ছাত্র-যুবকরা বাঁশের লাঠি দিয়ে ট্রেনিং নিতে শুরু করেন। তৎকালীন আওয়ামী লীগের এমএনএ (জাতীয় পরিষদ সদস্য) এবং এমপি (প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য) থানা ও ট্রেজারির অস্ত্র লুট করে মুক্তিকামী ছাত্র-যুবকের মাঝে বণ্টন করেন। প্রাথমিক অবস্থায় ওই অস্ত্র দিয়ে বিক্রমপুরের ছাত্র-জনতা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু এই প্রতিরোধ দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। তবুও মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে এই প্রতিরোধ বিক্রমপুরবাসীকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেছে। বিক্রমপুরের মানুষ সব সময় আত্মবিশ্বাসী, সাহসী ও অকুতোভয়। এই সাহস ও আত্মবিশ্বাসই ব্রিটিশদের তাড়াতে সাহায্য করেছে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা কমিশনবিরোধী আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের একদফা আন্দোলন ও নির্বাচন– সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধে এই অঞ্চলের মানুষের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা।

২৫ মার্চের পর বন্ধুবান্ধবরা সিদ্ধান্ত নিলাম, আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেব। কিন্তু ট্রেনিংয়ের জন্য কীভাবে ভারত যাব এবং কোন পথে যাব, এ নিয়ে ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলাম

বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিক্রমপুরবাসীর ভালোবাসা ও স্বাধীনতার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে চাই, ঐতিহাসিক ৭ মার্চের রেসকোর্সের জনসভা শেষে ঢাকা থেকে বালিগাঁও ফিরে আসছিলাম আমরা দুই

বন্ধু– মোফাজ্জল ও আমি। সন্ধ্যার পর বেতকা লঞ্চঘাটে নামি, ঘুটঘুটে অন্ধকার। অন্ধকার রাতে বালিগাঁও (আমাদের গ্রামের নাম) যাব; কিন্তু কীভাবে যাব, এর কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তখন ঘড়িতে ৮টা বাজছিল। বেতকা প্রাইমারি স্কুলের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবছি, কীভাবে এই রাতে বাড়ি যাব। স্কুলের পাশে একটা বড়ো পুকুর। ওই পুকুরের পূর্ব পাড়ের কয়েকটি ঘরে তখনও আলো দেখা যাচ্ছিল। অনন্যোপায় হয়ে ওই বাড়ির গৃহকর্তার শরণাপন্ন হই। অনেক ডাকাডাকির পর একজন বয়স্ক লোক দরজা খুললেন। ওই ভদ্রলোককে সালাম দিয়ে বললাম, 'আমরা ছাত্রলীগ করি। বঙ্গবন্ধুর জনসভায় গিয়েছিলাম। বালিগাঁও যাব। একটা হারিকেন দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করতে পারেন কি না?' ভদ্রলোকের নাম এখন আর মনে নেই। তিনি আমাদের কথা শুনে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলেন। পরে বললেন, 'দেখি কী করা যায়।' বাড়ির ভেতরে নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে একটা হারিকেন নিয়ে তিনি বের হয়ে এলেন। বললেন, 'তোমরা বঙ্গবন্ধুর সৈনিক। তোমাদের সাহায্য করা মানে স্বাধীনতার জন্য কিছু কাজ করা।' অপরিচিত এই যুবককে এভাবে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসার কথা এখনো শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। মুক্তিযুদ্ধের সূচনামাত্রই শুধু নয়, মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে এভাবেই বিক্রমপুরবাসী মুক্তিযুদ্ধের পাশে দাঁড়িয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের আহার, বাসস্থানসহ সব ধরনের সহযোগিতা দিয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় তৎকালীন মহকুমা শহর মুন্সিগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজের ডিগ্রির ছাত্র আমি। অসহযোগ আন্দোলনের কারণে কলেজ বন্ধ হওয়ায় একাত্তরের মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে মুন্সিগঞ্জ থেকে গ্রামের বাড়ি বালিগাঁও চলে এলাম। ২৫ মার্চের পর বন্ধুবান্ধবরা সিদ্ধান্ত নিলাম, আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেব। কিন্তু ট্রেনিংয়ের জন্য কীভাবে ভারত যাব এবং কোন পথে যাব, এ নিয়ে ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলাম। একদিন বিকেলে স্কুলের (বালিগাঁও কুমুদিনী প্রাইমারী স্কুল) মাঠে ফুটবল খেলার পর সাখাওয়াত, মোফাজ্জল, আমিসহ কয়েকজন বন্ধু মিলে ট্রেনিংয়ের জন্য ভারত যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। সম্ভবত ২৫ এপ্রিল আমরা ভারতে যাওয়ার জন্য রাতে ফরিদপুরের দিকে রওয়ানা দিলাম। কিন্তু ফরিদপুরের তালমা বন্দরে যাওয়ার পর আর বেশিদূর এগোতে পারলাম না। ওইদিন তালমা বন্দরের বাজারে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আগুন ধরিয়ে দেয়। এই পরিস্থিতিতে কেউই আমাদের কলকাতা পৌঁছে দিতে রাজি হলো না। তাই বাধ্য হয়ে ভাঙ্গা থেকে গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসি। এর আটদিন পর কুমিল্লার রামচন্দ্রপুর হয়ে আগরতলা যাই।

আগরতলায় গিয়ে আওয়ামী লীগের এমএনএ (মুন্সিগঞ্জের নেতা) আবদুল করিম বেপারীর সঙ্গে দেখা করে গোকুলনগর ক্যাম্পে যাই। ওই ক্যাম্পের ইনচার্জ ছিলেন আমাদের স্থানীয় এমপিএ শামসুল হক। ওখানে রাজনৈতিক ক্লাস ও শরীরচর্চা করানো হতো। প্রতিদিনই শারীরিক প্রশিক্ষণ নিতে হতো আমাদের। পরে উচ্চতর প্রশিক্ষণের (অস্ত্র ট্রেনিংয়ের) জন্য আমাদের পাঠানো হয় আসামের কাছাড় জেলার লায়ল-পুর ক্যান্টনমেন্টে। সেখানে ২১ দিনের গেরিলা ট্রেনিংসহ আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ট্রেনিং শেষে বাংলাদেশে ঢোকার জন্য পাঠানো হয় মেলাঘরের সীমান্তে ২ নম্বর সেক্টরের ট্রানজিট ক্যাম্পে। আমরা ১৫-১৬ দিন মেলাঘর ছিলাম। পরে থানা কমান্ডার শামসুল হকের নেতৃত্বে টঙ্গিবাড়ী থানার ৫৪ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাকে পাঁচটি গ্রুপে বিভক্ত করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের গ্রুপে আমরা বালিগাঁওয়ের ১১ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। গ্রুপ কমান্ডার ছিল আমার বন্ধু মোফাজ্জল হোসেন। সীমান্ত অতিক্রম করে রাতে কুমিল্লার ময়নামতী ক্যান্টনমেন্ট এলাকার দুই মাইল পূর্বদিকে একটি গ্রামে অবস্থান নিই। পরদিন রাতে পার হই সিএন্ডবি রোড। ওই সময় পাকিস্তানি বাহিনীর ব্রাশফায়ারের মুখোমুখি হতে হয় আমাদের। অল্পের জন্য জীবন রক্ষা পেয়ে থানা কমান্ডারের নেতৃত্বে আমরা নিরাপদ স্থানে চলে আসি। জেলের বেশে নৌকায় মেঘনা নদী অতিক্রম করে মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী থানার বালিয়া বাজারে আসি। এখান থেকে পাঁচটি গ্রুপে ভাগ হয়ে গ্রুপ কমান্ডারের নেতৃত্বে আলাদা আলাদা গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ক্যাম্পে চলে যাই। আমাদের গ্রুপের ক্যাম্প হয় আড়িয়াল বালিগাঁও ইউনিয়নের বালিগাঁও গ্রামে।

সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আমাদের কমান্ডারের নেতৃত্বে গোয়ালীমান্দ্রার যুদ্ধে অংশ নেওয়ার ডাক আসে। লৌহজং থানার যুদ্ধকালীন সিএনসি কমান্ডার অ্যাডভোকেট ঢালী মোয়াজ্জেম হোসেন তাঁর গ্রুপের স্থানীয় ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান মিয়ার মাধ্যমে টঙ্গিবাড়ী থানার মুক্তিযোদ্ধাদের গোয়ালীমান্দ্রার যুদ্ধে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। এই বার্তা জেনেই আমাদের গ্রুপসহ টঙ্গিবাড়ী থানার কয়েকটি গ্রুপ গোয়ালীমান্দ্রার যুদ্ধে অংশ নিই। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে সম্ভবত ২৬ কিংবা ২৭ অক্টোবর দুটি লঞ্চে পাকিস্তানি বাহিনীর ৫০-৬০ জনের একটি দল লুকিয়ে থাকা গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে বের করার জন্য গোয়ালীমান্দ্রায় আসে। খবর পেয়ে কাজির পাগলা অস্থায়ী ক্যাম্পে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের দুটি গ্রুপ আতিকুল্লাহ খান মাসুদ (বর্তমানে দৈনিক জনকণ্ঠের প্রকাশক ও সম্পাদক) ও সোলায়মান কমান্ডারের নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধারা গোয়ালীমান্দ্রা আসে এবং আশপাশে বিভিন্ন অবস্থান থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর লঞ্চ দুটি লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে। পাকিস্তানি সেনারাও লঞ্চ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে গুলি ছোড়ে। এই খবর পেয়ে সাতঘরিয়া থেকে ঢালী মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বাধীন গ্রুপ ও ইকবাল হোসেনের নেতৃত্বাধীন ৬০ জন মুক্তিযোদ্ধা গোলায়ালীমান্দ্রার যুদ্ধে অংশ নেয় এবং আরও মুক্তিযোদ্ধা পাঠানোর জন্য ঢালী মোয়াজ্জেম আমাদের কাছে খবর পাঠান। বার্তা পেয়ে টঙ্গিবাড়ীর মুক্তিযোদ্ধারা (আমাদের গ্রুপসহ) এই যুদ্ধে অংশ নিয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে গুলি ছুড়তে থাকি। সারারাত গোলাগুলি চলে দুই পক্ষের। তুমুল যুদ্ধ হয়। অবশেষে সাফল্যের মুখ দেখেন মুক্তিযোদ্ধারা। পরাজয় ঘটে দুর্ধর্ষ পাকিস্তানি সেনাদের। ভোরে আট পাকিস্তানি সেনাকে অক্ষত অবস্থায় আটক করে কমান্ডার আতিকুল্লাহ খান মাসুদের ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। এই যুদ্ধে দুটি লঞ্চের প্রায় ৫০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়।

বার্তা পেয়ে টঙ্গিবাড়ীর মুক্তিযোদ্ধারা (আমাদের গ্রুপসহ) এই যুদ্ধে অংশ নিয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে গুলি ছুড়তে থাকি। সারারাত গোলাগুলি চলে দুই পক্ষের। তুমুল যুদ্ধ হয়

লঞ্চ থেকে উদ্ধার করা পাকিস্তানি সেনাদের ২০টি রাইফেল এবং বেশকিছু গোলাবারুদও কমান্ডার মাসুদের ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। উল্লেখ্য, গোয়ালীমান্দ্রা বাজারের পাশেই ছিল আমাদের গ্রুপের অবস্থান। গ্রুপ কমান্ডার মোফাজ্জল হোসেনসহ আমরা ছিলাম ১১ জন মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু গ্রামের সাধারণ মানুষ ছিল আমাদের পাশে। অচেনা হলেও তাদের ব্যবহারে মনে হয়েছে আমরা যেন তাদের নিকটাত্মীয়। সন্ধ্যার দিকে গোয়ালীমান্দ্রা পৌঁছাই। ক্যাপ্টেন ওমরের নির্দেশে গ্রামের সাধারণ মানুষ আমাদের খাবার জোগাড় করে। তাদের আতিথেয়তাকে কেবল বিয়ের বরযাত্রীর সঙ্গেই তুলনা করা যায়। মুক্তিযোদ্ধা সাখাওয়াতের টনসিল বাড়ছে বলে একজন মধ্যবিত্ত কৃষক তার গলার মাফলার জড়িয়ে দিলেন আপন ভাইয়ের মতো সাখাওয়াতের গলায়। ৪৯ বছর আগে গ্রামে হঠাৎ করে মুরগি জবাই করে গরম পোলাওয়ের ব্যবস্থা করা আপনজন ছাড়া অন্য কারও জন্য হতে পারে– এটা কল্পনার বাইরে। খাবারের পর সিলভারের বদনা দিয়ে পানি ঢেলে হাত ধোয়ানোর ব্যবস্থা আজকের দিনে কোনো বাড়িতেই অতিথিদের জন্য চিন্তা করা যায় না। অথচ একজন অপরিচিত মুক্তিযোদ্ধাকে এভাবেই আপন করে নিয়েছিল গ্রামের বাসিন্দারা। দেশের স্বাধীনতা ছিল গ্রামবাসীদের কাঙ্ক্ষিত। এ কারণেই মুক্তিযোদ্ধারা ছিল তাদের সন্তানের চেয়ে প্রিয়। শুধু আমাদের গ্রুপ নয়, গোয়ালীমান্দ্রার যুদ্ধে সেদিন যারা অংশ নিয়েছে, প্রত্যেকের প্রতিই তাদের ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আতিথেয়তা।

একজন অপরিচিত মুক্তিযোদ্ধাকে এভাবেই আপন করে নিয়েছিল গ্রামের বাসিন্দারা। দেশের স্বাধীনতা ছিল গ্রামবাসীদের কাঙ্ক্ষিত। এ কারণেই মুক্তিযোদ্ধারা ছিল তাদের সন্তানের চেয়ে প্রিয়

রাজধানী ঢাকার খুব কাছে হলেও একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরের অনেক আগেই বিক্রমপুরের থানাগুলো হানাদারমুক্ত হয়। ১৫ নভেম্বর টঙ্গিবাড়ী থানার পতনের খবর বিবিসিতে প্রচার করা হয়। খবরে বলা হয়, 'ঢাকা থেকে ২২ মাইল দূরে টঙ্গিবাড়ী থানা মুক্ত করেছেন মুক্তিযোদ্ধারা। ১৫ নভেম্বর সকালে টঙ্গিবাড়ী থানা প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। থানার সব মুক্তিযোদ্ধা ও কয়েক হাজার মুক্তিকামী মানুষ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল।' টঙ্গিবাড়ী থানা আক্রমণের সিদ্ধান্ত হয় ১৪ নভেম্বর বেতকার চঙ্গরীর দত্ত বাড়িতে। স্থানীয় বেতকা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার সিকদারের আমন্ত্রণে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের বৈঠক হয়। এই বৈঠকে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মো. সরাফত হোসেন সিকদার রতন, কমান্ডার এমএম শাহজাহান, কমান্ডার শামসুল হক সরকার ও মুন্সিগঞ্জ কমান্ডার অ্যাডভোকেট শহীদুল আলম সাঈদ উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকেই টঙ্গিবাড়ী থানা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত যথারীতি থানা কমান্ডার শামসুল হক ও অন্যান্য গ্রুপ কমান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ করে করা হয়। রাত আনুমানিক ৮টায় সরাফত হোসেন সিকদার রতনের গ্রুপ ও শাহজাহানের গ্রুপ বর্তমান টঙ্গিবাড়ী হাসপাতালের ওপর দিয়ে, পূর্বের ইউনিয়ন পরিষদের পেছনে এবং বাকি গ্রুপগুলো তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে পজিশন নেয়। রাত ১১টায় সম্মিলিতভাবে আক্রমণ শুরু করি আমরা। কিছুক্ষণ অবিরাম গুলি ছোড়ার পর একসময় থানা থেকে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'আর গুলি চালাবেন না। আমরা এবং রাজাকাররা অস্ত্র সংবরণ করছি।' থানার এই ঘোষণার পর মুক্তিযোদ্ধা সবাই থানার দিকে এগিয়ে যাই। প্রথমে থানায় ঢুকেন কমান্ডার রতন। থানার অস্ত্রগুলো এক জায়গায় জড়ো করে অল্প সময়ের মধ্যে অস্ত্র ও গুলির বাক্স নিয়ে থানার বাইরে আনেন রতন কমান্ডার। জয় বাংলা স্লোগানে তখন এলাকার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে। ওই রাতেই পরের দিন অর্থাৎ ১৫ নভেম্বর সকালে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত হয়।

এর আগে ৮ নভেম্বর সিরাজদিখান থানা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন সিরাজদিখান থানা কমান্ডার মো. শাহজাহান। তার এই সিদ্ধান্তের কথা আমাদের জানালে আমরা তাকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিই। যথারীতি ৭ নভেম্বর আমরাসহ মুক্তিযোদ্ধাদের দুটি দল এবং মুজিব বাহিনীর কমান্ডার আবদুল করিম সিরাজদিখান থানা আক্রমণের জন্য যাই। ওই রাতে আমরা আক্রমণ করলেও শেষ পর্যন্ত থানা মুক্ত করতে পারিনি। আমরা পিছু হটে চলে আসি।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ের আরেকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে চাই। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের গ্রুপের কয়েকজন একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিই। একাত্তরের অক্টোবরের মাঝামাঝি মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গিবাড়ী থানার আমরা কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা একটি পত্রিকা প্রকাশের জন্য গ্রুপ কমান্ডারের সঙ্গে আলাপ করলাম। সশস্ত্র যুদ্ধের পাশাপাশি জনগণের মনোবল বৃদ্ধির জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরলাম। গ্রুপ কমান্ডারকে দায়িত্ব দেওয়া হলো। থানা কমান্ডার এবং মহকুমা কমান্ডারের সঙ্গে আলোচনার জন্য ৪/৫ দিনের মধ্যে গ্রুপ কমান্ডার মোফাজ্জল হোসেন জানালেন, থানা কমান্ডার শামসুল হকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তিনি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বলেছেন। কমান্ডার মোফাজ্জল আরও জানালেন, বিষয়টি নিয়ে থানা কমান্ডার মহকুমা কমান্ডার এবং মুন্সিগঞ্জ-মানিকগঞ্জের দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন (অব.) আবদুল হালিম চৌধুরীর সঙ্গেও আলাপ করেছেন। কমান্ডারের সম্মতি সাপেক্ষে আমরা পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিলাম। পত্রিকা প্রকাশের জন্য প্রয়োজন প্রেসের। সমস্যা দেখা দিল– প্রেস কোথায় পাওয়া যাবে? মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকজন বললেন, রিকাবীবাজারে রউফ সাহেবের একটি প্রেস আছে। আর ইছাহরায় রয়েছে বেদনা শান্তি প্রেস। ইছাহরার বেদনা শান্তি প্রেস তুলে আনাই সহজ হবে বলে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেদনা শান্তি প্রেস তুলে আনার জন্য আমরা কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা সেখানে গেলাম। ব্যক্তিগতভাবে প্রেস তুলে আনা সম্ভব কি না, এ ধারণা তখন আমার ছিল না। ট্রেডেল মেশিন কী জিনিস, তা আমার কেন, অনেকের কাছেই ছিল নতুন। নৌকায় আমরা ইছাহরা গিয়ে ট্রেডেল মেশিনের সাইজ ও শব্দ

সম্পর্কে পরিচিত হলাম। প্রেসটি উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে তাতে পত্রিকা ছাপানো কঠিন কাজ। কারণ নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। প্রেসের আওয়াজ এত বেশি যে, এটা দিয়ে পত্রিকা বের করতে গেলে মুক্তিযোদ্ধাদের বিপদ হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে কষ্টসাধ্য ব্যাপার। প্রেস দেখেই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এই মেশিন দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকবলিত এলাকা থেকে পত্রিকা প্রকাশ করা যাবে না। গ্রুপ কমান্ডারের নেতৃত্বে আমাদের গ্রুপের প্রায় সব মুক্তিযোদ্ধাই প্রেস উঠিয়ে নিয়ে পত্রিকা প্রকাশের বিপক্ষে মত দিলেন। এই পর্যায়ে আমি ও সাখাওয়াত হোসেন সাইক্লোস্টাইল মেশিনে পত্রিকা প্রকাশ করা যায় কি না, এটা ভেবে দেখতে বললাম। সঙ্গে সঙ্গে গ্রুপ কমান্ডারসহ অন্যরা আমাদের নতুন প্রস্তাবে সায় দিলেন। ঠিক হলো সাইক্লোস্টাইল মেশিন কোথায় আছে, তা বের করে আমাদের নিয়ন্ত্রণে এনে পত্রিকা প্রকাশ করা হবে। যে কথা সে কাজ। সাইক্লোস্টাইল মেশিন খোঁজ করা হলে একজন আমাদের জানালেন, মুন্সিগঞ্জের এভিজেএস বালিকা বিদ্যালয়ে একটা সাইক্লোস্টাইল মেশিন আছে। মুন্সিগঞ্জ শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ডা. আবদুল কাদেরের স্ত্রী এভিজেএস বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। ওই শিক্ষিকার সঙ্গে আলাপ করলেই কীভাবে মেশিনটি আনা যাবে, তা ঠিক করা সম্ভব হতে পারে।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আওয়ামী লীগ নেতা ডা. আবদুল কাদেরের এক ছেলে আজাদের সঙ্গে আমাদের আলাপ হলো। আজাদ একসময়ের বিটিভি এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংবাদ পাঠক বাবুল আক্তারের ছোটো ভাই। আমাদের গ্রুপের স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা এটিএম শাহজাহান তাদের খালাতো ভাই। এই পরিচয়সূত্রে প্রথমে আজাদ ও পরে তার মা মুন্সিগঞ্জ এভিজেএস বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা রওশন জাহান কাদেরের সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি বলেছিলেন, একসঙ্গে দুটো মেশিন আছে। প্রথমটা টাইপ মেশিন, দ্বিতীয়টি সাইক্লোস্টাইল মেশিন। দুটো মেশিনই কভার দিয়ে ঢাকা। দ্বিতীয় মেশিনটি আনতে হবে। এই মেশিন এনে পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হবে। মুন্সিগঞ্জ শহর তখনও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দখলে। এই অপারেশন করার ব্যাপারে মুন্সিগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা দরকার। গ্রুপ কমান্ডার মোফাজ্জল হোসেন যোগাযোগ করলেন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার অ্যাডভোকেট শহীদুল আলম সাঈদের সঙ্গে। একসময়ের ছাত্রলীগের ডাকসাইটে নেতা বর্তমানে অ্যাডভোকেট শহীদ সাইক্লোস্টাইল মেশিনটি মুন্সিগঞ্জ এভিজেএস বালিকা বিদ্যালয় থেকে আনার ব্যাপারে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। গ্রুপের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দখলকৃত মুন্সিগঞ্জ শহরের কেন্দ্রস্থলের এই বালিকা বিদ্যালয় থেকে সাইক্লোস্টাইল মেশিন আনার দায়িত্ব দেওয়া হলো আমাকে এবং আমাদের গ্রুপের সবচেয়ে লম্বা যুবক আবদুল মোতালেবের ওপর। শক্তি-সামর্থ্য যুবক মোতালেবের দায়িত্ব হলো বালিকা বিদ্যালয় থেকে মাথায় করে সাইক্লোস্টাইল মেশিনটি মুন্সিগঞ্জ শহরের এক প্রান্তে কে. কে. হাইস্কুলে আনা। পূর্ব থেকে সেখানে রিকশা থাকবে। আমরা দুজন রিকশাযোগে আলদী বাজারের দিকে যাব। আমার হাতে থাকবে স্টেনগান। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এটা ব্যবহার করা হবে। আর সামগ্রিকভাবে এই অপারেশনের সময় পাহারায় থাকবে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার শহীদুল আলম সাঈদের গ্রুপ।

তারিখটা মনে নেই। ৪৯ বছর আগের ঘটনা। সম্ভবত নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ হবে। নির্ধারিত তারিখে আমি ও মোতালেব সাইক্লোস্টাইল মেশিন আনার অপারেশনে রওয়ানা হলাম। একটা চটের ব্যাগে করে স্টেনগান নিয়ে যাই। পথিমধ্যে রামপাল থেকে ঢুলাশাক, লালশাক ভর্তি করে নিলাম। পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি পরা অবস্থায় হাতে সবজিসহ ব্যাগ নিয়ে গেলে মনে হবে আমি কোনো ছাত্রীর অভিভাবক। মোতালেবও পাঞ্জাবি পরা। এই পোশাক পরায় আমাদের ওপর সন্দেহের কোনো কারণ থাকবে না। যথারীতি স্কুলের গেটে গিয়ে নক করলাম। দারোয়ান জিজ্ঞাসা করলেন কাকে চাই, বললাম প্রধান শিক্ষিকার সঙ্গে দেখা করব। দারোয়ান গেট খোলে, আমরা দুজন সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। শিক্ষিকা রওশন জাহান কাদেরের কথা অনুযায়ী স্কুলের অফিস কক্ষে সরাসরি গেলাম। গিয়ে দেখি কক্ষের পূর্বদিকে একটি টেবিলের ওপর ছোটো মেশিন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখা। দ্রুততার সঙ্গে স্টেনগান বের করলাম। অফিসে যারা আছে, তাদের বললাম, 'কোনো কথা বলবে না। টেলিফোন করার চেষ্টা করবে না। সাইক্লোস্টাইল মেশিনটা কোথায়? ওটা আমাদের দরকার। নিয়ে যাচ্ছি।' কেরানি বেচারা মেশিন দুটোর দিকে আঙুল ওঠালেন। স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক আফজল সাহেব তখন সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে সহযোদ্ধা মোতালেবকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম, 'এই মেশিনটা নিয়ে চল।' মোতালেব মেশিনটা কভারসহ মাথায় নিয়ে বের হলো। সাথে স্টেনগান হাতে বের হলাম আমি। অফিস কক্ষ থেকে বের হয়ে সোজা গেট দিয়ে ফসলি জমির মধ্য দিয়ে কে. কে. হাইস্কুলের দিকে দৌড় দিলাম। পুরো ঘটনাটি ঘটল পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যে। মেশিনসহ রিকশায় চড়ে আমরা সোজা আলদি বাজারের দিকে রওয়ানা দিলাম। গন্তব্যস্থলে এসে দেখলাম, ভুলবশত সাইক্লোস্টাইল মেশিনের পরিবর্তে টাইপ মেশিন নিয়ে এসেছি। অপারেশনে এই ভুল করার জন্য গ্রুপ কমান্ডারসহ গ্রুপের অনেকেই আমাদের গালমন্দ করল। মেশিনটি আমাদের কাজে লাগেনি। দেশ স্বাধীনের পর মেশিনটি ফেরত দেওয়া হয়েছে। ফলে দেশ স্বাধীনের আগে আমাদের পক্ষে পত্রিকা প্রকাশ করা আর সম্ভব হলো না।

মুক্তিযুদ্ধের সময়কার আরেকটি ছোটো ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে চাই। একাত্তরের মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে মুন্সিগঞ্জ থেকে গ্রামের বাড়ি বালিগাঁও চলে এলাম। ২৫ মার্চের কালরাত্রির পর বন্ধুবান্ধবরা সিদ্ধান্ত নিলাম, আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেব। এ সময় সাখাওয়াত, মোফাজ্জল, আমিসহ কয়েকজন বন্ধু মিলে ঠিক করলাম ট্রেনিংয়ের জন্য ভারত যাওয়ার আগে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে কিছু একটা করা দরকার। পোস্টার বা বুলেটিন লিখে গ্রামের বিভিন্ন স্থানে সেঁটে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। পরের দিন কয়েকটি পোস্টারও লাগালাম। এতে মনে কোনো শান্তি পেলাম না। স্থির করলাম, বিবিসি ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনে তখনকার খবর হাতে লিখে এক পৃষ্ঠার পত্রিকা করে বিভিন্ন স্থানে টানিয়ে দেব। আমি ও সাখাওয়াত তখন বিএ পড়ি। মোফাজ্জল আমাদের সঙ্গে না পড়লেও ও ছিল আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দেয়াল পত্রিকার কথা এই তিনজন ছাড়া আর কেউ জানত না। কিন্তু বাজারে কিংবা স্কুল ভবনের দেয়ালে পত্রিকা আটকানো দেখে অনেকেই আঁচ করতে পারলেন এ কাজ আমরা করেছি। পরবর্তী সময়ে দেয়াল পত্রিকার নাম দিলাম 'বুলেটিন'। সম্পাদক ছিলাম আমি। তবে নিজের নাম রাখা ঠিক হবে না বিধায় 'কামাল আহমেদ' ছদ্মনাম ব্যবহার করলাম। এই বুলেটিনের সব কাজ করতাম আমাদের বাসায় বসে অথবা সাখাওয়াতের বাসায়। হাতে লিখে ১০-১২ কপি করা খুবই কঠিন কাজ। তাই শেষদিকে সপ্তাহে দুটির বেশি বুলেটিন বের করতে পারিনি। ট্রেনিংয়ের জন্য ভারতে যাওয়ার সময় বুলেটিনের ১০ সংখ্যা সঙ্গে নিয়ে গেলাম। আগরতলা যাওয়ার পর ওই সংখ্যাগুলো তৎকালীন সংসদ সদস্য আবদুল করিম বেপারীর উপস্থিতিতে নারায়ণগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন নেতা খাজা মহিউদ্দিনের কাছে দিলাম মুজিবনগর সরকারের কোনো কর্মকর্তার কাছে দেওয়ার জন্য। পরবর্তী সময়ে ট্রেনিংয়ের জন্য আমরা আসামের শিলচরের লায়ালপুর ক্যান্টনমেন্টে চলে গেলাম। ট্রেনিং শেষে দেশে এলাম। যুদ্ধ করলাম। দেশ স্বাধীন হলো। স্বাধীনতার পর ওই বুলেটিন সম্পর্কে খাজা মহিউদ্দিন ভাইয়ের কাছে খোঁজ নিয়েছি। কিন্তু তিনি বুলেটিন সম্পর্কে কোনো তথ্য দিতে পারেননি।

এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম। দেশ স্বাধীনের পর জানুয়ারিতে আজাদ পত্রিকা অফিস থেকে আমার সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'আমার বাংলা' বের করলাম। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সাবেক পরিচালক ডা. সৈয়দ বাবর হোসেনকে করলাম পত্রিকার প্রকাশক। কয়েক মাস পত্রিকাটি বের করলাম। এরপর আর এর প্রকাশনা অব্যাহত রাখা যায়নি। পরবর্তী সময়ে সরাসরি সাংবাদিকতা পেশায় এসে গেলাম।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য

আমার যুদ্ধদিন

মতিউর রহমান মতি

মুক্তিযুদ্ধ বলতে ঈশ্বরদীবাসীর স্মৃতিতে আজও অম্লান হয়ে আছে মিরকামারির যুদ্ধ ও এর ইতিহাস। এই যুদ্ধে তেত্রিশজন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও বহু আহত হয়। অপরপক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কেউ শহিদ বা আহত না হলেও শত্রুসেনার গুলিতে এগারো-বারো বছরের এক বালিকা, সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধা ও একজন বয়স্ক ব্যক্তি মারা যান। তাছাড়া গ্রামের শতাধিক বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়। এগুলোর মধ্যে শত্রুপক্ষের অগ্নিসংযোগে ৬৮টি বাড়ি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। এতে গ্রামের অধিকাংশ মানুষ সেদিন ঘরবাড়ি, সহায়সম্বল হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

আমাদের ব্রাভো কোম্পানি মিরকামারি গ্রামে। গ্রামটি ঈশ্বরদী থানা সদরের পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প থেকে মাত্র তিন মাইলের মধ্যে অবস্থিত। ওই গ্রামের অবস্থাপন্ন প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই ক্ষণস্থায়ীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান। গ্রামের কাশেম মাস্টারের (স্থানীয় আলহাজ টেক্সটাইল মিলের অ্যাকাউন্ট্যান্ট) বাড়ি যেন হয়ে উঠেছিল আমাদের কোম্পানির অস্থায়ী হেডকোয়ার্টার। কারণ, তাঁর বড়ো জামাই সিরাজুল ইসলাম মন্টু আমাদের কোম্পানি কমান্ডার। শুনেছি, যুদ্ধের আগে তিনি পাকিস্তানি বিমানবাহিনীতে চাকরি করতেন। তবে কী চাকরি, সেটা আর জানা হয়নি। আর তাঁর ডেপুটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যুক্তিবাদী আর উদ্যমী যুবক আবদুস সামাদ সরদার। তাঁর বাড়িও পাশের গ্রাম চরমিরকামারি।

> দিনরাত রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশবাণী আর বিবিসির খবর শুনি, মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত 'জয়বাংলা' খবরের কাগজ পড়ি, যার যার অস্ত্রগুলো একবার করে ফুল থ্রো করি, সেগুলো ভালোভাবে ধুয়েমুছে তেল দিয়ে যত্ন করে হাতের কাছে দাঁড় করিয়ে রাখি

নভেম্বর মাস। সেদিন শীতের সকালে গরম ভাত খেয়ে ঘরের মধ্যে আমাদের ১১ জনের দলটা সবেমাত্র বসেছি, সঙ্গী

সেকশন কমান্ডার রহিম, আমি (তার টুআইসি অর্থাৎ ডেপুটি), জামাত, বুদু, মোস্তাক, কালাম সবাই সমস্বরে প্রস্তাব দিলাম যেহেতু দিনের বেলা বাইরে বের হওয়া নিষেধ, তাই তাস খেলে সময় কাটানো যাক। সেকশন কমান্ডার রহিম, জামাত, মোস্তাক, বাকের– তারা কজন বয়সে তিন-চার বছরের সিনিয়র, বাকের বাদে সবাই কলেজছাত্র। বাকি আমরা কেউই তখনও হাইস্কুলের গণ্ডি টপকাইনি। দিনরাত রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশবাণী আর বিবিসির খবর শুনি, মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত 'জয়বাংলা' খবরের কাগজ পড়ি, যার যার অস্ত্রগুলো একবার করে ফুল থ্রো করি, সেগুলো ভালোভাবে ধুয়েমুছে তেল দিয়ে যত্ন করে হাতের কাছে দাঁড় করিয়ে রাখি। প্লাটুন কমান্ডার কিংবা কোম্পানি কমান্ডারের দেখা পেলে পাশে গিয়ে আস্তে আস্তে কিছুটা অনুনয় করে বলি, 'ভাই, এবার যখনই কোনো অপারেশনে যান, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন কিন্তু।'

রাত হলে অনেক সময় অনেককে পাওয়া যায় না। পরে জানা যায় কোনো অপারেশনের কথা। কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ ধ্বংস করা, বিদ্যুৎ টাওয়ার উড়িয়ে দেওয়া কিংবা কোনো সেনাচৌকিতে হামলা চালানো, রাজাকার ধরে আনা– এসব হচ্ছে নিত্যরাতের কর্মকাণ্ড। ভারতে প্রশিক্ষণকালীন অবসরে কখন যেন শিখে নিয়েছি এই তাস খেলা। খেলা তো আছে অনেক রকম, আমরা খেলি জোড়পাত্তি, টোয়েন্টিনাইন কিংবা ব্রে। এসব খেলায় দেখা যায় ভালো-মন্দ দুটো জিনিসই আছে। একবার কেঁচুয়াডাঙ্গা ক্যাম্পে খেলতে বসে মারামারি বেধে গেল। পাকশীর মাহাবুল খ্যাপে গিয়ে মারলো এক লাথি। মার্চের সেই অগ্নিঝরা দিনগুলোয় হাতবোমা বানাতে গিয়ে এই মাহাবুলের দুটো হাতই উড়ে যায়। হাতই যখন নেই, তখন আর তার সঙ্গে কীসের মারামারি! এই মাহাবুলকে একদিন প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, তুমি তো বোমা বানাতে গিয়ে হাত দুটো হারালে, ওই বোমা দিয়ে কী করতে চেয়েছিলে? ওই বোমার শক্তিই বা কতটুকু ছিল?'

মাহাবুল বলল, 'একটা দোতলা বাড়ি উড়িয়ে দিতে যথেষ্ট।'

আমি অবাক হই! সালফার, মুনসেল আর পটাশ মিশিয়ে তাতে পাথরের টুকরা যোগ করে সাবধানে কাপড় দিয়ে পোঁটলা করে বাঁধলেই হয়ে যায় বোমা। এরকম পটকা বানিয়ে কোনো বিয়ের আসরে আলাদা ইমেজ সৃষ্টি বা দুষ্টুমি করি অনেকদিন আগে থেকে; কিন্তু এটা তো জানতাম না! 'তা প্রযুক্তিটা কোথায় পেলে?'

মাহাবুল মৃদু হেসে বলে, 'আছে আছে, বলা যাবে না।'

আমি মনে মনে বলি, কচু আছে। যদি থাকত তাহলে তোমার হাত দুটো উড়ে যেত না। প্রযুক্তির সঙ্গে টেকনিকটা অবশ্যই জানা থাকত। খেলতে বসার আগেই চরমিরকামারি থেকে রহিমের এক চাচাতো ভাই তালেব এসে রহিমকে ডেকে বলল, তুমি এখানে বসে আছ আর তোমার বাড়ি লুট করছে রাজাকার বাহিনী। আমি সেখান থেকে এইমাত্র পালিয়ে এসেছি। কিছু করার থাকলে এক্ষুনিই কর ...।

তালেবের মুখে এ কথা শোনামাত্র রহিম একটা স্টেনগান (এসএমজি/সাব মেশিনগান) কাঁধে ঝুলিয়ে অতিরিক্ত এক ম্যাগাজিন গুলি কোমরে গুঁজে সেখানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগল। তালেবের গা থেকে চাদর খুলে নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রহিম। তালেব একটা বাইসাইকেল চালিয়ে এসেছিল, রহিম সেই সাইকেলে চড়ে চলে গেল। কারও মুখে কোনো কথা নেই, আকস্মিক সংবাদে যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। এতক্ষণ খোশমেজাজেই ছিলাম; কিন্তু হঠাৎ করেই পরিবেশ অন্যরকম হয়ে গেল। ব্যাপারটা দুঃসংবাদ নাকি সুসংবাদ– এ নিয়ে ভাবতেই মনে হলো, হাতের কাছে রাজাকার পেয়ে ছেড়ে দেব, সেটা কেমন কথা! আর আমার কমান্ডার একাকী কোথায় গেল, সে কী করতে পারবে, সেসব ভেবে নিজেও খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম।

তালেবকে জিজ্ঞেস করলাম, রাজাকার কজন?

তালেব বলল, '১০-১৫ জন হবে।'

আমি আবার তাকে জিজ্ঞেস করি, 'কী লুট করছে ওরা?'

তালেব বলল, 'বাড়ির সবকিছু– একটা গরুর গাড়িতে বোঝাই করছে। পাড়া থেকে কয়েকটা গরু-ছাগলও খুলে নিয়ে যাচ্ছে।'

আর বেশি কিছু শোনার দরকার মনে না করে রহিমের মতো একটা স্টেনগান কাঁধে ঝুলিয়ে, বিছানার চাদরটা উঠিয়ে গায়ে জড়িয়ে অস্ত্রটা লুকিয়ে নিয়ে ত্রস্ত রওয়ানা দিলাম রহিমের বাড়ির দিকে। কোনো যানবাহন নেই, হেঁটেই যেতে হলো। সঙ্গে তালেব।

এক কিলোমিটারের মতো পথ। মিরকামারি হাইস্কুল পেরিয়ে দৌড়াতে লাগলাম। মিরকামারি আর চরমিরকামারি এ দুই গ্রামের মাঝখানে একটা বড়ো খাল। সেই খালের কাছে এসে পৌঁছামাত্রই গুড়ুম-গুড়ুম গুলির শব্দ। পাড়াগাঁয়ের সকালের নিস্তব্ধতা ভেঙে সেই শব্দে চারদিক যেন হঠাৎ চমকিত হয়ে উঠল। গুলির আওয়াজ এলো রহিমের বাড়ির দিক থেকে, পরপর কয়েকটা। একমুহূর্ত বাদেই টা-টা-টা-টা ব্রাশফায়ার। খালের ওপারে যেতে হলে উত্তর-পূর্বদিকে দুই শ গজের মতো দূরত্ব ঘুরে কালভার্ট হয়ে যেতে হবে। কিন্তু না। গুলির আওয়াজে মাথার মধ্যে শুরু হয়ে গেছে অস্থিরতা। নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না, ওই গুলি কে বা কারা ছুড়ল, রহিম নাকি রাজাকাররা! চটপট পায়ের কেডস আর গায়ের চাদর খুলে তালেবের হাতে দিয়ে বললাম, 'ধরো, রাখো।'

পরনের লুঙ্গি মালকোঁচা করে উপরে তুলে বাঁধলাম। তারপর স্টেনগানের সুইচ অন করে নেমে পড়লাম খালের হাঁটুপানিতে। পেছনে পানির মধ্যে ঘুপঘাপ শব্দে ফিরে চাইতেই দেখি আরও সাত-আটজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা আমাকে অনুসরণ করে এগিয়ে আসছে। ওদের দু-তিনজন আমার পূর্বপরিচিত, আওতাপাড়া গ্রামের দিকে বাড়ি। আমি শুধু জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা কোন প্লাটুন?' একজন বলল, 'পিন্টু বিশ্বাস।' কিন্তু জানা হলো না যে পিন্টু কোন কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আমাদের কোম্পানি চার্লি বাদে আলফা আর ব্রেভো নামে আরও দুটি কোম্পানি রয়েছে। আলফার কমান্ডার কাজি সদরুল হক সুধা এবং ব্রেভোর মতিউর রহমান কচি। যা হোক, এদের শেল্টারও হয়তো ধারেকাছেই কোনো বাড়িতে। ওদের মধ্যে সিনিয়র একজন পানিতে নামতে নামতে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী ঘটনা?'

আমি দু-চার কথায় রহিমের ব্যাপারটা বলে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। খাল পার হয়ে ঢালে শুয়ে পজিশন নিতেই দেখলাম, তিন শ গজ দূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে রহিম শুয়ে বাড়ির দিকে গুলি ছুড়ছে। ওর কাছ থেকে আরও দুই শ গজ দূরে ওদের বাড়ির আঙিনায় কালো রঙের ইউনিফর্ম পরিহিত দু-তিনজন রাজাকারকেও ছোটাছুটি করতে দেখা গেল। দূরত্বটা স্টেনগানের রেঞ্জের বাইরে বুঝতে পেরে মন খারাপ হয়ে গেল আমার। হঠাৎ আমাদের পজিশনের খুব কাছাকাছি পাঁচ-সাত ফুট দূরে কয়েকটা গুলি এসে মাটিতে বিদ্ধ হলো এবং ধুলো উড়তে লাগল দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম– এখানে গুলি এলো কোত্থেকে! এ গুলি তো আমাদেরই লক্ষ্য করে ছোড়া হয়েছে।

বাঁদিকে ফিরে চাইতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল, তিন শ গজ দূরে পাশের ওয়াপদা কলোনির ভেতরের চারতলা দালানের ছাদ থেকে সেখানকার প্রহরীরা আমাদের লক্ষ্য করে ওই গুলি করছে। নাহ, এখানে আর নিরাপদ নই আমরা। যে কোনো মুহূর্তে যে কেউ গুলিবিদ্ধ হতে পারি, মারাও যেতে পারি।

ঘাড় ঘুরিয়ে ডানদিকে তাকালাম। খালপাড়ের পুবদিকে হলুদখেতের মধ্যে একটা বাড়ি, আমরা পজিশন উইথড্র করে দৌড়ে গেলাম সেই বাড়িটার দিকে। বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতেই কোম্পানি ডেপুটি সামাদ সরদারের দেখা পেলাম সেখানে। প্লাটুন কমান্ডার রাজ্জাক সামনে একটা গুলির বস্তার সামনে নিস্পৃহভাবে দাঁড়িয়ে। এলএমজি (লাইট মেশিনগান) হাতে সামাদ সরদার আমাদের বললেন, 'উত্তরদিকে তাকিয়ে দেখ, মিলিটারি আসছে।'

গাছপালার ভেতর দিয়ে চেয়ে দেখি সত্যিই তাই, আট-দশজনের দলটি মাঠের ভেতর দিয়ে দৌড়ে এদিকেই আসছে। ভাবলাম, স্টেনগান দিয়ে এখন কিছুই হবে না। দরকার এলএমজি-এসএলআর

কিংবা রাইফেল। আমি আর কোনোকিছু না ভেবে সেখান থেকে দৌড়ে আবার খাল পার হলাম; অতঃপর শেল্টারের দিকে, উদ্দেশ্য স্টেনগান পালটে লং-রেঞ্জ আর্মস নিয়ে আসা। লং-রেঞ্জ অস্ত্র ছাড়া এদের মোকাবিলা করা অসম্ভব! দৌড়াতে দৌড়াতে মিরকামারি স্কুল পার হয়ে গোরস্থানের কাছে পৌঁছতেই দেখি, কাশেম মাস্টারের ছোটোভাই নান্টু এক হাতে আমার ব্যবহৃত এসএলআর (সেলফ লোডেড রাইফেল) আর অন্য হাতে বাজার করা একটা কাপড়ের ব্যাগে কিছু গোলাবারুদ নিয়ে এদিকেই আসছে। নান্টু আমাকে বলল, 'এই নাও, এটা তোমার।'

ছোঁ মেরে সেটা নিলাম আর স্টেনগানটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়েই আবার উলটোদিকে দৌড়াতে লাগলাম। ১০ মিনিট পর ফিরে এলাম সেই খালের কাছে। ওখানে কালাম, বুদু এবং আরও কয়েকজনকে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললাম, 'এখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোরা কী করছিস? এদিকে আয়।'

বাঁদিকের একটা বাঁশঝাড়ের জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম সবাই। সেখানে পজিশন খুঁজছি– এমন সময় আবার সামাদ সরদারকে দেখলাম, চোখে-মুখে টেনশনের ছাপ। আর পাশেই এলএমজি নিয়ে পজিশন নিয়ে আছে আমাদের প্লাটুন লিডার রাজ্জাক। ভাবলাম, জঙ্গলের মধ্যে হয়তো আরও মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন যার যার মতো। জঙ্গলের দক্ষিণ পাশ দিয়ে বড়ো রাস্তা চলে গেছে জয়নগরের দিকে। রাস্তার ওপাশেই একটা বাড়ি। আমরা সেই বাড়িটার দিকে অগ্রসর হওয়ার উপক্রম করতেই সামাদ সরদার খুব হুঁশিয়ারি দিয়ে ধমকের সুরে বললেন, 'এই সাবধান! ওদিকে যেও না, মিলিটারি!' আমরা যেন কোনোকিছু না জেনে আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি। ওনাকে অমনভাবে মুখ চিবিয়ে খিস্তি করে আর কখনো কথা বলতে দেখিনি। তাই আশ্চর্য হলাম।

কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই আমরা ততক্ষণে আড়াআড়িভাবে রাস্তায় নেমে পড়েছি। ডানদিকে একপলক চাইতেই দেখি ত্রিশ-চল্লিশ গজ দূরে পশ্চিমদিকে বাঁশঝাড়ের ছায়ায় রাস্তার ওপর একজন পাকিস্তানি সেনা আমাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। ওর সঙ্গে এভাবে চোখে চোখে দেখা হয়ে যাবে, তা ছিল কল্পনাতীত। তার অস্ত্রটা মাটিতে পায়ের কাছে বাঁটের উপর দাঁড় করানো, ব্যারেলে হাত। বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। কারও কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমরা নিমেষেই বাড়িটার আড়াল হয়ে গেলাম। ভাবলাম, বেটা আমাদের দেখে গুলি করল না কেন? নাকি গুলি করার সুযোগ পেল না। আর যতটুকু ধারণা করছি, আশপাশের জঙ্গলে অনেক মুক্তিযোদ্ধা হয়তো পজিশন নিয়ে আছে, কিন্তু তাকে দেখেও গুলি করছে না কেউ। নাকি প্রাণের ভয়ে মুক্তিযোদ্ধারা বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে! আমি সামনে, বুদু আর কালাম আমার পেছনে, ওদের হাতে মার্ক-ফোর রাইফেল। সবার পরনে লুঙ্গি, গায়ে শার্টের ওপর সোয়েটার। দক্ষিণদিকের ঘরটার পাশে গিয়ে সবেমাত্র দাঁড়িয়েছি, সামনে বিস্তীর্ণ সবুজ হলুদখেতের মাঠ, পশ্চিমদিক থেকে প্রচণ্ড শব্দে আমাদের লক্ষ্য করে হঠাৎ গুড়ুম-গুড়ুম দুটো গুলি। গুলি দুটি আমার মাথা থেকে দুই ফুট দূরে ঘরের কাদামাটির বেড়ায় লেগে কিছু শুকনো মাটি খুলে পড়ল। চারদিকের নীরবতা ভেঙে বহুক্ষণ পর এই প্রথম আর্মির গুলির শব্দ। ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকিয়ে দেখি, এক শ গজ দূরে মাঠের মধ্যে বেশ বড়ো একটা পুকুর। সেই পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে আছে একদল পাকিস্তানি সেনা, সংখ্যায় ১০-১৫ জন। ভেবে ঠাহর করতে পারলাম না, এখানে এত সংখ্যক পাকিস্তানি সেনা কখন কোনদিক থেকে এলো! ভাবলাম, হয়তো ওরা জয়নগর ওয়াপদা কলোনির ভেতর থেকে পেছনের গেট দিয়ে এসেছে কিংবা ঈশ্বরদী থেকে শিমুলতলা ঘুরে জয়নগর হয়ে কলোনির পেছনের রাস্তা দিয়ে। কিংবা এও হতে পারে যে, কলোনির পূর্বপাশ ঘেঁষে যে পায়ে চলা রাস্তাটা আছে, সেদিক দিয়েও আসতে পারে। ঈশ্বরদী-কুষ্টিয়া রোডের (আইকে রোড) শাকরিগাড়ি থেকে তারা দু-তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দিক থেকে এসেছে। দ্রুত হিসাব করলাম, বাড়ির মধ্যে গিয়ে কোথাও পজিশন নেওয়া যায় কি না। কিন্তু ওই কাঁচাবাড়ির মধ্যে এখন আর আটকে থাকা নিরাপদ হবে না ভেবে মাথা নিচু করে আবারও পেছনের দিকেই সরে এলাম। কয়েক পা এগোতেই খেয়াল করলাম, সেই পাকিস্তানি সেনাটা ওখানে আর নেই। এক মিনিটও হয়নি ওকে দেখেছিলাম। আমরা রাস্তায় নেমেই পূর্বদিকে দৌড়। চারদিক থমথমে, মৃত্যুর বিভীষিকা। খানিক পথ আসতেই দেখি ডাবলু, এ পাড়ারই ছেলে। উনি বললেন, 'চারদিকে তো মিলিটারি, তুমি একা একা কী করছ এখানে?'

ছোঁ মেরে সেটা নিলাম আর স্টেনগানটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়েই আবার উলটোদিকে দৌড়াতে লাগলাম। ১০ মিনিট পর ফিরে এলাম সেই খালের কাছে

আমি আবার একা হলাম কী করে! নিজের কাছে প্রশ্নটা করতেই পেছন ফিরে তাকাই। দেখি, আমার সঙ্গে কালাম আর বুদু ছিল এতক্ষণ, মুহূর্তের মধ্যে ওরা দুজন কোথায় হাওয়া হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিছু বললাম না। ডাবলু বললেন, 'ওই যে দেখো, পুকুরপাড়ে কত মিলিটারি, গুলি করো, গুলি করো।'

হুম, তাদের তো আমি আগেই দেখেছি। শুধু পজিশন খুঁজছি। রাস্তায় ঝোপের আড়ালে বসে ওই পাকিস্তানি সেনাদলের দিকে এসএলআর তাক করে কয়েক রাউন্ড গুলি করতেই শত্রুরা যে যেখানে দাঁড়ানো ছিল, সেখানেই শুয়ে পড়ল মাটিতে। আর্মির সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধে আমাদের দিক থেকে এই প্রথম গুলি। চারদিক কেঁপে উঠল সেই গুলির শব্দে। গুলি কারও শরীরে আঘাত করল কি না, স্পষ্ট বোঝা গেল না। গাছপালার পাতার ভেতর দিয়ে দেখলাম, সবাই শুয়ে পড়ল একই সঙ্গে। শিলিগুড়ির ট্রেনিংফিল্ডে নির্ভুল লক্ষ্যভেদে প্রতিদিন-

প্রতিবারই পাঁচের মধ্যে পাঁচ কিংবা দশের মধ্যে দশ পেয়ে উস্তাদদের প্রশংসায় ধন্য হয়েছি আমি। আমার মতোই কৃতিত্ব দেখিয়েছিল পাবনা শহরের আরেক বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ছেলে। ডাবলু বললেন, 'পেছনেও তো মিলিটারি।'

আমি আশ্চর্য হই, 'কোথায়?'

'এসো আমার সঙ্গে', ডাবলু আবারও বললেন।

পেছনের ছোট্ট বাড়িটার ভেতর ঢুকলাম। বাড়িটিতে দুটি মাত্র কুঁড়েঘর, আঙিনায় কোনো বেড়াঘোড়া কিছু নেই। চারদিকে গাছপালা, হালকা জঙ্গল। উঠোনে দাঁড়াতেই পুবদিকে চোখ পড়ল, সেই প্রথমবার যে সেনাদলকে দেখেছিলাম হয়তো ওরাই দৌড়ে কালভার্ট পেরিয়ে এদিকে আসছে। আবার মনে হলো, সে তো অনেকক্ষণ আগের কথা। এটা নতুন দলও হতে পারে। আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। কোনো কিছু না ভেবে দুই শ গজ দূরে অগ্রসরমান পাকিস্তানি সেনাদের লক্ষ্য করে, সময় নিয়ে নিশানা ঠিক করে দুই রাউন্ড গুলি ছুড়তেই ওরা তৎক্ষণাৎ লে-ডাউন। কেউ মরল কি না, তা আর দেখার বা হিসাব করার সময় তখন নেই। ওই রাস্তাটা এই বাড়ির পাশ দিয়েই স্কুলের দিকে চলে গেছে। ডাবলু মুহূর্তের মধ্যে কোনদিকে যে অদৃশ্য হয়ে গেল, কিছুই অনুমান করা গেল না। নিজেকে এবার বড়ো বেশি একাকী মনে হতে লাগল। আমি কি সত্যিই পাকিস্তানি সেনাদের বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে গেছি? এক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে, এক দৌড়ে ডহরের বাঁক টপকে দক্ষিণদিকে ডাবলুদের বাড়ির সন্নিকটবর্তী চলে এলাম। পেছন ফিরে তাকাতেই দেখি ওই সেনাদলটা রাস্তা দিয়ে না এসে চাষ করা জমির ভেতর দিয়ে দৌড়ে আসছে। আমি আবারও গুলি ছুড়লাম ওদের দিকে। আগের মতো ওরা আবার শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়ে আমার দিকে গুলি করল দু-তিন রাউন্ড। সেই গুলি আমার শরীরের পাশ দিয়ে, এপাশ-ওপাশ দিয়ে বিচিত্র আওয়াজ তুলে চলে গেল। আর আমি দ্রুত হজো-ডাবলু এদের বিশাল বাড়িটার পেছনের অগভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম। দু-তিনটে ঘর বামে ফেলে একটু অগ্রসর হয়েই সামনে পড়ল ছোট্ট একটা বাঁশঝাড়, দু-তিনটে আম-কাঁঠালের গাছ আর হামঝুম গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়ালাম। পজিশন খুঁজছি, বামে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখি, ১৫ গজ দূরে সেই সেনাদল দাঁড়ানো, একজন আমার দিকে হাত তুলে ইশারা করে দেখাচ্ছে আর অন্যদের কী যেন বলছে। আমি সেখানেই ধপ করে বসে পড়লাম। ওহ, সৌভাগ্য আমার! পাশে একটা পুরোনো গর্ত, লাফিয়ে পড়লাম সেই গর্তের মধ্যে। গ্রামের বউ-ঝিরা এভাবে বাড়ির পাশে গর্ত করে মাটি তুলে কাদা বানিয়ে ঘরদোর লেপে। কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে ওরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল আমাকে। বেশ চিৎকার করে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলাবলি করল, ইংরেজি বা উর্দু– কোনোটাই না। বরং ওদের মাতৃভাষা, সেটা পাঞ্জাবি, পশতু বা বেলুচি ভাষা হতে পারে। গোটা পাড়া এমনকি গোটা গ্রামেই তখন উভয় পক্ষের গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে। গুলি চলছে খইয়ের মতো ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা, ড্যা-ড্যা-ড্যা-ড্যা, ঠা-ঠা-ঠা-ঠা, গুড়ুম-গুড়ুম, তাক-ডুম-চোঁ, নানা অস্ত্রের নানা সুর, যেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। গোটা গ্রাম একটা বড়ো চুলা আর সেই চুলায় বালুভর্তি উত্তপ্ত পাতিলে মড়মড়, পড়পড় করে খই ভাজছে কোনো বাড়ির বউ। মুক্তিযোদ্ধা, পাকিস্তানি সেনা সবার অস্ত্র থেকেই বের হচ্ছে অবিরাম গুলি আর গুলি। তারপরই দুদিক থেকে ব্রাশফায়ারের গুলি এসে লাগলো আমার মাথা থেকে তিন-চার ফুট দূরে বাঁশঝাড়ের গোড়ায়। গুলিতে দু-তিনটা বাঁশ মড়মড় করে ভূপাতিত হলো। আমার মাথার ওপর দিয়েও চলে গেল অসংখ্য গুলি। পাকিস্তানি সেনারা হয়তো ভাবল, এবার আমি মরেছি।

আমার এসএলআরের বাঁট বগলের নিচে রেখে শক্তভাবে ধরে গর্তে বসে অপেক্ষায় ছিলাম, পাঁচ সেকেন্ড পরে খাকি পোশাক পরা একজন পাকিস্তানি সেনা জঙ্গলে ঢুকে আমার তিন-চার হাত দূরে এসে দাঁড়াতেই দুদফা ট্রিগার টিপে দিলাম ওর বুক লক্ষ্য করে। ওর ডানদিকে মাটিতে তাকালেই আমাকে দেখতে পেত। কিন্তু সেটা আর হয়নি। সে নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিলাম, দেশমাতৃকার জন্য মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছি, কোনোকিছুর বিনিময়ে আসিনি, চাকরিও করছি না। আমার এদেশকে শত্রুমুক্ত করতে আমাকেই লড়তে হবে। মায়ের সম্ভ্রম রক্ষা করবে তার সন্তান– এটাই তো হওয়া উচিত। তাছাড়া আর কে লড়বে এইভাবে জান বাজি রেখে! আমি একজন শত্রুকে খতম করেছি, এখন যদি মরেও যাই তাতে কোনো দুঃখ থাকবে না আমার।

আরও ১০ সেকেন্ড কাটল। দেখলাম নিহত পাকিস্তানি সেনার কোনো নড়চড় নেই। ওর পাশেই পড়ে থাকা হেলমেটটা হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে নিজের মাথায় পরে নিলাম ঝটপট। আমরা গেরিলাযোদ্ধা, আমাদের এসব সরঞ্জাম নেই, খুব বেশি দরকারও পড়ে না। কিন্তু খুবই প্রয়োজন হয় এরকম সামনাসামনি যুদ্ধে। তবে এমন জঙ্গলে দুপক্ষের যুদ্ধ কী রকম হতে পারে, এরও ট্রেনিং আমরা নিয়েছি শিলিগুড়ি-পানিঘাটার ট্রেনিং ক্যাম্পে। রাত ১০টার পরে আমাদের পুরো কোম্পানি দুভাগে বিভক্ত হয়ে একপক্ষ হতাম পাকিস্তানি শত্রুসেনা আর অন্যপক্ষ মুক্তিযোদ্ধা। অস্ত্রে লোড করা থাকত বুলেটবিহীন গুলি। সব গ্রুপের সঙ্গেই থাকতেন একাধিক উস্তাদ। তারপর চলে যেতাম সেই পাহাড়ি গভীর জঙ্গলে। যুদ্ধ হতো তুমুল। শত্রুর খোঁজ করা, রেইড (সরাসরি আক্রমণ) বা অ্যামবুশ (শত্রুর জন্য কোথাও ওতপেতে বসে থাকা, সুযোগ এসে গেলে হামলা চালানো)। জয়-পরাজয়ও ছিল– সেগুলো নির্ধারণ করতেন আমাদের প্রধান প্রশিক্ষক, একজন মেজর। যা শিখেছি যেন হুবহু তা-ই ঘটে যাচ্ছে। ঘাপটি মেরে বসে আছি, আমার চারপাশে কোনো সাড়াশব্দ নেই। আবার সুনসান নীরবতা। ধারেকাছে আর গোলাগুলি নেই। এ সময় বাম পাশে ৭-৮ হাত দূরে একটা মোটা আমগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে একজন সেনাকে হঠাৎ ব্রাশফায়ার করতে দেখলাম। বড়ো বড়ো হামঝুম গাছের ডালপালা ও পাতার মধ্যে দৃষ্টি মেলে ভালোভাবে লক্ষ করে দেখলাম, তার অটোমেটিক অস্ত্রের ব্যারেল থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝরে পড়ছে আর তার শরীরের পেছনের খানিকাংশ দেখা যাচ্ছে। আমার এসএলআরের নিশানা ঘুরিয়ে আবার ঘন ঘন দুবার ট্রিগার চাপলাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম না যে, কী ঘটল। তবে সৈন্যটির গুলি থেমে গেছে।

মিনিটপাঁচেক কাটল। ডানদিকের জঙ্গলের ওপাশটায় ১০-১২ হাত দূরে দু-তিনজন পাকিস্তানি সেনার মধ্যে কথোপকথন শুনলাম। ব্যাগ থেকে একটা গ্রেনেড বের করে ছুড়ে মারলাম ওদের দিকে। হিসাব মতে চার সেকেন্ড পরে গ্রেনেড বিস্ফোরিত হওয়ার কথা; কিন্তু ১০ সেকেন্ডের মধ্যেও বিস্ফোরণ ঘটল না দেখে একটু নার্ভাস হয়ে পড়লাম। শীতের মধ্যেও শরীরে ঠান্ডা ঘাম অনুভব করলাম। ব্যাগে আরও একটা গ্রেনেড ছিল, সেটা বের করে খুলে দেখি, ভেতরে ডেটোনেটর পরানো হয়নি! ব্যস্ততার সঙ্গে ব্যাগ হাতড়ে কোনো ডেটোনেটর পাওয়া গেল না। পরক্ষণেই একজন উর্দুতে বলল, 'গ্রেনেড ফেকা হায়, ওঠা লো, ওঠা লো।'

ওই কথোপকথনের শব্দের দিকে অস্ত্রের নল ঘুরিয়ে কয়েক রাউন্ড গুলি করলাম অন্ধের মতো। আর তখন ওদের দিক থেকে ধুপধাপ পায়ের শব্দ কানে এলো, ভাবলাম যে কজন আশপাশে ছিল তারা পালিয়ে দূরে কোথাও চলে গেল। ওই শব্দ লক্ষ করে আবারও কয়েক রাউন্ড গুলি করলাম। তবে আমার দিকে কোনো পালটা গুলি আর এলো না।

এরপর প্রায় এক ঘণ্টা চুপচাপ বসে কাটল। চারদিকে তখনও গুলি চলছে অবিরাম। মাথা তুলে চেয়ে দেখব কিংবা দাঁড়াব, সে উপায় নেই। ক্ষণে ক্ষণে গাছের ছোটোখাটো ডালপালা আর পাতা গুলির আঘাতে ছিঁড়ে পড়ছে গায়ে। পেছনদিকে তাকিয়ে দেখি, সেই গর্তের পাশ থেকে শুরু হয়েছে বড়ো একটা কাঁটাবেতের ঝাড়। ওই গভীর বেতঝাড় আমার পেছন দিকে প্রতিরক্ষা দেওয়াল হিসেবে কাজ করছে সন্দেহ নেই। আমার পেছনদিক থেকে কেউ এসে গুলি করার তেমন কোনো আশঙ্কা নেই ভেবে আশ্বস্ত হই যেন।

এই অবসরে অলস সময় কেটে যেতে লাগল। নানা চিন্তায় মন ডুবে গেল। যদি এখন মরেই যাই, তাহলে মৃত্যুর পর কী কী ঘটবে, মওলানা-মুসল্লিদের বয়ান ও ওয়াজ-নসিহতে যা যা শুনেছি, বইপত্রে যা কিছু ইতোমধ্যে পড়েছি, সেগুলো আবার মনে করতে লাগলাম। কিন্তু কোনোকিছুই গুছিয়ে একত্রিত করতে পারলাম না। শুধু এইটুকু মনে হতে লাগল, পার্থিব জীবনের হয়তো এখানেই ইতি ঘটতে যাচ্ছে। এরপরই শুরু হবে পারলৌকিক জীবন, অনন্তকালের জন্য আমাকে সেখানেই থাকতে হবে। যে কোনো মুহূর্তে শহিদ হয়ে যাব হয়তো। মা-বাবা আর ছোটো দুবোনের মুখচ্ছবি ভেসে উঠল মনের আয়নায়– কে কোথায় আছে, জানি না। ওদের সঙ্গে দেখা হবে না। মা-বাবার একমাত্র ছেলে, স্কুলের গণ্ডিই এখন পর্যন্ত পেরুতে পারিনি, নিজেকে একরকম লুকিয়েই, কাউকে কিছু না বলে, দেশের টানে চলে এসেছি মুক্তিযুদ্ধে। প্রথমে কেঁচুয়াডাঙ্গা রিক্রুটিং ক্যাম্প, পরে গৌড় ট্রানজিট ক্যাম্প, অতঃপর পানিঘাটা ট্রেনিং ক্যাম্প ও তরঙ্গপুর সেক্টর হেডকোয়ার্টার হয়ে জলঙ্গি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ।

এই রকম এলোমেলো ভাবনায় ডুবে গিয়ে একটু বেশিরকম অন্যমনস্ক আর অসতর্ক হয় পড়েছিলাম বোধহয়। কেননা ডানদিক থেকে একজন পাকিস্তানি সেনা এক-পা দু-পা করে কখন যে আমার একেবারে কাছে চার-পাঁচ ফুটের মধ্যে চলে এসেছে, বুঝতেই পারিনি। শোনামাত্র ব্যাগ হাতড়ে গুলিভর্তি নতুন ম্যাগাজিন লাগাতে লাগাতেই চলে গেল তিন-চার সেকেন্ড, ততক্ষণে দৌড়ে পালিয়ে গেল শত্রু, আর আমি কিছুই করতে পারলাম না– যাহ্। ভাবলাম, সৈনিকটা তো আমাকে ওই মুহূর্তে জীবিতই ধরতে পারত, কিংবা গুলি করে হত্যাও করতে পারত, কিছু করার ছিল না। তবু একবারও সে আমার দিকে চোখ ফিরে তাকায়নি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, এ যাত্রায় নিস্তার পাওয়ার জন্য। নাহ, এলোপাতাড়ি গুলি আর খরচ করব না। আক্কেল আমার হয়েছে। আচম্বিতে ঘটে যাওয়া এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে এবারই প্রথম ভয়ে শিউরে উঠল গা।

বিকাল ৩টা পর্যন্ত ওই গর্তের মধ্যে চুপচাপ বসে বসে কাটল আমার যতক্ষণ না গোলাগুলি থামল। গর্ত থেকে উঠব উঠব ভাবছি, এমন সময় একজন গ্রামবাসী ওই জঙ্গলের ভেতর ঢুকে মৃত একজন পাকিস্তানি সেনার নাকে-মুখে হাত দিয়ে পরখ করতে শুরু করল সেনাটা মরেছে নাকি এখনো জ্যান্ত! আমি কোনো কথা না বলে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলাম, সে আমার দিকে তাকায় কি না সেই অপেক্ষায়। ভাবলাম সে তাকালেই তো আমি তাকে প্রশ্ন করে জানতে পারি পাকিস্তানি আর্মিরা সবাই চলে গেছে কি না। মিনিটখানেক পরে সে আমার দিকে তাকাল বটে, কিন্তু একপলক তাকিয়েই জবাই করা গরুর মতো গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে ঊর্ধ্বশ্বাসে দিল দৌড়– যেদিক

আসলে রাজাকারগুলোকে পাঠানো হয়েছিল বলির পাঁঠা হিসেবে, কিংবা শুধুই লুটতরাজ করতে। পরে গোলাগুলির শব্দে এই এলাকায় মুক্তিবাহিনীর অবস্থান টের পেয়ে ওরা তিনদিক থেকে আমাদের আক্রমণ চালিয়েছে

মনে হলো পাকিস্তানি সেনাটা কী যেন খুঁজছে। নাকি আমাকেই জীবিত ধরতে চায় ব্যাটা! একই সঙ্গে আমাদের চার চোখের মিলন হওয়ামাত্র আমার অস্ত্রটা আবার গর্জে উঠল পরপর দুবার। সৈন্যটা শুধু উহ্ শব্দ করে ঘুরে পড়ে গেল আমার মাত্র এক গজ দূরে। গুলি লেগেছে ওর পেট আর কোমরে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে এবার ওর মাথায় ব্যারেল ঠেকিয়ে আরও একবার ট্রিগার চাপলাম। এবার স্তব্ধ হলো চিরদিনের মতো।

যুদ্ধের ময়দান তখন কিছুটা শান্ত। প্রমাদ গুনলাম, আসলে রাজাকারগুলোকে পাঠানো হয়েছিল বলির পাঁঠা হিসেবে, কিংবা শুধুই লুটতরাজ করতে। পরে গোলাগুলির শব্দে এই এলাকায় মুক্তিবাহিনীর অবস্থান টের পেয়ে ওরা তিনদিক থেকে আমাদের আক্রমণ চালিয়েছে। কিছুক্ষণ পর পর ঠুসঠাস গুলির শব্দ ভেসে আসছে গ্রামের পশ্চিমপাড়ার দিক থেকে। এখন কী করব ভাবছি। হঠাৎ দেখি, আরেকজন পাকিস্তানি সেনা সেই ঝোপের মধ্যে ঢুকে ওদের মৃত সাথীদের লাশের কাছে পড়ে থাকা অস্ত্রগুলো তুলে নিচ্ছে। তৎক্ষণাৎ গুলি করার চেষ্টা করলাম; কিন্তু আমার সে চেষ্টা ব্যর্থ হলো। কারণ, ম্যাগাজিন কখন যে খালি হয়ে পড়েছে, তা খেয়াল করিনি। ট্রিগারে আঙুলের চাপ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফাঁকা চেম্বারে পিস্টনব্রিজের আঘাতের অতিপরিচিত খটাস শব্দটা থেকে সে এসেছিল সেদিকে। হয়তো বেচারা ভীষণ ভড়কে গেছে। কারণ আমার মাথায় তখনও আর্মির হেলমেট। লোকটার কাণ্ডকীর্তি দেখে আমি টেনশনের মধ্যেও না হেসে পারলাম না। ভাবলাম, পরিস্থিতি নিশ্চয়ই এখন স্বাভাবিক, তা না হলে লোকটা এভাবে এখানে আসতে পারত না। কাজেই আমি এখন গর্ত থেকে উঠতে পারি। উঠে দাঁড়াতেই দেখি চারদিক থেকে বেশকিছু লোকজন আমার দিকে ছুটে আসছে। কাছে এসেই কয়েকজন আমাকে কাঁধে তুলে নাচতে শুরু করে দিল। সেই ডাবলু দৌড়াতে দৌড়াতে এসেই আমাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'আরে! তুমি এখনো জীবিত আছ? আমরা তো ধরেই নিয়েছি যে, ওরা তোমাকে মেরে ফেলেছে। কী আশ্চর্য!'

এরপর উনি মৃতদেহগুলো হাতড়াতে শুরু করলেন। একটু পর আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'এই নাও, ওদরে পকেটে টাকা, চিঠিপত্র আর হাতঘড়ি পাওয়া গেছে।'

গুনে দেখলাম, আটষট্টি টাকা।

লোকজনের ভিড় বেড়ে যেতে লাগল। আমি কয়েকজন গ্রামবাসীর সহায়তায় লাশ তিনটা জগন্নাথপুর নিয়ে গেলাম। লাশের দুই হাত, দুই পা দড়ি দিয়ে বেঁধে মাঝখানে বাঁশ ঢুকিয়ে সামনে-পেছনে দুজন করে বইয়ে নিয়ে চললাম। আমাদের সঙ্গে বহুলোক। লাশগুলো টেনে নিতে

সবাই যেন হিমশিম খেয়ে গেল। গ্রামের অনেক লোকজন সেই পথ ধরে চরমিরকামারি থেকে জয়নগর বা জগন্নাথপুরের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল। গুলিবিদ্ধ ফুটফুটে চেহারার এক বালিকাকে দেখলাম, পিঠে গুলি লেগে বুকের ভেতর আটকে আছে। বুকের একখানে সামান্য ফুলে উঠেছে। মেয়েটি তখনও জীবিত। সঙ্গী লোকটাকে বললাম, 'তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও।'

বাহকদের, লাশগুলো কোথাও পুঁতে রাখতে নির্দেশ দিয়ে আমার কোম্পানি কমান্ডারের খোঁজ করলাম। খুঁজতে খুঁজতে জয়নগরের একটা বাড়ির উঠোনে তাঁকে পাওয়া গেল। আমাদের ব্রাভো কোম্পানির অন্য একটি সেকশনের কয়েকজন রাস্তা থেকে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো সেখানে। সন্ধ্যা নেমেছে তখন। ফরসা ধবধবে পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত কোম্পানি কমান্ডার সিরাজুল ইসলাম মন্টু তখন মাটি ও লাকড়ি দিয়ে তৈরি ক্ষুদ্র একটা বাড়ির উঠানে একটা চেয়ারে বসে কয়েকজন লোকের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। লোকগুলো চারপাশে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল মনোযোগ দিয়ে। আমি তাঁকে দেখেই আবেগে তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করলাম। এখানে যে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো, সে হচ্ছে মানিকনগরের আবদুল বারি। ওর সঙ্গে আরও তিন-চারজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা। ওরা সবাই আমার সঙ্গেই ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে। একপর্যায়ে কোম্পানি কমান্ডার আমার কাছ থেকে জানতে চাইলাম, 'এখন কী করব?' কোম্পানি কমান্ডার আত্মস্থ হাসি দিয়ে বললেন, 'ওদের সঙ্গে এখন চ্যালেঞ্জে যাওয়া যাবে না। তাছাড়া তোমরা তো সারাদিন অনাহারে রয়েছ। আওয়ার ফাইট ইজ সাসপেন্ডেড।'

'কিন্তু ওরা যে গ্রামটা জ্বালিয়ে দিচ্ছে', আমি আবারও বললাম। মন্টু মাথা ঝাঁকি দিয়ে বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে, হিসাব করেছি– থারটি-থ্রি সোলজার্স অব দ্য অপজিশন আর কিল্ড। আমাদের কোনো লাইফ লস হয়নি। নো মোর, মতি। নাউ লিভ ইট।'

ওই ৩৩ জন পাকিস্তানি সেনার মৃত্যু তিনি কীভাবে নিশ্চিত হয়েছিলেন, তা আমি জানি না। তবে এটা ঠিক, সারাদিনের রিপোর্ট জোগাড় করা তেমন কোনো কঠিন কাজ ছিল না।

যুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে বৃষ্টির মতো বিভিন্ন অস্ত্রের গুলির প্রচণ্ড শব্দে মাটি পর্যন্ত কাঁপতে লাগল। বাড়ির বাইরে এসে ছোটো একটা কাঁঠালগাছের নিচে দাঁড়াই। মিরকামারির দিকে তাকালাম। গ্রামের প্রায় সব বাড়িই তখন দাউ দাউ আগুনে জ্বলছে। সেই আগুনের লেলিহান শিখা ৪০-৫০ ফুট বা এরও বেশি উপরে উঠে গেছে। প্রজ্বলিত আগুনের আলোয় রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারও আলোময় হয়ে উঠেছে।

এখানে আসার পথে কয়েকজন সহযোদ্ধা আমাকে ডাক দিয়ে বলেছে, এই যে বীর মুক্তিযোদ্ধা, তুমি সত্যিই একজন বীর! কিন্তু ওদের

যুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে বৃষ্টির মতো বিভিন্ন অস্ত্রের গুলির প্রচণ্ড শব্দে মাটি পর্যন্ত কাঁপতে লাগল। বাড়ির বাইরে এসে ছোটো একটা কাঁঠালগাছের নিচে দাঁড়াই

পাকিস্তানি সেনাদের দেহ তল্লাশি করে পাওয়া হাতঘড়ি, আইডেন্টিটি কার্ড, উর্দুতে লেখা একখানা চিঠি, ফটোগ্রাফ– এগুলো নিয়ে বললেন, 'এসব আমাকে দাও, এক্সপার্ট দিয়ে পরীক্ষা করাতে হবে, ঘড়িতে ওয়্যারলেস থাকতে পারে। আর চিঠিতে কী লেখা আছে সেসবও জানতে হবে।'

হাতঘড়ির মধ্যে ওয়্যারলেস? সত্য হতে পারে মাসুদরানা বা জেমস বন্ড কাল্পনিক গোয়েন্দা সিরিজের বইয়ে কোনো দুর্ধর্ষ এজেন্টের হাতে থাকা ঘড়ির ক্ষেত্রে; কিন্তু ব্যাটেলফিল্ডে কোনো সৈনিকের হাতঘড়ির ক্ষেত্রে সেটা অবান্তর বলেই মনে হলো আমার কাছে। যা হোক, এসব ব্যাপারে কথা বাড়ানো অনুচিত মনে করে চুপ করে রইলাম। পরে উনি কী যেন ভেবে টাকাগুলোসহ শুধু মানিব্যাগটা আবার আমার হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে চারিদিকে। সেই মুহূর্তে হঠাৎ করে চরমিরকামারির দিক থেকে হেভি মেশিনগানের অবিরাম গুলির শব্দ আসতে লাগল। ওদিক থেকে আবারও লোকজনকে দৌড়াদৌড়ি করে এদিকে চলে আসতে দেখলাম। কিছুক্ষণ পরই দূরের বাড়িঘরগুলো দাউ দাউ জ্বলে উঠল। সেই আলোতে আলোকিত হয়ে উঠল এ গ্রামের মাঠঘাট, লোকালয়। কোম্পানি কমান্ডারের কাছে কথায় কান দেওয়ার মতো সময় তখন আমার ছিল না। পেটের ক্ষুধাও কোথায় যেন উবে গেছে তখন। ওই প্রজ্বলিত আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা মুষড়ে গেল যেন। আমার হাতের মুঠোয় তখনও গুলিভর্তি অস্ত্রটা আছে, আর আমি নীরব-নিথর হতভম্বের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। কিছুই করতে পারছি না। আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি গোটা মিরকামারি গ্রামটা কীভাবে আজ হঠাৎ করে মাটির সঙ্গে মিশে গেল। বারবার মনে হতে লাগল, এই অঘটন ঘটার জন্য আমার সেকশন কমান্ডার আর আমার হঠকারিতাই কি দায়ী?

পরে এই বলে নিজেকে প্রবোধ দিলাম, কিছু মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয়তো হয়েছে, যা কোনোভাবেই পূরণ হওয়ার নয়; কিন্তু স্বাধীনতার জন্য যে যুদ্ধ, মাতৃভূমির জন্য যে যুদ্ধ, জীবন বাজি রেখে যে যুদ্ধ, লাখো প্রাণের বিনিময়ে যে যুদ্ধ, অগণিত মা-বোনের সম্ভ্রম হারানোর বিপরীতে অথবা আমার অংশ নেওয়া মিরকামারি, জয়নগর, শাহাপুর, বাশেরবাদা যুদ্ধে যে ক্ষতি, তা সারাদেশের তুলনায় নিতান্তই সামান্য। আবার এই সবকিছুর চেয়ে অনেক বড়ো স্বাধীনতা। কাজেই এ যুদ্ধে যে আমাদের জয়ী হতেই হবে!

লেখক: সাংবাদিক, সাবেক সভাপতি ঈশ্বরদী প্রেস ক্লাব

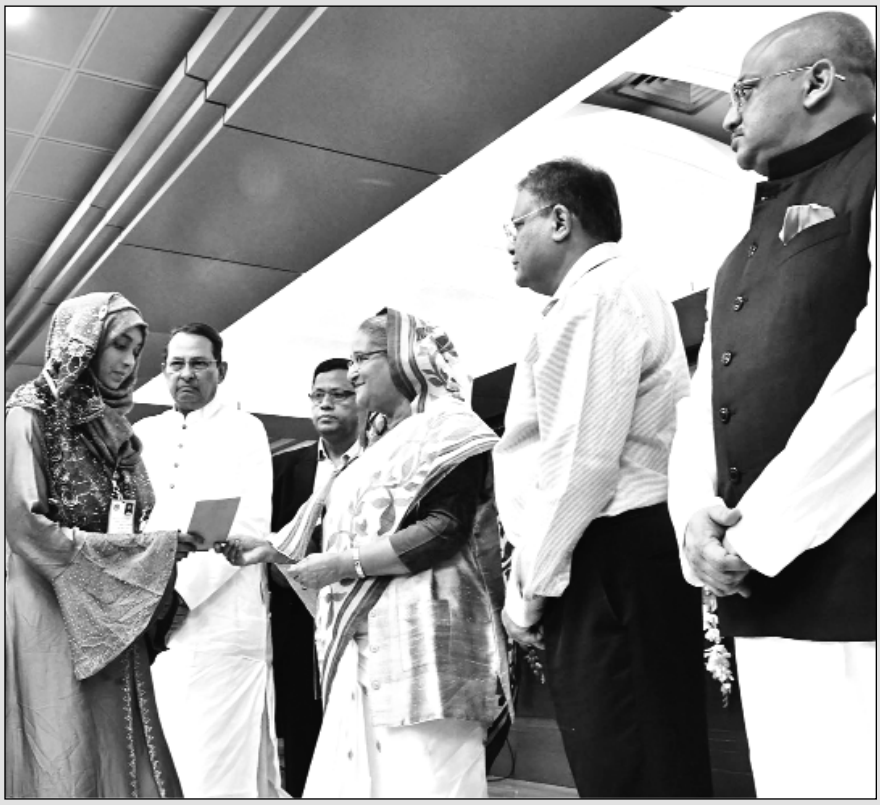

সাংবাদিকদের পাশে আছে সরকার: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সরকারি তহবিল থেকে অসুস্থ ও আহত সাংবাদিকদের সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতার চেষ্টা করা হবে। সরকার সাংবাদিকদের পাশে আছে এবং থাকবে। ৭ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অসুস্থ, অসচ্ছল ও দুর্ঘটনায় হতাহত সাংবাদিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক আর্থিক অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী গণমাধ্যমের উন্নয়নে তার সরকারের গৃহীত কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরে বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার যত বেশি উন্মুক্ত করে দেয়, যত সুযোগ দেয়, তত সমালোচনারও সম্মুখীন হয়। আগে কথাও বলতে পারত না, কাজেই সে সমালোচনাও করতে পারত না। সেটা আমি চিন্তা করি না। আমি মনে করি, কাজ করব দেশের জন্য এবং নিজের আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করি। গত এক দশকে বাংলাদেশ আজ আর্থসামাজিকভাবে উন্নতি করেছে, দেশ এগিয়ে গেছে।

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য বেসরকারি পর্যায়ে ট্রাস্ট ফান্ডেও অনুদান দিয়েছি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের টেলিভিশনের আর্থিকভাবে সচ্ছল মালিকদের বলেছিলাম এসব ট্রাস্ট ফান্ডে যেন অনুদান দেয়। কিন্তু ইত্তেফাক থেকে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এবং স্কয়ার গ্রুপের মাছরাঙা থেকে অঞ্জন চৌধুরী– এই দুইজনই বোধহয় অনুদান দিয়েছেন। আর কেউ দিয়েছে কি না, জানি না। অথচ সবাই যদি একটু একটু করে দেয় এবং সব সময় যদি দিতে থাকে তাহলে কিন্তু ভালো একটা অ্যামাউন্ট জমা হয়। আমরা সরকারের পক্ষ থেকে সিড মানি যেটা, সেটা দিয়ে ট্রাস্ট ফান্ড করে দিয়েছি।

গণমাধ্যমকর্মীদের চাকরিতে অনিশ্চয়তা, বেতনভাতা, পেনশন, চিকিৎসা ভাতাসহ বিভিন্ন অস্থিরতার প্রসঙ্গ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমারা চেষ্টা করছি, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এভাবে ট্রাস্ট ফান্ড করে যাচ্ছি। কিন্তু এখানে যদি নিজেদের গরজ থেকেও কিছু দেওয়া হয়, তাহলে একটা ভালো অ্যামাউন্টও জমা হয় এবং সেটা নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পত্রিকার মালিক পক্ষ যদি সরকারি উদ্যোগে সহযোগিতা করে, তাহলে তা একসময় বড়ো ফান্ডে পরিণত হবে– যা অসুস্থ ও আহত সাংবাদিকদের জন্য ব্যয় করা হবে। এতে সাংবাদিকদের কষ্ট কমবে। তিনি বলেন, আমি ব্যক্তিগত ও সরকারিভাবে সব সময় চেষ্টা করে যাব অসুস্থ ও আহত সাংবাদিকসহ সব মানুষের সাহায্য-সহযোগিতায় পাশে থাকার জন্য। এদিন সারাদেশের ৫৩ জন অসুস্থ, অসচ্ছল ও দুর্ঘটনায় আহত এবং প্রয়াত সাংবাদিক পরিবারের সদস্যদের হাতে কল্যাণ ট্রাস্টের সহায়তার-অনুদানের অর্থ তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

উল্লেখ্য, তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে অনুদান নীতিমালা অনুসারে ২০১১-২০১২ থেকে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর পর্যন্ত ৬২৩ জন সাংবাদিক ও সাংবাদিক পরিবারকে ৩ কোটি ৮০ লাখ টাকা দেওয়া হয়। এছাড়া বাংলাদেশে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর থেকে ২০১৯ সালের ৭ নভেম্বর পর্যন্ত ১১৬৭ জন সাংবাদিক ও সাংবাদিক পরিবারকে ৯ কোটি ৬৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা সহায়তা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান এবং তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হাসানুল হক ইনু ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. নজিবুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব সাজ্জাদুল হাসান, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম, বাসসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কালাম আজাদ, সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ, বিটিভির মহাপরিচালক এসএম হারুনুর রশিদ, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ সাংবাদিক নেতারা উপস্থিত ছিলেন। তথ্য সচিব আবদুল মালেক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

রেডিও এশিয়া সম্মেলন উদ্বোধনে তথ্যমন্ত্রী

ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে ভূমিকা রাখছে বেতার

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, সামাজিক, মানবিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ রক্ষায় বেতারের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান সরকার দারিদ্র্য ও দুর্নীতিমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রেও বাংলাদেশ বেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২৯ অক্টোবর রাজধানীর হোটেল ইন্টারকনটিনেন্টালে তিনদিনব্যাপী 'এবিইউ রেডিও এশিয়া কনফারেন্স অ্যান্ড রেডিও সং ফেস্টিভ্যাল' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী এ কথা বলেন। তথ্য সচিব আবদুল মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান ও এবিইউর সেক্রেটারি জেনারেল জাভেদ মোত্তাগি। স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক নারায়ণ চন্দ্র শীল।

বাংলাদেশ বেতার ও এশিয়া প্যাসিফিক ব্রডকাস্টিং ইউনিয়নের (এবিইউ) এ উৎসবে সহযোগিতা করে বাংলাদেশ টেলিভিশন। বাংলাদেশে প্রথমবার এ সম্মেলন হয়। সম্মেলনের প্রতিপাদ্য– 'রেডিও অল অ্যারাউন্ড আস: মোর দ্যান জাস্ট অ্যা মিডিয়াম'।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে রেডিওর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিকামী বাঙালির রেডিও সম্প্রচার কেন্দ্র ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। এই বেতার কেন্দ্র স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা সম্প্রচার করার পাশাপাশি দেশের মাটিতে যুদ্ধে অংশ নিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সম্মেলনে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, জার্মানি, পর্তুগাল, মিসর, রোমানিয়া, তুর্কমেনিস্তান, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, নেপালসহ ২২টি দেশের ২১২ জন রেডিও এবং গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব অংশ নেন। ৬২ বিদেশি প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনস্থলে ছিল প্রাচীন রেডিও সেট, কমিউনিটি রেডিও কার্যক্রম ও বাংলাদেশ বেতারের গৌরবময় ইতিহাসের প্রদর্শনী।

সূত্র: ৩০ অক্টোবর ২০১৯, সমকাল

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার নিচ্ছেন সাবিনা ইয়াসমিন

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

সামাজিক অবক্ষয় রোধে সুস্থ চলচ্চিত্র নির্মাণ করুন

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান ৮ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। এদিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে চলচ্চিত্রশিল্পীদের অবদানের সর্বোচ্চ স্বীকৃতির এই পুরস্কার বিজয়ীদের হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠানে ২০১৭ ও ২০১৮ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার দেওয়া হয়। দুই বছরের ২৮টি শাখায় ৬৩ জনকে দেওয়া হয় পুরস্কার।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান ও তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হাসানুল হক ইনু। স্বাগত বক্তব্য দেন তথ্য সচিব আবদুল মালেক।

বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা এটিএম শামসুজ্জামান ও অভিনেত্রী সালমা বেগম সুজাতা যৌথভাবে চলচ্চিত্রজগতে অবদানের জন্য ২০১৭ সালের আজীবন কৃতিত্বের পুরস্কার অর্জন করেন। অভিনেতা, প্রযোজক ও পরিচালক এমএ আলমগীর ও অভিনেতা প্রবীর মিত্র ২০১৮ সালের আজীবন পুরস্কার অর্জন করেন।

অনুষ্ঠানে মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতিসহ সামাজিক অবক্ষয় রোধে সমাজ ও জীবনমনস্ক সুস্থ চলচ্চিত্র নির্মাণের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পুরস্কার বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমি মনে করি, জীবনঘনিষ্ঠ চলচ্চিত্র যত বেশি নির্মাণ করা যাবে, আমাদের জন্য সেটা তত বেশি মঙ্গলজনক হবে।'

চলচ্চিত্রের গুরুত্ব তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, 'শিল্পকলার সব মাধ্যমের সমন্বয়ে চলচ্চিত্র সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম। এ মাধ্যম ব্যবহার করে মানুষের চিন্তাচেতনা, মননে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব। মানুষের মধ্যে গভীর দাগ কাটতে পারে এবং মানুষকে আরও সুন্দর পথে চলার প্রেরণা দিতে পারে চলচ্চিত্র।' চলচ্চিত্রে অসুস্থ ধারার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, '১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যার পর আমাদের সাংস্কৃতিক জগতেও অপসংস্কৃতির প্রচলনটা খুব দেখতে পেলাম। এই শিল্পকে এমনকি এমন এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যে, পরিবার-পরিজন, ছেলেমেয়ে নিয়ে সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখার সেই পরিবেশটাও ছিল না। আমরা সেই অশুভ জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেছি। এখন অনেক বেশি সমাজ সংস্কারমূলক, আবেদনমূলক চলচ্চিত্র হচ্ছে, যার জন্য মানুষের আগ্রহ বাড়ছে।'

এর আগে বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার।

সূত্র: ৯ নভেম্বর ২০১৯, কালের কণ্ঠ

জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'মুক্তিযুদ্ধ কর্নার'

জাতীয় প্রেস ক্লাবের লাইব্রেরিতে স্থাপন করা হয়েছে 'মুক্তিযুদ্ধ কর্নার'। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নতুন ২৬০টিসহ পাঁচ শতাধিক বই নিয়ে স্থাপন করা হয়েছে কর্নারটি। ১৪ ডিসেম্বর এই কর্নারের উদ্বোধন করেন মুক্তিযুদ্ধের সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর এএসএম সামছুল আরেফিন। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি সাইফুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন মেজর এএসএম সামছুল আরেফিন।

গবেষক সামছুল আরেফিন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চিরঞ্জীব করে রাখতে সাংবাদিকদের এগিয়ে আসার আহ্বান

জাতীয় প্রেস ক্লাবের লাইব্রেরিতে উদ্বোধন করা হয় মুক্তিযুদ্ধ কর্নার

জানিয়ে বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের গবেষণা, মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ– সবকিছুই পত্রপত্রিকার মাধ্যমে তুলে ধরা সম্ভব। আর এজন্য আগামী প্রজন্মকে দিকনির্দেশনা দিতে হবে। তা না দিতে পারলে হয়তো একদিন মানুষের মন থেকে মুক্তিযুদ্ধ মুছে যাবে।'

সূত্র: ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯, কালের কণ্ঠ

মাহফুজ আনাম

নঈম নিজাম

সম্পাদক পরিষদের কমিটি গঠন

মাহফুজ আনাম সভাপতি নঈম নিজাম সম্পাদক

দেশের জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকদের সংগঠন সম্পাদক পরিষদের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম সভাপতি ও বাংলাদেশ প্রতিদিন সম্পাদক নঈম নিজাম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। ১৫ সেপ্টেম্বর রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ডেইলি স্টার ভবনে সম্পাদক পরিষদের বৈঠকে নতুন এ নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটিতে ইত্তেফাকের সম্পাদক তাসমিমা হোসেন সহসভাপতি, বণিক বার্তার সম্পাদক ও প্রকাশক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং সমকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন।

পাশাপাশি চারজন নির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তারা হলেন ভোরের কাগজ সম্পাদক শ্যামল দত্ত, মানবজমিন সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, যুগান্তরের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাইফুল আলম ও দৈনিক আজাদীর সম্পাদক এমএ মালেক। সম্পাদক পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন সমকালের প্রয়াত সম্পাদক গোলাম সারওয়ার।

উল্লেখ্য, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকার সুরক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন, সাংবাদিকতার পেশাগত মানোন্নয়ন ও সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে সম্পাদক পরিষদ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সূত্র: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯, সমকাল

ডিআরইউ অ্যাওয়ার্ড পেলেন ১০ সাংবাদিক

রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাগর-রুনি মিলনায়তনে ২৭ নভেম্বর ডিআরইউ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। ডিআরইউ সভাপতি ইলিয়াস হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। অনুষ্ঠানে ৯ ক্যাটাগরিতে ডিআরইউ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড হিসেবে ১০ বিজয়ীর হাতে ক্রেস্ট, সনদপত্র ও ৫০ হাজার টাকা মূল্যমানের চেক তুলে দেন মন্ত্রী।

সূত্র: ২৮ নভেম্বর ২০১৯, কালের কণ্ঠ

রফিকুল ইসলাম আজাদ

রিয়াজ চৌধুরী

ডিআরইউ নির্বাচন

সভাপতি আজাদ সম্পাদক রিয়াজ

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ইংরেজি দৈনিক ইনডিপেনডেন্টের বিশেষ প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম আজাদ এবং সাধারণ সম্পাদক এশিয়ান মেইল টোয়েন্টিফোর ডটকমের প্রধান প্রতিবেদক রিয়াজ চৌধুরী। ৩০ নভেম্বর ডিআরইউ'র সাগর-রুনি মিলনায়তনে ফল ঘোষণা করেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ ও সদস্য মনজুরুল আহসান বুলবুল।

সূত্র: ১ ডিসেম্বর ২০১৯, কালের কণ্ঠ

মীনা মিডিয়া পুরস্কার পেলেন ৪৫ গণমাধ্যমকর্মী

মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডের ১৫তম আসরে শিশুদের বিষয়ে কাজের জন্য ৪৫ গণমাধ্যমকর্মীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

দেশজুড়ে শিশুর অধিকার এবং শিশুর কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে আরও ভালো ও বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন তৈরিতে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্যই ইউনিসেফ বাংলাদেশ এই পুরস্কার চালু করে।

২৭ অক্টোবর রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে ২০১৯ সালের বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, অনলাইন ও ভিজুয়াল মিডিয়ার জন্য ১৪টি ক্যাটাগরিতে দেওয়া হয় এই পুরস্কার।

সূত্র: ২৮ অক্টোবর ২০১৯, প্রথম আলো

ইউএনসিএ স্বর্ণপদক পেলেন সাংবাদিক আনাস

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে সচেতনতামূলক প্রতিবেদনের জন্য জাতিসংঘ করেসপনডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের (ইউএনসিএ) 'দ্য প্রিন্স আলবার্ট টু অব মোনাকো অ্যান্ড ইউএনসিএ গ্লোবাল প্রাইজ' ২০১৯ স্বর্ণপদক জিতেছেন দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের অর্থনৈতিক সম্পাদক এজেএম আনাস। আনাস একই সঙ্গে দ্য হিউম্যানিটিরিয়ান পত্রিকার খণ্ডকালীন সাংবাদিক হিসেবেও কাজ করছেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা বাংলাদেশের নদীগুলোর মারাত্মক পরিবেশগত ঝুঁকি নিয়ে একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদন তৈরি করেন আনাস, যা অর্থনৈতিক মন্দা ও অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে ইউএনসিএ'র প্রতিবেদনে বলা হয়।

সূত্র: ২ ডিসেম্বর ২০১৯, ইত্তেফাক

কালের কণ্ঠের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হলেন মোস্তফা কামাল

কালের কণ্ঠের নির্বাহী সম্পাদক মোস্তফা কামাল পত্রিকাটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব লাভ করেছেন। তিনি আট বছর ধরে নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। শুরুতে ২০০৯ সালে তিনি সিনিয়র সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। ২০১০ সালে উপসম্পাদক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। কালের কণ্ঠে যোগদানের আগে তিনি প্রথম আলোয় বিশেষ প্রতিনিধি ছিলেন।

সূত্র: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯, ইত্তেফাক

জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত 'রূপসী বাংলা' জাতীয় ফটো প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম

সাংবাদিকতা থ্যাংকলেস জব

গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, সাংবাদিকতা একটা থ্যাংকলেস জব। একজন ভালো সাংবাদিকের কোনো ভালো বন্ধু থাকে না। তারা কঠিনকে ভালোবাসেন। ৭ নভেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'রূপসী বাংলা' শীর্ষক জাতীয় ফটো প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এ কথা বলেন। ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। **সূত্র:** ৮ নভেম্বর ২০১৯, সমকাল

বিটিভির ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

বাংলাদেশ টেলিভিশনের ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ছিল ২৫ ডিসেম্বর। ১৯৬৪ সালের এই দিনে তৎকালীন ডিআইটি ভবন (বর্তমানে রাজউক ভবন) থেকে পাকিস্তান টেলিভিশন করপোরেশন নামে সম্প্রচার শুরু করে বিটিভি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এর নাম বদলে হয় বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)। ১৯৭৩ সালে করপোরেশন থেকে অধিদপ্তরে পরিবর্তিত হয়। ১৯৭৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ডিআইটি ভবন থেকে রামপুরায় নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয় বিটিভি।

১৯৬৪ সালে যাত্রার দিন থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বিটিভির পর্দা ছিল ধ্রুপদী সাদাকালো ধারায়। ওই বছর ২৫ ডিসেম্বর থেকে বিটিভিতে রঙিন অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হওয়ার মধ্য দিয়ে নতুন যুগের সূচনা হয়। ২০০৩ সালে এসে ঢাকার পাশাপাশি চট্টগ্রামে পৃথক স্টেশনসহ দেশজুড়ে ১৪টি রিলে স্টেশনের মাধ্যমে ৫৬ হাজার বর্গমাইলের ৯৩ শতাংশ এলাকায় পৌঁছে যায় বিটিভির অনুষ্ঠানমালা। শুরু থেকেই বিটিভি টেরিস্ট্রিয়াল বা ভূকেন্দ্রিক সম্প্রচার করে।

সূত্র: ২৫ ডিসেম্বর ২০১৯, সমকাল

বাংলাদেশ বেতারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

বাংলাদেশ বেতারের ৮০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ছিল ১৬ ডিসেম্বর। রাষ্ট্রীয় এই সম্প্রচারমাধ্যমটির যাত্রা শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর। ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগ, সাতচল্লিশের দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ, পাকিস্তানি শোষণ, মুক্তির সংগ্রাম ও স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দেখেছে জনপ্রিয় এই গণমাধ্যমটি। অল ইন্ডিয়া রেডিওর ঢাকা কেন্দ্র হিসেবে যাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশ বেতারের। জন্মলগ্নে নাম ছিল ঢাকা ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্র। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এই সম্প্রচারমাধ্যম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে পরিচিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস মুক্তিকামী বাঙালিকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র অসামান্য ভূমিকা রাখে। ঢাকার শেরেবাংলা নগরে জাতীয় বেতার ভবন অবস্থিত।

সূত্র: ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯, সমকাল

জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

নবীন-প্রবীণ সদস্যের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে ২০ অক্টোবর জাতীয় প্রেস ক্লাবের ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে অনুষ্ঠিত হয় মিনি ম্যারাথন।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যায় কেক কাটেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি সাইফুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন। এ সময় প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সহসভাপতি ওমর ফারুক, সহসভাপতি আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া, যুগ্ম সম্পাদক শাহেদ চৌধুরী ও মাইনুল আলম, কোষাধ্যক্ষ শ্যামল দত্তসহ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র: ২১ অক্টোবর ২০১৯, সমকাল

৬৭ বছরে ইত্তেফাক

ঐতিহ্যবাহী দৈনিক ইত্তেফাক ২৪ ডিসেম্বর ৬৭ বছরে পদার্পণ করেছে। এ উপলক্ষ্যে ইত্তেফাক কার্যালয়ে ৬৭ পাউন্ড ওজনের কেক কাটা হয়। অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিম, গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়াসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্সের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু উপস্থিত ছিলেন। ১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর ইত্তেফাক দৈনিক হিসেবে যাত্রা শুরু করে। **সূত্র:** ২৫ ডিসেম্বর ২০১৯, ইত্তেফাক

ডেইলি সানের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের প্রতিষ্ঠান ডেইলি সানের নবম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও দশম বর্ষে পদার্পণ অনুষ্ঠান ২৪ অক্টোবর রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় ডেইলি সান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। দিনভর অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীসহ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সিটি মেয়র, সংসদ সদস্য, কূটনীতিক, রাজনীতিক, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিরা শুভেচ্ছা জানান।

সূত্র: ২৫ অক্টোবর ২০১৯, কালের কণ্ঠ

সমকালের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

তেজগাঁওয়ের সমকাল কার্যালয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। সরকারের মন্ত্রী, সাবেক মন্ত্রী, বিভিন্ন দলের শীর্ষ রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ, লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী, ব্যবসায়ী, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের প্রধানরা প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজনে সমকালকে শুভেচ্ছা জানান। ১৪ পেরিয়ে ১৫ বছরে পদার্পণ

জাতীয় প্রেস ক্লাবের ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাংবাদিক নেতাদের সঙ্গে কেক কাটেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ

করেছে সমকাল। এ সময় সমকাল পরিবার ও অতিথিরা গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রয়াত গোলাম সারওয়ারকে। সবার আস্থা ও নির্ভরশীলতায় পত্রিকাটি আগামী দিনের পথচলায় নতুন অনুপ্রেরণা পেয়েছে।

সূত্রঃ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯, সমকাল

সাংবাদিকরা আক্রান্ত হলে পুরো সমাজকে মূল্য দিতে হয়ঃ জাতিসংঘ মহাসচিব

জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, সাংবাদিকরা আক্রান্ত হলে পুরো সমাজকেই এর মূল্য দিতে হয়। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা না থাকলে বিশ্ব তথ্যের অভাবে ভোগে এবং সন্দেহের মধ্যে থাকে। ২ নভেম্বর আন্তর্জাতিক দায়মুক্তি অবসান দিবস উপলক্ষ্যে এক বিবৃতিতে এই মন্তব্য করেন গুতেরেস।

ইউনেস্কো নতুন প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০০৬ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১ হাজার ১০৯ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। এই হত্যার সঙ্গে জড়িত ৯০ ভাগ আসামির বিচার হয়নি। জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, সাংবাদিকদের রক্ষা করতে না পারলে আমরা তথ্য পাব না, আর তথ্য না পেলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব। ২০১৯ সালে ৪৩ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন, যা গত বছরের তুলনায় কম। গত বছর ছিল ৯০ জন। গেল পাঁচ বছরে (২০১৪-২০১৮) সাংবাদিক হত্যা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এর আগের পাঁচ বছরের তুলনায়।

সূত্রঃ ৩ নভেম্বর ২০১৯, ইত্তেফাক

ভারতে বিটিভির সম্প্রচার

বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) আনুষ্ঠানিক সম্প্রচার ভারতে শুরু হয়েছে। ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত চ্যানেল দূরদর্শন ডিটিএইচের মাধ্যমে বিটিভির রামপুরা ভবন থেকে ২ সেপ্টেম্বর সম্প্রচার কার্যক্রম উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।

সম্প্রচারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, সকাল সাড়ে ৯টায় ভারতজুড়ে বিটিভির পরীক্ষামূলক সম্প্রচার শুরু হয়েছে। বিকাল পৌনে ৪টায় আনুষ্ঠানিকভাবে সম্প্রচার কার্যক্রমের ঘোষণা দেন তিনি। হাছান মাহমুদ বলেন, এখন থেকে ভারতজুড়ে বিটিভির সম্প্রচার দিনরাত ২৪ ঘণ্টা চলবে।

সূত্রঃ ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯, সমকাল

বিশ্বে এ বছর ৪৯ সাংবাদিক নিহত

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে ২০১৯ সালেই বিশ্বজুড়ে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৪৯ জন সাংবাদিক। তবে এ সংখ্যা বিগত ১৬ বছরের তুলনায় অনেকটাই কম। এদিকে এ বছর সাংবাদিক নিহত হওয়ার সংখ্যা কমলেও বিভিন্ন দেশে ৩৮৯ জন সাংবাদিককে আটক করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করা ফ্রান্সভিত্তিক সংগঠন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার এ কথা জানিয়েছে।

সূত্রঃ ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯, কালের কণ্ঠ

শোক সংবাদ

অজয় বড়ুয়া

বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক, দৈনিক সংবাদের ক্রীড়া সম্পাদক ও বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মুক্তিযোদ্ধা অজয় বড়ুয়া (৭২) পরলোক গমন করেন। লন্ডনের সেন্ট বার্টস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১২ জুলাই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য অজয় বড়ুয়া বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সংবাদ সংগ্রহের জন্য লন্ডনে গিয়ে আকস্মিকভাবে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর টানা ১০ দিন স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর মারা যান। তিনি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

দিল মনোয়ারা মনু

সাংবাদিক, কলামিস্ট ও পাক্ষিক অনন্যার নির্বাহী সম্পাদক দিল মনোয়ারা মনু (৬৯) ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। তিনি ১৩ অক্টোবর রাজধানীর ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

বেগম পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে তাঁর সাংবাদিকতা শুরু। তিনি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ও নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলা, ব্রেকিং দ্য সাইলেন্সসহ বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তাঁর লাশ জাতীয় প্রেস ক্লাবে রাখা হয়। সেখানে জাতীয় প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

মাহফুজ সিদ্দিকী

জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য ও প্রবীণ সাংবাদিক মাহফুজ সিদ্দিকী (৭৭) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ২৮ অক্টোবর রাজধানীর আরামবাগে নিজ বাসভবনে তিনি মারা যান। তাঁকে টাঙ্গাইল শহরের কলেজপাড়ায় পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মাহফুজ সিদ্দিকী সাপ্তাহিক পূর্বদেশের মাধ্যমে সাংবাদিকতা শুরু করেন। তিনি দৈনিক খবরপত্র ও সাপ্তাহিক চিত্রালীসহ বিভিন্ন সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি 'নদী আমার কীর্তনখোলা', 'প্রেম তুই সর্বনাশী', 'চাবিটা দাও', 'পতিতা প্রিয়তমা', 'অনিদ্র ভ্রমর'সহ অসংখ্য গ্রন্থের রচয়িতা।

অর্ণব মজুমদার

ক্রীড়া সাংবাদিক অর্ণব মজুমদার ১৩ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। লেখালেখি করতেন দীপায়ন অর্ণব নামে। সর্বশেষ কর্মরত ছিলেন বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের ক্রীড়া বিভাগের সহ-সম্পাদক হিসেবে। মৃত্যুর আগের দিনও শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গিয়েছিলেন বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ কাভার করার জন্য। হাসিখুশি অর্ণব গল্পে-আড্ডায় সেদিনও মাতিয়ে রাখেন প্রেস বক্স।

হোসেন মাহমুদ

বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক ও কলামিস্ট হোসেন মাহমুদ (৬৫) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ২১ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি প্যানক্রিয়াস ইনফেকশন, অস্টিওপোরোসিস ও ক্রনিক অ্যাজমায় আক্রান্ত ছিলেন। দীর্ঘ ৩৫ বছর তিনি সাংবাদিকতা পেশায় যুক্ত ছিলেন। ঢাকার শাহজাহানপুর কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। তিনি ঢাকা সাব-এডিটরস কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ছিলেন।

আজাদ হোসেন সুমন

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক কল্যাণ সম্পাদক ও দৈনিক বাংলাদেশের খবরের সিনিয়র রিপোর্টার আজাদ হোসেন সুমন ১৮ ডিসেম্বর রাজধানীর নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। আজাদ হোসেন সুমনের মরদেহ কেরানীগঞ্জে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

সংশোধনী

'নিরীক্ষা' ২২৫তম সংখ্যার গণমাধ্যম সংবাদের ৬৫ পৃষ্ঠায় শোক সংবাদ অংশে 'সৈয়দ আখতারুজ্জামান সিদ্দিকী লাবলু' শিরোনামে প্রকাশিত খবরের সঙ্গে অনবধানতাবশত প্রয়াত সাংবাদিক অজয় বড়ুয়ার ছবি ছাপা হয়। এছাড়া ৬২ পৃষ্ঠায় সমকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক 'মুস্তাফিজ শফির' নাম 'মুস্তাকিম শফি' ছাপা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

সম্প্রচার আইন সাংবাদিকদের চাকরি রক্ষা করবেঃ তথ্যমন্ত্রী

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, সরকার সম্প্রচার সাংবাদিক ও কর্মীদের জন্য চাকরি এবং আনুষঙ্গিক সুবিধার আইনি সুরক্ষা নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে। টেলিভিশন শিল্পকে বাঁচাতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, যদি সম্প্রচার আইন পাস হয়, তবে আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। সাংবাদিকদের চাকরি রক্ষা হবে।

২৪ অক্টোবর প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে বেসরকারি টেলিভিশন সাংবাদিকদের সংগঠন ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার (বিজেসি) ও পিআইবির যৌথ আয়োজনে 'সম্প্রচার গণমাধ্যমের সংকট' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগের আমলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশের গণমাধ্যম খাতে বড়ো ধরনের বিপ্লব হয়েছে। শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশে প্রথম কোনো বেসরকারি টেলিভিশনকে লাইসেন্স দেন। এখন দেশে প্রায় ৩৪টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে এবং ৪৪টি চ্যানেল লাইসেন্স পেয়েছে। মন্ত্রী আরও বলেন, টেলিভিশন শিল্প বিস্তৃত হচ্ছে। বিজ্ঞাপন কমে যাওয়াসহ বেশকিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এখন শিল্পটিকে টিকে থাকতে হলে সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তিনি বলেন, মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে আমি অক্লান্তভাবে সাংবাদিকদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু এজন্য আমার সংশ্লিষ্ট সবার সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রয়োজন। পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের সভাপতিত্বে গোলটেবিল বৈঠকে আরও বক্তব্য দেন সিনিয়র সাংবাদিক ইকবাল সোবহান চৌধুরী, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সভাপতি মোল্লা জালাল, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সাধারণ সম্পাদক সোহেল হায়দার চৌধুরী, বিজেসি ট্রাস্টি মোজাম্মেল বাবু, মুন্নী সাহা, মামুনুর রহমান খান, বিজেসির চেয়ারম্যান রেজওয়ানুল হক রাজা প্রমুখ।

পিআইবিতে সাইবার নিরাপত্তাবিষয়ক কর্মশালা

ঢাকায় কর্মরত গণমাধ্যমকর্মী ও প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) কর্মকর্তাদের জন্য সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে দিনব্যাপী কর্মশালা ২০ নভেম্বর পিআইবি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালার সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক। সভাপতিত্ব করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। কর্মশালাটি আয়োজনে সহযোগিতা করেছে ইনস্টিটিউট অব কমিউনিকেশন স্টাডিজ (আইসিএস)।

নারীর গৃহস্থালির সেবামূলক কাজের মূল্যায়নবিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

রাষ্ট্রীয়ভাবে সমাজ ও পরিবারে নারীর গৃহস্থালির সেবামূলক কাজের মূল্যায়ন আজ সময়ের দাবি। ঘরের কাজের পাশাপাশি নারীর সব আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কাজের যথাযথ মূল্যায়নই একটি লিঙ্গবৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট পূরণেও কাজটি জরুরি। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) ও অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে দুইদিনব্যাপী 'সাংবাদিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা: প্রেক্ষাপট গৃহস্থালির সেবামূলক কাজ' শীর্ষক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহিন ইসলাম এনডিসি। পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের পরিচালক (প্রোগ্রাম, পলিসি অ্যান্ড ক্যাম্পেইন) আসগর আলী সাবরী। ঢাকা ও ঢাকার বাইরের ৩৫ জন সাংবাদিক প্রশিক্ষণটিতে অংশ নিয়েছেন। কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তাসমিমা হোসেন।

পিআইবিতে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাবিষয়ক কর্মশালা

জাতিসংঘের ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন এবং সেভ দ্য চিলড্রেনের সহযোগিতায় প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজনে ১০ ডিসেম্বর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাবিষয়ক কর্মশালা পিআইবির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাবিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

কর্মশালায় সমাপনী বক্তব্য দেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। সকালে কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও কৃষি পরিবীক্ষণ ইউনিটের মহাপরিচালক মোহাম্মদ বদরুল আরেফিন। বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাবিষয়ক প্রোগ্রামের ম্যানেজার আশুন্তা টেসতা, ইউএসআইডির খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষিনীতিবিষয়ক জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা মোহাম্মদ শাহিদুর রহমান, ইউএসআইডির ইকোনমিক গ্রোথ কমিউনিকেশন অ্যাডভাইজার আইরিশ ক্রুজ, ইউএসআইডির ইকোনমিক গ্রোথ অফিসের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ মেহেদি হাসান, সেভ দ্য চিলড্রেনের পরিচালক (চাইল্ড পোভার্টি) ফ্রেডরিক ক্রিস্টোফার, মিটিং দ্য আন্ডার নিউট্রেশন চ্যালেঞ্জ প্রকল্পের চিফ টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজর নাউকি মিনমিগোসি, ডিএফআইডির প্রোগ্রাম ম্যানেজার তাসনিম সিদ্দিক এবং সূচনা প্রকল্পের চিফ অব পার্টি শেখ শাহেদ রহমান কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, কৃষি ও জেন্ডারবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৩৩ জন সংবাদকর্মী অংশ নেন।

বান্দরবানে শিশু সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ

শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর উদ্যোগে শিশু সাংবাদিকতাবিষয়ক দুইদিনব্যাপী (৮-৯ ডিসেম্বর) প্রশিক্ষণ বান্দরবান প্রেস ক্লাব সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বান্দরবান প্রেস ক্লাবের সভাপতি মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বান্দরবানের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দাউদুল ইসলাম। ৯ ডিসেম্বর প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। প্রশিক্ষণে বান্দরবানে লেখালেখি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন।

বান্দরবানের সাংবাদিকদের জন্য পিআইবির তিনটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বান্দরবান জেলা সদর এবং বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে নভেম্বরে একসঙ্গে তিনটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১০ থেকে ১২ নভেম্বর বান্দরবান প্রেস ক্লাবে তিনদিনব্যাপী টেলিভিশন সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং একই দিনে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৩-১৫ নভেম্বর বান্দরবান প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণগুলো উদ্বোধন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ।

দেশের অগ্রযাত্রায় সাংবাদিকদের সহযোগিতা চাইলেন তথ্য সচিব

তথ্য সচিব আবদুল মালেক বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদৃঢ় নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি দেশের চলমান এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সাংবাদিকদের অগ্রণী ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। ৪ নভেম্বর পিআইবি সেমিনার কক্ষে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত পটুয়াখালী জেলার সাংবাদিকদের জন্য টেলিভিশন সাংবাদিকতাবিষয়ক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। তথ্য সচিব আরও বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে পটুয়াখালীসহ দেশের দক্ষিণাঞ্চল এখন অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হচ্ছে। পায়রা বন্দর ও তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পটুয়াখালীর উন্নয়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে। তিনি চলমান এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সম্পৃক্ত হতে পটুয়াখালীর সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের বক্তব্যে পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, দেশের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনি ইশতেহারের অংশ হিসেবে পিআইবি তৃণমূল পর্যায়ের সাংবাদিকদের মানোন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। মোবাইল ও ডেটা সাংবাদিকতার মতো নতুন নতুন বিষয়ের ওপর সাংবাদিকদের জন্য পিআইবি প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব শাবান মাহমুদ। অনুষ্ঠান শেষে তথ্য সচিব প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ প্রদান করেন। ২ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া তিনদিনব্যাপী টেলিভিশনবিষয়ক প্রশিক্ষণে পটুয়াখালী জেলায় কর্মরত বিভিন্ন টেলিভিশনের ২৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

নেত্রকোনার ৮টি উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে নেত্রকোনা জেলার ৮টি উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য ২টি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (আবাসিক) অনুষ্ঠিত হয়েছে। নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া, আটপাড়া, বারহাট্টা ও মদন উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য ২৬-২৮ অক্টোবর এবং কলমাকান্দা, খালিয়াজুরী, মোহনগঞ্জ ও পূর্বধলা উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য ২৯-৩১ অক্টোবর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। পিআইবি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত দুটি প্রশিক্ষণে ৫৬ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে ডেটা সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ঢাকায় কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত ডেটা সাংবাদিকতাবিষয়ক তিনদিনব্যাপী (২০-২২ অক্টোবর) প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২২ অক্টোবর পিআইবি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালার সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য, তথ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি মুহম্মদ শফিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুহম্মদ শফিকুর রহমান বলেন, প্রশিক্ষণ সাংবাদিকদের সমৃদ্ধ করে। ডেটাভিত্তিক সাংবাদিকতার এই প্রশিক্ষণ আমাদের গণমাধ্যমকর্মীদের দক্ষতাকে আরও শানিত করবে বলে আমার বিশ্বাস। এটি বাংলাদেশে ডেটা সাংবাদিকতার চর্চাকেও ত্বরান্বিত করবে।

ডেটা সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তথ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মুহম্মদ শফিকুর রহমান *এমপি*

সভাপতির বক্তব্যে পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, বাংলাদেশের সাংবাদিকরা যাতে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন, তাই ডেটা সাংবাদিকতার এ প্রশিক্ষণের আয়োজন। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমাদের সংবাদকর্মীরা ডেটাভিত্তিক সাংবাদিকতার চর্চায় উৎসাহিত হবে বলে আমরা মনে করি। সরকারি অর্থায়নে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সাংবাদিকদের মানোন্নয়নে পিআইবি যে প্রশিক্ষণ সেবা দিয়ে আসছে, তা অতুলনীয়। আমরা সমৃদ্ধ ও দক্ষ গণমাধ্যমকর্মী তৈরি করতে চাই, যারা দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেবে। প্রশিক্ষণে ঢাকায় বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত ৩৪ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (১৫-১৭ অক্টোবর) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৫ অক্টোবর কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-উর-রশিদ আসকারী। প্রশিক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

রাবি সাংবাদিকদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির (রাবিসাস) সদস্যদের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত তিনদিনের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (আবাসিক) ১ অক্টোবর শুরু হয়। ৩ অক্টোবর পিআইবি সেমিনার কক্ষে সমাপনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ারের সম্পাদক মোল্লাহ আমজাদ হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে ২৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

বানাসাসের সদস্যদের জন্য অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক সমিতির (বানাসাস) সদস্যদের জন্য তিনদিনব্যাপী (৫-৭ নভেম্বর) অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ পিআইবি সেমিনার কক্ষে সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তাসমিমা হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে বানাসাসের ৩৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সদস্যদের জন্য ২৮ থেকে ৩০ অক্টোবর তিনদিনব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ কামাল ভবনের সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) মো. ইলিয়াস ভূইয়া। প্রশিক্ষণে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির ৩০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সদস্যদের জন্য অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সদস্যদের জন্য তিনদিনব্যাপী (১১-১৩ অক্টোবর) অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ পিআইবি সেমিনার কক্ষে সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ছড়াকার, শিশুসাহিত্যিক, শিশুসংগঠক, নাট্যকার, গীতিকবি ও প্রবীণ সাংবাদিক রফিকুল হক দাদুভাই। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সভাপতি নাসিমুন আরা হক মিনু। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের ৩৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

নরসিংদীর সাংবাদিকদের জন্য পিআইবি'তে প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে নরসিংদীর বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য সাংবাদিকতাবিষয়ক দুটি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (আবাসিক) পিআইবি'তে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৫-১৭ অক্টোবর এবং ২২-২৪ অক্টোবর পৃথকভাবে প্রশিক্ষণ দুটি সমাপ্ত হয়। প্রশিক্ষণ দুটিতে ৫৬ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

কুমিল্লার সাংবাদিকদের জন্য দুটি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর উদ্যোগে কুমিল্লা জেলার চান্দিনা, বরুড়া উপজেলার সাংবাদিকদের তিনদিনব্যাপী (৬-৮ অক্টোবর) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। ৮ অক্টোবর পিআইবি সেমিনার কক্ষে পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন দৈনিক বাংলাদেশ কণ্ঠের সম্পাদক ফারুক খান।

এছাড়াও কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি, তিতাস, হোমনা উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী অপর একটি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ১০ থেকে ১২ অক্টোবর পিআইবি'তে অনুষ্ঠিত হয়। ১২ অক্টোবর পিআইবি সেমিনার কক্ষে পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলা বার্তার সম্পাদক মোহাম্মদ শাহজাহান। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাংবাদিক ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষক মোস্তফা হোসেইন। উভয় প্রশিক্ষণে ২৮ জন করে সাংবাদিক অংশ নেন।